মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

উদ্ঘাটিত ডিএনএ উৎসারিত সম্ভাবনা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

SUBARNA

মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

উদ্ঘাটিত ডিএনএ উৎসারিত সম্ভাবনা

সন্তানের অনেক কিছু কেন বাবা মায়ের মত, আদিকাল থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে যে– সকল জীবের জীবকোষে থাকা এক রকম অণু ডিএনএই এর জন্য দায়ী। জীবনের সব বৈশিষ্ট এই ডিএনএ'তেই অণু-বিন্যাসরূপী বার্তা রূপে নিহিত থাকে। এই বার্তাকে ডিএনএ বহন করে নিয়ে যায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে লক্ষ লক্ষ বছরের ধারায়। কোষের মধ্যে সেই বার্তা বাস্তবায়িত হয়ে জীবনের যাবতীয় প্রকাশ ঘটায়– জীবের গঠন ও আচরণের দিক থেকে। কী রকম সেই অণু ডিএনএ? কীভাবে এটি জীবনের বার্তা ধারণ করে, কীভাবে তা বাস্তবায়িত করে, এমন সব প্রশ্নে আমাদের দারুণ কৌতূহল থাকবে সেটি খুবই স্বাভাবিক। আধুনিক ডিএনএ বিজ্ঞান, যা আজকের জীব বিজ্ঞানের অনেকটাই জুড়ে রয়েছে, শুধু সেই প্রশ্নগুলোর চমকপ্রদ সব উত্তরই দেয়নি, বরং ডিএনএ'র নানা দিক উদ্ঘাটনের সুযোগে জীব বিজ্ঞানকে নিয়ে গেছে এক দু:সাহসিক অভিযাত্রায়। এর মাধ্যমে যেই জিন কারিগরি সম্ভব হয়েছে তা নানা জীবের শারীর-বৃত্তের উপর হস্তক্ষেপ করে মানুষকে এক অভাবনীয় সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে। সেই সম্ভাবনার অনেক সুফল এখনই আমরা ভোগ করতে শুরু করেছি, যদিও ভবিষ্যৎটি আরো অনেক বেশি চমকপ্রদ। সেই সঙ্গে জীবনের নিয়ামক বার্তার উপর হস্তক্ষেপ করার মধ্যে যে ঝুঁকি রয়েছে তাও আমাদেরকে বুঝতে হচ্ছে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে।

পুস্তকমালা

মহাবিশ্বে মানুষ

পঞ্চম বই

উদ্ঘাটিত ডিএনএ উৎসারিত সম্ভাবনা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

যাদের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা করে সব সময়
অসীম আনন্দ লাভ করেছি,
যাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বপ্নভরা চোখ
সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে
যুগে যুগে যারা মহাবিশ্বে মানুষের স্থানটিকে উজ্জ্বলতর করে
তোলার প্রয়াস নিয়েছে, সেই-
তরুণ-তরুণীদেরকে

পুস্তকমালার ভূমিকা

প্রাণিজগতে আমাদের যে প্রজাতি তার বৈজ্ঞানিক নাম নিজেরা দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ 'জ্ঞানী মানুষ'। অন্য সব প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যে অনন্যতা আমরা লাভ করেছি তার বড় প্রকাশ উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা, এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করার আগ্রহ ও সক্ষমতা। নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মঅনুসন্ধানও এই উদ্ঘাটন চেষ্টার অন্তর্ভূক্ত। আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে চিন্তা করি, অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক, ভবিষ্যতে কী সংকট ও কী সম্ভাবনাগুলো আসতে পারে – বিজ্ঞান এ সব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং এখন উত্তরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণিত করতে পারছে। সামনে যে তা আরো শাণিত হবে তাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। এই পুস্তকমালা এসবকেই সবার জন্য সহজভাবে পরিবেশন করার প্রয়াস নিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে লেখক এ বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিয়েছেন সর্ব-সাধারণের জন্য। 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' নামের এই বক্তৃতাগুলো প্রতি মাসে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চ্যানেল আই কর্তৃক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। পুস্তকমালার বইগুলো তার ভিত্তিতেই রচিত। একেবারেই সাম্প্রতিক বিজ্ঞান এসব নিয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমান্তটি যেখানে এনে দিয়েছে, সকল জটিলতা সত্ত্বেও তাকেই সহজ ভাষায় উপভোগ্য করার চেষ্টা এতে রয়েছে। মহাবিশ্বের ক্রম বিকাশকে বুঝার ও তাতে আত্মঅনুসন্ধানের কিছু স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও ধরিত্রীর ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের জীবন ভঙ্গির অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এর মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে। সব মিলে পুস্তকমালাটি আগ্রহী সবার জন্য, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের জন্য, চিন্তার ও আনন্দের খোরাক যোগাবে বলেই বিশ্বাস।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পুস্তকমালার বইগুলো

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

আমরা কী ভাবে চিন্তা করি

উদ্ঘাটিত ডিএনএ, উৎসারিত সম্ভাবনা

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

নূতন আবাস, নূতন পড়শির খোঁজে

ভূমিকা

মানুষের দৈহিক বা আচরণগত নানা বৈশিষ্ট কীভাবে বাবা-মা থেকে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এটি বহু কাল ধরেই ছিল একটি কৌতূহলের বিষয়। সব জীবের ক্ষেত্রেও বা যে এটি কেমন ভাবে ঘটে, তাও ছিল একই প্রশ্নের অংশ। শেষ পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি দেহের প্রত্যেক কোষে থাকা ডি এন এ নামক অণুই সব জীবের ক্ষেত্রে বৈশিষ্টগুলো সৃষ্টি হবার নির্দেশনা বহন করে, সেগুলো বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া শুরু করে, এবং সেগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে যায়। ডি এন এ ঠিক কেমনভাবে এই কাজগুলো করে তাই সহজ ভাষায় এই বইয়ের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। এগুলো জানতে পারার পেছনে যে ঘটনাটি সব চেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে তা হলো ডি এন এ'র গঠনটি উদ্ঘাটন। এই গঠনের মধ্যেই রয়েছে ডি এন এ'র ঐ কাজগুলো করতে পারার চাবিকাঠি। জীবের শরীর গঠনের এবং এর মধ্যে যাবতীয় প্রক্রিয়ার নির্দেশক সংকেত বা কোড সাজানো রয়েছে ঐ ডি এন এ'র মধ্যে, যাকে অনেকটা অণুর ভাষায় লেখা একটি নির্দেশিকার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ডিএনএ রূপী এই নির্দেশিকাটির 'ভাষা' এবং এর 'শব্দার্থগুলো' সব রকম জীবের জন্য প্রায় একই, তা ব্যাকটেরিয়া অথবা পোকা মাকড়ের জন্য যেমন, মানুষের জন্যও তাই। এভাবে ডি এন এ বিজ্ঞানে অগ্রগতি আমাদের কাছে জীব জগতের ঐক্য এবং জীববিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একেবারেই সুপ্রমাণিত ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, আজ যখন আমরা মানুষের ডি এন-এ'র কোন্ অংশ, অর্থাৎ তার মধ্যে কোন্ 'জিন' কী কাজের জন্য দায়ী তা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি, তখন অন্য জীবের মধ্যে একই বা সদৃশ জিন কোন্ কাজ করে সেই জ্ঞানের সহায়তা নিতে পারছি।

ডি এন এ'র গঠন ও কাজকর্মের প্রক্রিয়াগুলো এখন যে শুধু আমরা অনেকটা ভাল করে বুঝতে পারছি শুধু তাই নয়, ডিএনএ'র গঠনের সুযোগ নিয়ে একে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজে চমৎকার ভাবে ব্যবহারও করছি। যেমন আঙ্গুলের ছাপের একটি আরো নিশ্চিত ও বহুল ব্যবহারযোগ্য সংস্করণের মত ব্যক্তি সনাক্তকরণের জন্য, পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ণয়ের জন্য, বংশানুক্রমিক রোগ কেমন করে সঞ্চারিত হচ্ছে তা নির্ণয়ের জন্য ইত্যাদি। শুধু তাই নয় অতীতে আমাদের পূর্বসূরিরা কোথা থেকে কোথায় অভিবাসী হয়েছে, আমাদের সাধারণ পূর্বসূরি কারা কোথায় ছিল, এসব অতীত কাহিনীও আমরা আজকের নানা মানুষের ডি এন এ থেকে নির্ণয় করতে পারছি। আরো চমকপ্রদ ব্যাপার হলো ডি এন এ'কে

জৈব রাসায়নিক ভাবে কাটাচেরা করে আমরা তার কাজ কর্মে পরিবর্তনও আনতে পারছি। জীবনের নির্দেশিকা সংকেত বদলে গেলে বা এক জীবের সংকেত অন্য জীবের ডি এন এ'তে নিয়ে সংযুক্ত করলে জীবটির কাজকর্ম যে কিছু কিছু বদলে যাবে সেটিই তো স্বাভাবিক। এভাবে জিন স্থানান্তরিত জীব সৃষ্টি আমাদেরকে নিজের পছন্দমত বৈশিষ্ট সম্পন্ন জীব সৃষ্টির একটি অভূতপূর্ব ক্ষমতা দিয়েছে। এসব জিন কারিগরির অন্ত-র্ভূক্ত। এটি ব্যবহার করে আমরা চাহিদামত গুণ নিয়ে নানা উদ্ভিদ বা প্রাণি বা ব্যাকটেরিয়া তো সৃষ্টি করতে পারছিই, তা ছাড়া নিজেদের সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সব সম্ভাবনার সৃষ্টি করছি।

এ সবই বর্তমান শতাব্দীকে জীব বিজ্ঞানের শতাব্দী হিসেবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করছে। জীবকোষের মধ্যে থাকা এই কুণ্ডলী পাকানো অণুটির কাজের ক্রম উদ্ঘাটন আজ মানুষকে অভাবনীয় সব সম্ভাবনার দ্বার প্রান্তে এনে দিয়েছে। এটি যেমন বড় আশার কথা, তেমনি বড় দায়িত্বেরও কথা, কারণ এর ঝুঁকিগুলোও বেশ বড় রকমের। এ বইটিতে আমরা এসব কিছুটা বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করেছি কারণ মহাবিশ্বে মানুষের ইতিহাসে ডি এন এ বিজ্ঞান একটি যুগসন্ধিক্ষণ এনে দিয়ে-ছে। এর ফলে মানুষ নিজে একটি জীব হয়ে জীবের মৌলিক প্রক্রিয়াতে সজ্ঞান হস্তক্ষেপ করতে পারছে। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া বিজ্ঞান সচেতন সবার পক্ষেই খুব প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জীবনযাত্রার নানা দিক এর ফলে দারুণ ভাবে যে পরিবর্তিত ও উন্নত হবে তা প্রায় নিশ্চিত।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

পুস্তকমালার ভূমিকা ৫
ভূমিকা ৭
পূর্ব কাহিনী: সন্তান কেন বাবা-মার মত ১১
ডিএনএ'র গঠন, ডিএনএ'র কাজ ২৩
অকেজো ডিএনএ'র ছড়াছড়ি ৪২
ডিএনএ দিয়ে যায় চেনা ৪৮
ডিএনএ'র বর্ণ পাঠ ৫৮
আজকের ডিএনএ থেকে অতীত অনুসন্ধান ৬৭
পরিবারে জিনের অনুসরণ ৮৪
জেনোম মানচিত্র ৮৯
জিন নিয়ে কারিগরি ১০৫
জিন-স্থানান্তরিত জীব ১১৮
জিনের নিয়ন্ত্রণে জিন ১৩৫
জিন চিকিৎসা ১৫০
প্রাচীন দেহাবশেষ থেকে ডিএনএ ১৬২
প্রশ্নোত্তর ১৭১

উদ্ঘাটিত ডিএনএ
উৎসারিত সম্ভাবনা

পূর্ব কাহিনী: সন্তান কেন বাবা-মার মত

একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং আরো আগে

বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচারের' ২৫ এপ্রিল ১৯৫৩ তারিখের সংখ্যায় ছোট্ট একটি প্রবন্ধ সূচনা করেছিল জীববিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক যুগের। এরপর থেকে আমাদের কাছে দ্রুত উদ্ঘাটিত হতে পেরেছে জীবদেহে জীবনের প্রক্রিয়াগুলোর পেছনে কী কোড বা সংকেত কাজ করছে তা। আরো বুঝা গেছে এই সংকেত কেমন করে প্রতিলিপি হয়ে জীবদেহে বজায় থাকছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যেতে পারছে। এই উদ্ঘাটন এনে দিয়েছে অভূতপূর্ব সব সম্ভাবনা– জীব ও জীবনকে নিয়ে। এ বইয়ে আমরা ক্রমান্বয়ে সেই উদ্ঘাটনগুলো ও সেই সম্ভাবনাগুলো নিয়েই আলোচনা করবো। এটি করতে গিয়ে অবশ্য শুরুতে আমাদেরকে ১৯৫৩ সালের ঐ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটিরও বেশ কিছু পেছনে যেতে হবে।

যুগান্তকারী সেই প্রবন্ধটি নিজে কিন্তু বেশ সাদামাটা বিষয়ে– জীবকোষের একটি অংশে থাকা ডি-অক্সিরিবো নিউক্লিক এসিড বা সংক্ষেপে ডি এন এ নামক একটি অণুর গঠন উদ্ঘাটন সম্পর্কে। এর লেখক ছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী জেমস্ ওয়াটসন ও তাঁর থেকে কিছু বয়সে বড় ফ্রান্সিস ক্রিক। প্রবন্ধের শুধু একেবারে শেষ বাক্যে তাঁরা একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই গঠন থেকে বংশগতির বাহকটির প্রতিলিপি হবার ব্যাপারটি বুঝা যেতে পারে। কারণ ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গিয়েছিল এই ডি এন-এ'ই হচ্ছে বংশগতির সেই বাহক। কাজেই তার মধ্যেই কোন ভাবে লুকানো রয়েছে জীবনের নিয়ামক সংকেতগুলো। এ জন্যই ডিএনএ'র গঠন ছিল এত গুরুত্বপূর্ণ।

ডি এন এ'ই যে বংশগতির বাহক আগে সেটি যখন জানা ছিলনা, বা আদৌ ওরকম বাহক যে কী হতে পারে তা নিয়ে কোন ধারণা যখন ছিলনা, তখনো কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গুণাগুণ সঞ্চারিত করার জন্য কোন বাহক থাকতে হবে। এই বাহকই সন্তানকে বাবা-মার নানা বৈশিষ্ট দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বাহকের প্রকৃতি কীরকম হবে তাও এক পর্যায়ে তাঁরা নির্ণয় করতে পেরেছেন। এই নির্ণয়ে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথিকৃতের কাজ করেছেন ডি এন এ উদ্ঘাটনের প্রায় শত বর্ষ আগে বিজ্ঞানী মেণ্ডেল।

এক এক গুণের বাহক এক এক কণার মত

মেণ্ডেল ছিলেন আজকের চেক প্রজাতন্ত্রের একটি আশ্রমের পাদরি। সেই আশ্রমের বাগানে নানা মটরশুটি নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করেই তিনি তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কারগুলো করেছিলেন। হাজার বছর ধরেই মানুষ জানে যে বাবা মার কিছু কিছু বৈশিষ্ট সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেই জানাটিকে তারা ব্যবহারও করেছে পোষা উদ্ভিদ, পশু পাখি ইত্যাদিতে বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য বিশেষ বিশেষ জাতের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে– যাতে পরবর্তী প্রজন্মে ঐ গুণটা আরো বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে তাদের ধারণা ছিল এই সঞ্চারণটি ঘটে অনেকটা তরলের মত– বাবার নানা গুণ, মায়ের নানা গুণের একটি মিশ্রণের মাধ্যমে। মটরশুটি নিয়ে মেন্ডেলের পরীক্ষা কিন্তু অন্য রকম তথ্য দিলো। তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন মটরশুটির এক একটি পৃথক গুণের কতখানি সন্তানের মধ্যে যায়। যেমন বাগানে কিছু মটরশুটির বীজ ছিল মসৃণ, আর কিছুর বীজ ছিল কুঁচকানো। তিনি সব সময় বিশুদ্ধ মসৃণ বীজ দেয় এমন মটরশুটির এবং সব সময় বিশুদ্ধ কুঁচকানো বীজ দেয় এমন মটরশুটির আলাদা চাষ করলেন। এরপর কুঁচকানোর সঙ্গে কুঁচকানো প্রজনন করালে কুঁচকানো, এবং মসৃণের সঙ্গে মসৃণ প্রজনন করালে মসৃণ পাওয়া গেল। কিন্তু মসৃণের সঙ্গে কুঁচকানো প্রজনন করালে তখনো শুধু মসৃণই পাওয়া গেল। স্পষ্টত বুঝা গেল সুযোগ পেলেই মসৃণ হবার একটি প্রবণতা মটরশুটির রয়েছে।

এখানে দু'রকম ঘটনা ঘটলো। একই রকম বাবা ও মা থেকে যেমন মসৃণ পাওয়া গেল, তেমনি আবার ভিন্ন বা মিশ্র বাবা ও মা থেকেও মসৃণ পাওয়া গেল। ঐ দ্বিতীয় প্রজন্মের মিশ্র বাবা মার মসৃণগুলোকে অন্য দ্বিতীয় প্রজন্মের ওরকম মসৃণের সঙ্গে (মিশ্র বাবা মার) প্রজনন করালে গড়পড়তা চারভাগের তিনভাগ সন্তান মসৃণ পেলেও এক ভাগ কিন্তু কুঁচকানোই পাওয়া যায়। তার মানে ওরকম মসৃণ বাবা-মায়ের মধ্যেই কুঁচকানো হবার গুণটিও কোন ভাবে লুক্কায়িত ছিল। একে শুধু এক ভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। গুণটি এক প্রকার বাহক 'কণার' মাধ্যমে বাবা ও মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে যাচ্ছে। মসৃণ হবার গুণটি এই বাহক কণার একটি প্রকার, আর কুঁচকানো হবার গুণ ঐ কণারই অন্য প্রকার। সন্তান বাবা থেকে এরকম একটি কণা পায়, আর মায়ের থেকে আরেকটি কণা পায়। প্রত্যেকটি গুণের জন্য এরকম দুটি করে কণা সবার মধ্যে থাকে। দুটিই যখন মসৃণ হবার কণা হয় তখন এটি নিজে মসৃণ হয়। দুটিই যদি কুঁচকানোর কণা হয়, তখন এটি কুঁচকানো হয়। কিন্তু একটি মসৃণ ও একটি কুঁচকানো হলে তাও নিজে মসৃণই হয়– কারণ স্পষ্টত মসৃণ

হওয়াটাই মুখ্য গুণ, তাই মসৃণ ও কুঁচকানো উভয় কণা থাকলে মসৃণই প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় প্রজন্মের মসৃণের ক্ষেত্রে বাবা ও মার প্রত্যেকের কণা দুটির একটি মসৃণের ও একটি কুঁচকানোর হওয়াতে (যেহেতু এদের নিজের বাবা ও মা'র দুজনের কণা জোড়া ভিন্ন ছিল) এরকম দুটির প্রজননের সময় সন্তানের চার রকম পরিস্থিতি হতে পারে। বাবা থেকে মসৃণের কণা, মা থেকেও মসৃণের– সে ক্ষেত্রে সন্তান মসৃণ হবে। বাবা থেকে মসৃণের কণা, মা থেকে কুঁচকানোর কণা– সেক্ষেত্রেও সন্তান মসৃণ হবে। মা থেকে মসৃণের কণা বাবা থেকে কুঁচকানোর কণা– সেক্ষেত্রেও সন্তান মসৃণ হবে। বাবা ও মা উভয় থেকে কুঁচকানোর কণা– শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই সন্তান কুঁচকানো হবে। ফলে চার ভাগের তিন ভাগ ক্ষেত্রেই সন্তান মসৃণ হয়ে এক ভাগ ক্ষেত্রে এটি কুঁচকানো হবে– গড়পড়তা এই অনুপাতেই মসৃণ ও কুঁচকানো বীজের মটরশুটি গাছ সন্তান চারা গুলোর মধ্যে দেখা যাবে।

মেণ্ডেল দেখলেন এই নিয়মটি শুধু মটরশুটি বীজের মসৃণ বা কুঁচকানো হবার গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মটরশুটির অন্য বিভিন্ন গুণের ক্ষেত্রেও পৃথক ভাবে এরা এই নিয়ম মেনে চলে। যেমন বীজের রঙ হয় সবুজ নয় হলুদ হবার ক্ষেত্রে। অথবা মটরশুটি শিমের রঙের সবুজ বা হলুদ হওয়া ক্ষেত্রে। দেখা গেল বীজের রঙের হলুদ হওয়াটি মুখ্য গুণ। আর শিমের রঙের সবুজ হওয়াটাই মুখ্য গুণ।

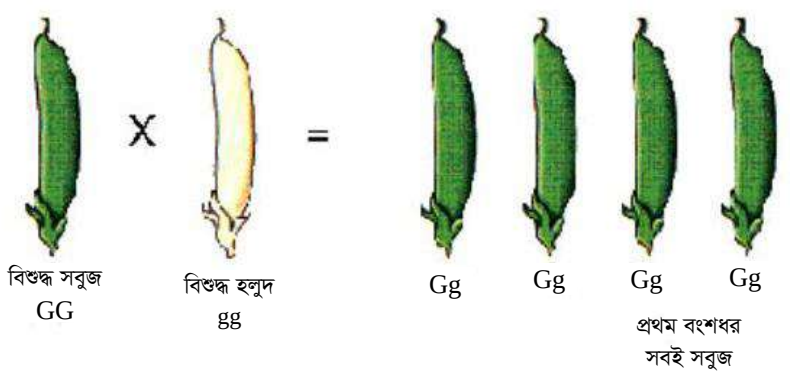

মটরশুটি শিমের রঙের উপর মেন্ডেলের নিয়ম প্রয়োগ

বিশুদ্ধ সবুজ ও বিশুদ্ধ হলুদ শিমের মধ্যে প্রজনন: সবুজ হওয়াটি মুখ্য গুণ বলে সবই সবুজ, কিন্তু মিশ্র কণা বিশিষ্ট।

G= সবুজ হবার কণা,, g= হলুদ হবার কণা,

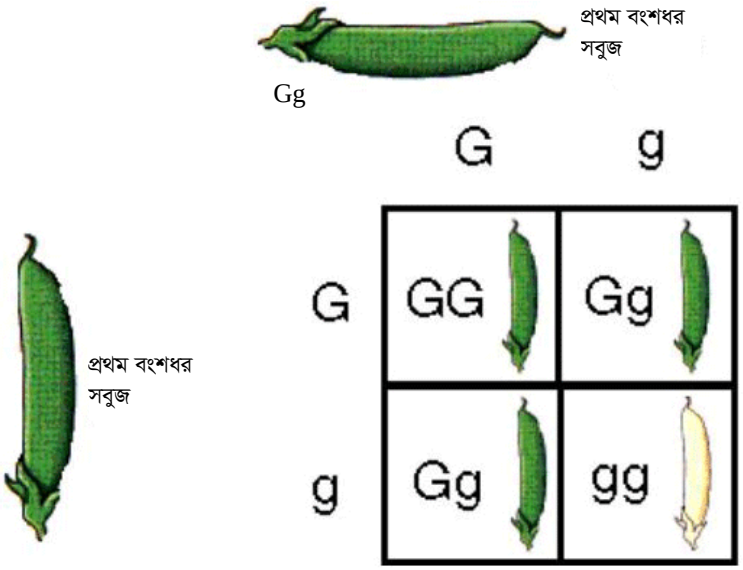

প্রথম প্রজন্মের বংশধরদের মধ্যে প্রজননঃ (বাব ও মা উভয়ে সবুজ, কিন্তু মিশ্র কণা বিশিষ্ট)

সন্তানরা $\frac{৩}{৪}$ সবুজ, $\frac{১}{৪}$ হলুদ

এরপর মেণ্ডেল যা দেখলেন তা আরো চমকপ্রদ। এবার প্রজনন করাবার সময় তিনি বাবা ও মায়ের দুটি গুণ এক সঙ্গে নিয়ে দেখলেন সন্তানে গিয়ে সেগুলো কী হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের বাবা ও মা নিলেন যাদের মধ্যে মসৃণ হবার কণা ও কুঁচকানোর কণা থাকে বলেই তারা মসৃণ, আর বীজ হলুদ হবার কণা আর সবুজ হবার কণা থাকে বলে তারা হলুদ (ওটাই মুখ্য বলে)। এক্ষেত্রে সন্তানে গিয়ে কণা দুটির মিশ্রণ ১৬ রকম ভাবে হতে পারে– যেমন তাদের একটি রকম হলো বাবা থেকে মসৃণ কণা, মা থেকে মসৃণ কণা, বাবা থেকে সবুজ বীজের কণা, মা থেকে হলুদ বীজের কণা- ইত্যাদি আরো ১৫ রকমের নানা মিশ্রণ। দেখা যাবে ১৬ রকমের মধ্যে ৯ রকম মিশ্রণই মসৃণ-হলুদ বীজ দেবে, ৩ রকম মিশ্রণ মসৃণ-সবুজ বীজ দেবে, ৩ রকম মিশ্রণ কুঁচকানো-হলুদ দেবে, আর শুধু ১ রকমের মিশ্রণ কুঁচকানো-সবুজ দেবে। ঐ একেবারে শেষের ক্ষেত্রটিতে শুধু গৌণ কণাগুলোই থাকবে– বাবা থেকে কুঁচকানোর কণা ও মা থেকেও কুঁচকানোর কণা, একই ভাবে বাবা থেকেও সবুজের কণাও মা থেকেও সবুজের কণা। কাজেই তার দুটি গুণই গৌণ গুণ না হয়ে উপায় থাকেনা। সঙ্গের ছবিটি

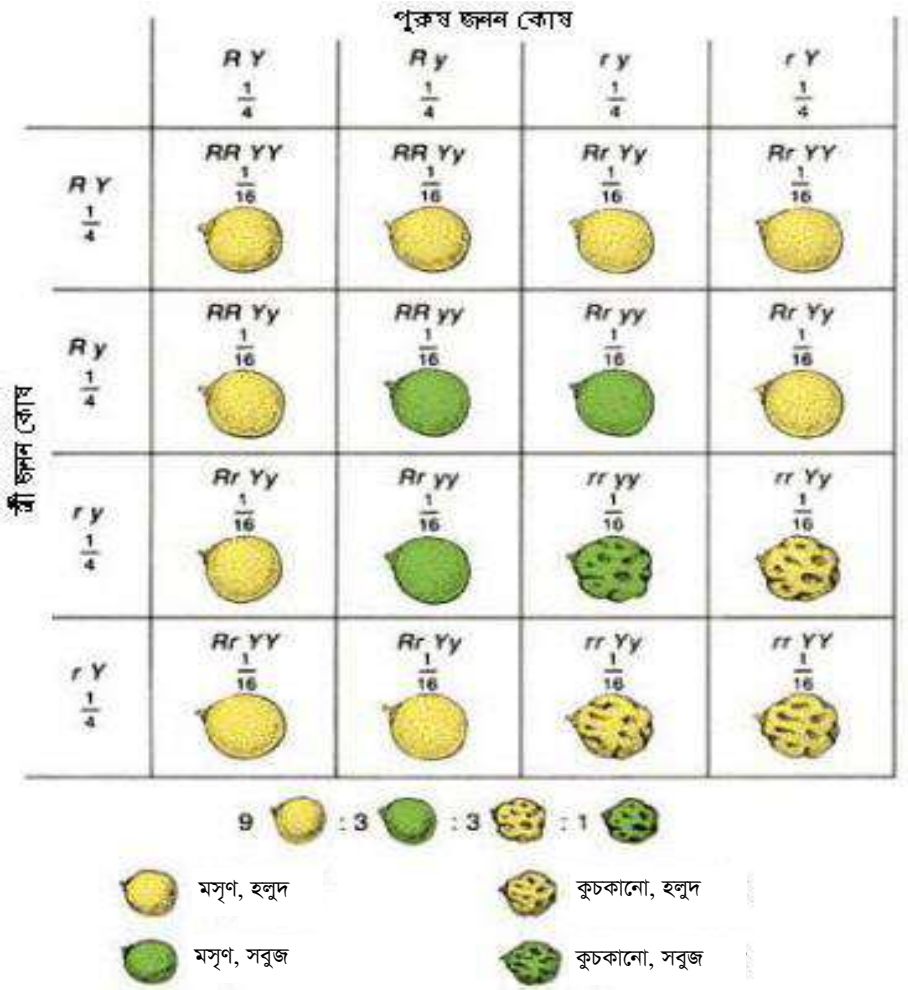

মটরশুটি বীজের আকৃতি ও রঙ উভয়ের উপর একই সঙ্গে মেন্ডেলের নিয়ম প্রয়োগঃ
বীজের মসৃণ বা কুঁচকানো হওয়া, এবং হলুদ বা সবুজ হওয়া

উভয় গুণ পরস্পর স্বাধীন ভাবে সঞ্চারিত। মসৃণ হওয়া আর হলুদ হওয়া মুখ্য গুণ।

R= বীজ মসৃণ হবার কণা, r= বীজ কুঁচকানো হবার কণা,

Y= বীজ হলুদ হবার কণা, y= বীজ সবুজ হবার কণা

দেখলে ঐ ১৬টি পৃথক পরিস্থিতির প্রত্যেকটি বুঝা যাবে। কণাগুলোর মিশ্রণের নানা প্রকার থেকে যৌক্তিকভাবে এই পূর্বাভাষ দেয়া হলো। আসলেও প্রজননের পর সন্তানদের মধ্যে গড়পড়তা এই অনুপাতেই গুণ দুটি পাওয়া গেল। দুটি গুণ এক সঙ্গে বিবেচনায় এনে সরল হিসাব থেকে এই যে অনুপাতগুলো পাওয়া

গেল তার থেকে পরিস্কার বুঝা গেল এই দুই গুণ কিন্তু একের উপর অন্যটি কোন প্রভাব বিস্তার করছেনা। প্রত্যেকটি যার যার কণার দ্বারা বাহিত হয়ে, যার যার স্বকীয়তা বজায় রেখে সন্তানের মধ্যে যাচ্ছে বলেই আমরা বিভিন্ন রকমের সন্তান $\frac{৯}{১৬}$, $\frac{৩}{১৬}$, $\frac{৩}{১৬}$ এবং $\frac{১}{১৬}$ এই রকম অনুপাতে পাচ্ছি। যদি একটি গুণের দ্বারা অন্য গুণটি প্রভাবিত হতো তা হলে এটি হতে পারতোনা। এভাবেই আবিষ্কৃত হলো মেণ্ডেলের বিখ্যাত বংশগতির নিয়মের। এটি বলে বংশগতি সঞ্চারিত হয় এক এক গুণের এক এক 'কণা' রূপ বাহকের মাধ্যমে। কণাগুলো প্রত্যেকে তার স্বকীয়তা বজায় রেখে চলে। অন্য কোন গুণের কণার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় না। ঐ 'কণাকেই' পরে বলা হয়েছে 'জিন'– যে শব্দটি ও ধারণাটি আমরা এখনো ব্যবহার করছি, যদিও ঐ কণা বা জিন যে আসলে কি তা তখন জানা ছিল না। যখন ডিএনএ'র গুরুত্ব বুঝা যায়নি তখনো জিন শব্দটি ব্যবহৃত হতো। এখনো আমরা এক একটি গুণের বার্তা বহনকারী ডি এন এ অংশকে এক একটি 'জিন' বলি।

মেণ্ডেলের নিয়মটি বংশগতির নিয়মকে বুঝতে খুব সহায়ক হলেও এবং নানা জীবে অনেক রকম গুণের ক্ষেত্রে এ নিয়ম বজায় থাকলেও, এর বেশ কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যা আমরা পরে দেখবো। মেণ্ডেল নির্দ্বিধায় নিয়মটি দিতে পেরেছিলেন কারণ তিনি মটরশুটি ইত্যাদি যে ক'টি ক্ষেত্রে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাতে ভাগ্যক্রমে ঐ জটিলতাগুলো নাই। অবশ্য একটি জটিলতা মেণ্ডেল নিজেও লক্ষ্য করেছিলেন- তা হলো কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা ও মা থেকে একটি গুণের পৃথক দুই রূপের বাহক কণা পেলে শুধু মুখ্য একটি কণার গুণ সন্তানে দেখা না দিয়ে বরং উভয় কণার গুণের একটি মাঝামাঝি অবস্থা সন্তান পায়। তাতে মনে হতে পারে যে এ দুই কণা যার যার স্বকীয়তা বজায় না রেখে বরং পরস্পরের সঙ্গে মিশে একটি মাঝামাঝি গুণ সৃষ্টি করছে। যেমন মটরশুটির সাদা ফুল বা লাল ফুল– এ দুরকমের ফুল হতে পারে। লাল ফুল মটর শুটি ও সাদা ফুল মটরশুটির মধ্যে প্রজনন করালে দ্বিতীয় প্রজন্মে গোলাপি রঙের ফুল পাওয়া যায়। মনে হয় যে লাল আর সাদা হবার কণা যেন মিশে গিয়ে গোলাপির কণা হয়েছে। কিন্তু মেণ্ডেল দেখলেন এই দ্বিতীয় প্রজন্মের দুটি গোলাপি ফুলের মটরশুটির মধ্যে প্রজনন করালে চার ভাগের দুই ভাগ সন্তান গোলাপি রঙের হলেও বাকি চার ভাগের এক ভাগ লাল আর অন্য এক ভাগ সাদা। অর্থাৎ অর্ধেক সন্তানের ক্ষেত্রে সেই এক প্রজন্ম আগের আদি রঙগুলোই আবার ফিরে আসছে। কী ভাবে এটি ঘটেছে সেটি সঙ্গের ছবিটি দেখলে বুঝা যাবে। কাজেই কণা পরস্পর মিশে গেছে এমন কথা বলা যাচ্ছে না– কণা

এক্ষেত্রেও তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। কণা পরস্পর মিশে গেলে আদি রঙ আবার ফেরৎ আসতে পারতনা। মেণ্ডেল একে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে যে লাল বা সাদা উভয়েই এক্ষেত্রে মুখ্য গুণ, কোনটিই গৌণ নয়। ঐ দুরকম কণা থাকলে দুটি গুণই সন্তানে মুখ্য হিসাবে প্রকাশিত হওয়াতে গুণটি মাঝামাঝি রঙের অর্থাৎ গোলাপি হয়েছিল। কিন্তু পরের প্রজন্মে নানা মিশ্রণের মধ্যে শুধু লাল ফুল হবার কণা যাদের ছিল তারা আবার ঠিক লাল হয়েছে, আর শুধু সাদা হবার কণা যাদের ছিল তারা আবার ঠিক সাদা হয়েছে। মেণ্ডেলের নিয়মের তাই কোন ব্যতিক্রম অন্তত এক্ষেত্রে হয়নি।

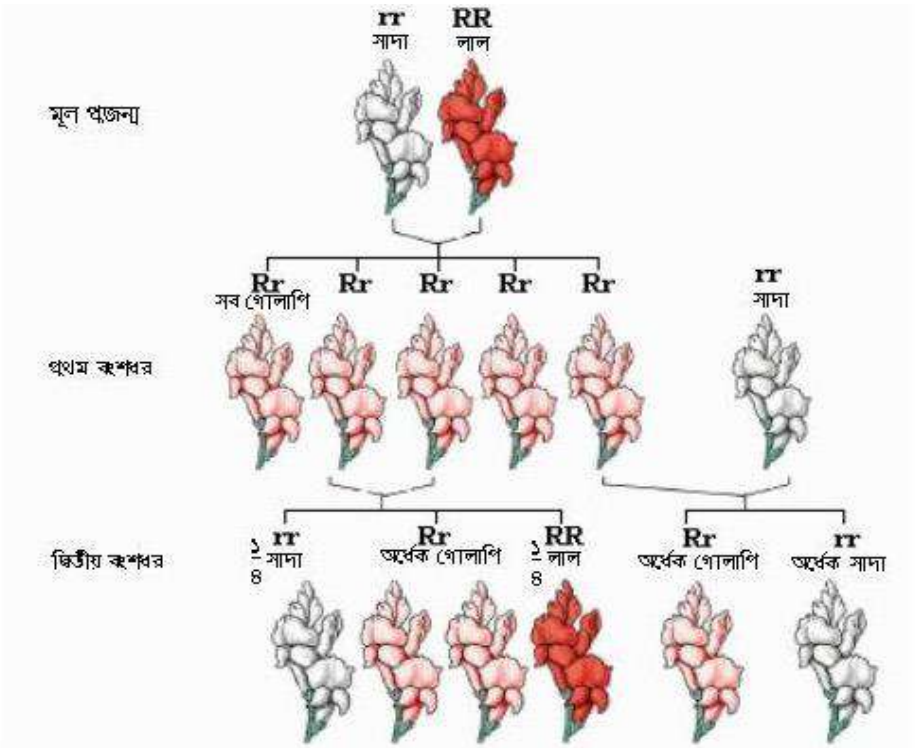

মটরশুটি ফুলের রঙের উপর মেন্ডেলের নিয়মের প্রয়োগঃ

লাল সাদা উভয়েরই সমান প্রাধান্য, তাই মাঝামাঝি রঙ গোলাপিও দেখা দেয়।

R= লাল হবার কণা, r= সাদা হবার কণা

এক গুণের সঙ্গে অন্য গুণের ঘনিষ্ঠতা

মেণ্ডেলের নিয়মের সত্যিকার ব্যত্যয়গুলো এসেছে অন্য দিক থেকে। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে অধিকাংশ স্বাভাবিক গুণের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ এক একটি

পরিবর্তিত রূপ দেখা যাচ্ছে, যেমন সব লাল ফুল এমন কোন উদ্ভিদের হঠাৎ কিছু অন্য রঙের ফুল। স্বাভাবিক ভাবে মনে করা হলো ঐ কল্পিত বংশগতির বাহক বা জিনের (কণা) মধ্যে কোন কারণে কিছু বৈকল্য দেখা দেয়ার ফলেই এমনটি হচ্ছে। এমন হওয়াটিকে বলা হয় মিউটেশন যার মানে বৈকল্য।

এসব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হলো ড্রসোফিলিয়া নামের এক প্রকার ফলের মাছিতে। ঘন ঘন ডিম পেড়ে বাচ্চা দেয় বলে এর মিউটেশনও হয় বেশি। এই কারণে এবং অন্যান্য কিছু কারণে এই মাছি নিয়ে পরীক্ষা চালানো সহজতর। দেখা গেল এদের নানা গুণের মধ্যে এবং তাদের নানা মিউটেশন হওয়া গুণের মধ্যে অধিকাংশ মেণ্ডেলের নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু কোন কোনটি আবার মানে না। যেমন এ মাছির স্বাভাবিক চোখের রঙ সাদা। কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু মাছি মিউটেশনের ফলে লাল চোখ হয়। একটি বিষয় লক্ষ্য করা হলো যে বাবা সাদা চোখের আর মা লাল চোখের হলে সব সন্তানই লাল চোখের হয়। কিন্তু মা যদি সাদা চোখের আর বাবা লাল চোখের হয় তা হলে সব পুরুষ বাচ্চারা সাদা চোখের আর সব স্ত্রী বাচ্চারা লাল চোখের হয়। বুঝা গেল যে লাল চোখ বা সাদা চোখ হওয়া তাদের কণা বা জিনের উপর নির্ভর করলেও তার সঙ্গে লিঙ্গের একটি সম্পর্ক রয়েছে। ইতোমধ্যে জীবকোষে বংশগতি নির্ধারণকারী জিনগুলোর এক রকম কিছু বাণ্ডিল ক্রোমোজোম আবিষ্কৃত হয়েছিল। পুরুষের লিঙ্গ XY এই ক্রোমোজোম জোড়া আর স্ত্রী লিঙ্গ XX এই ক্রোমোজোম জোড়া দিয়ে নির্ধারিত হয়। জোড়ার একটি বাবা থেকে ও অন্যটি মা থেকে আসে। মাছির ক্ষেত্রে চোখের রঙের বংশগতি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে চোখের রঙের জিনটির লালে মিউটেশন ঐ X ক্রোমোজোমের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রী জীবের সব সময় XX এই জোড়া থাকে, তাই মা লাল চোখ হলে যেহেতু মায়ের থেকে একটি X ক্রোমোজোম সব সন্তান পায় তাই মিউটেশন হওয়া ঐ জিন (লাল চোখের) সেই সঙ্গে সব সন্তানই পায়। সব সন্তানই তখন লাল চোখের হয়। কিন্তু মা সাদা চোখের হলে, আর বাবা লাল চোখের হলে স্ত্রী সন্তানরাই শুধু বাবার X ক্রোমোজোম পায় বলে শুধু তারাই বাবার লাল চোখের মিউটেশন হওয়া জিন পায়– ওরাই শুধু লাল চোখের হয়। পুরুষ সন্তানরা বাবার মিউটেশন হওয়া জিন (X ক্রোমোজোমে থাকা) পায়না বলে তাদের চোখ স্বাভাবিক সাদাই থাকে।

এভাবে দেখা গেল যে বেশ কিছু জিন অন্য জিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকে– অর্থাৎ একটির গুণ পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হলে অন্যটির গুণও সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। এদের জিনগুলো একই ক্রোমোজোমে

কাছাকাছি থাকে বলেই তা ঘটে এমন ভাবার কারণ রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে মেণ্ডেলের নিয়ম ঘটেনা, কারণ গুণগুলো পরস্পর স্বাধীন ভাবে পরবর্তী প্রজন্মে যায়না। আবার অন্য কিছু গুণ পরস্পরের থেকে একেবারেই স্বাধীন, তারা তাই মেণ্ডেলের নিয়ম অনুযায়ীই পরবর্তী প্রজন্মে যায়। এ ক্ষেত্রে এরা ভিন্ন ক্রোমোজোমে থাকে বা একই ক্রোমোজোমে পরস্পর থেকে বেশ দূরে থাকে বলেই মনে করা যায়। মেণ্ডেল মটরশুটির যে গুণগুলো নিয়ে কাজ করে তাঁর নিয়মটি খুঁজে পেয়েছিলেন ভাগ্যক্রমে তারা সবই এরকম ছিল।

কোন্ দুটি জিন পরস্পর ঘনিষ্ঠ, আর কোন্ দুটি জিন এত ঘনিষ্ঠ নয় এ সবের এক ধরনের মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে সেই আমল থেকেই। পরের প্রজন্মে একসঙ্গে যাওয়ার প্রবণতা কত কম বা কত বেশি সেই সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই এরকম মানচিত্র করা হয়। এমন মানচিত্র যে এখনো করা হচ্ছে এবং তা এখনো যে কীভাবে খুব কাজে আসছে সে সব আমরা পরে দেখবো। কিন্তু ঐ জিন-মানচিত্র প্রথম যখন তৈরি করা হচ্ছিল, তখন আমরা জানতামই না যে ঐ বাহক বা জিন জিনিসটি কী।

আবিস্কৃত হলো ডিএনএ'ই সেই বাহক

এক ধরনের 'কণা' সদৃশ জিন জীবের বিভিন্ন গুণকে বহন করে প্রতিলিপি হবার মাধ্যমে কোষ থেকে কোষে নিয়ে যায়, পরের প্রজন্মেও নিয়ে যায়, শুধু এই ধারণার ভিত্তিতে জেনেটিক্স বা বংশগতির বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তার কিছুটা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। অণুবীক্ষণে দেখে বুঝা গিয়েছিল জীবকোষের নিউক্লিয়াসে থাকা ক্রোমোজোমগুলোতে এই বাহক কণাগুলো সাজানো থাকে। বাবা থেকে পাওয়া একটি ক্রোমোজোম এবং মা থেকে পাওয়া একটি– এমনি এমনি জোড়ায় জোড়ায় থাকে দুই সেট ক্রোমোজোম। কোষ বিভাজনের সময় এরা প্রত্যেক কোষে মাইটোসিস নামে প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটির প্রতিলিপি তৈরি হয়ে এক জোড়া থেকে দুই জোড়া হয়ে দুই কোষে যায়। জনন কোষ (ডিম্ব কোষ বা শুক্র কোষ) তৈরি হবার সময় অবশ্য মেইওসিস নামে অন্য প্রক্রিয়ায় জোড়াটিই ভেঙ্গে যায় পরস্পরের মধ্যে ইতস্তত অংশ বিনিময়ের পর। এরপর কোষ বিভক্ত হলে জোড়ার এক একটি ক্রোমোজোম গিয়ে দুই সেটের বদলে প্রত্যেক জনন কোষে এক সেট ক্রোমোজোম হয়। পরে শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ মিলিত হয়ে সন্তানের কোষে যথারীতি আবার দুই সেট হয়ে যায়– এক সেট শুক্রকোষের মাধ্যমে বাবা থেকে, অন্য সেট ডিম্বকোষের মাধ্যমে মা থেকে। জনন কোষ তৈরির সময় ক্রোমোজোমে ইতস্তত অংশ

বিনিময়ের ফলে সন্তানের বিভিন্ন গুণের কোন কোনটা আসে বাবার থেকে, আর কোনটা মার থেকে, এদের কোনটি বা পরিবর্তিত রূপে। নানা জনন কোষে ক্রোমোজোমের অংশগুলো নানা ভাবে বিনিময় হয় বলে গুণগুলোর বন্টন নানা সন্তানে নানা রকম হয়।

এটিও বুঝা গেল যে প্রত্যেকটি বাহক বা জিন একটি সুনির্দিষ্ট প্রোটিন এনজাইম সৃষ্টি করে যা সুনির্দিষ্ট একটি গুণকে জৈব-রাসায়নিক ভাবে কার্যকর করে। সবগুলো জিন এভাবে বাবা-মা দুজনের কাছ থেকে পাই বলেই আমরা বাবা ও মা এর মত। এক্সরে বা এরকম অন্যান্য প্রভাব বিস্তারকারী বিকিরণের মধ্যে ড্রসোফিলিয়া মাছি বা অন্য জীবকে রাখলে তার কোষের কিছু কিছু জিনে মিউটেশন দেখা দেয়। আর এই মিউটেশন ঐ জিনের কার্যকারিতা বদলে দেয়– হয় ঐ সুনির্দিষ্ট এনজাইমটা তৈরি করতে দেয়না, কিংবা দিলেও বিকৃত ভাবে তৈরি করতে দেয়। যার ফলে ঐ জিনের সুনির্দিষ্ট গুণটি বদলে যায়। সব জীবের ক্ষেত্রেই এভাবে জিনের মিউটেশনের ফলে পরিবর্তন দেখা দেয়। মিউটেশনটি যদি জনন কোষে ঘটে, তা হলে পরের প্রজন্মেও ঐ বদলে যাওয়া গুণটি সৃষ্টি হয়। মিউটেশন অবশ্য আরো বহু কারণে ঘটতে পারে, অথবা কারণ ছাড়াই দৈবাৎও ঘটতে পারে।
এ সব কিছু ইতোমধ্যে জানা হয়েছিল এবং জেনেটিক্সের আরো অগ্রগতি হচ্ছিল। কিন্তু ঐ বাহক বা জিনটা যে আসলে কী সেটি কিন্তু তখন অবধি জানা যায়নি। এটি রহস্যময় হয়েই ছিল। শুধু জানা ছিল এটি রয়েছে কোষের নিউক্লিয়াসে, ক্রোমোজোমের মধ্যে।

কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের মধ্যে যে প্রোটিন রয়েছে তাতো বেশ কিছু দিন ধরে জানাই রয়েছে। পরে দেখা গেছে সেখানে প্রোটিন ছাড়াও নিউক্লিক এসিড বলে আর এক রকম অণু রয়েছে, নিউক্লিয়াসেই প্রধানত পাওয়া যায় বলেই ঐ নাম। এটি আবার ডি-অক্সিরিবো নিউক্লিক এসিড বা সংক্ষেপে ডিএন এ, এবং রিবোনিউক্লিক এসিড বা সংক্ষেপে আরএনএ, নামে দুরকমে রয়েছে, যাদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়– উভয়ের রাসায়নিক গঠন জানার মাধ্যমে তা বুঝা যাচ্ছিল। ক্রোমোজোমে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড এই দু'রকম জিনিস রয়েছে বলে বংশগতির বাহক ঐ জিন তা হলে হয় প্রোটিন হতে পারে, নইলে নিউক্লিক এসিড অর্থাৎ ডিএনএ বা আরএনএ ও হতে পারে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করতেন এটি কোন রকম প্রোটিন হবারই সম্ভাবনা বেশি। প্রোটিনের অণু অসংখ্য রকমের হতে পারে- জিন হবার জন্য যেটি সহায়ক। অন্য দিকে ডি এন এ'র (বা আর এন এ'র) অণুর মধ্যে বৈচিত্র ঘটার সুযোগ

অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু কোনটিই তখনো প্রমাণিত হয়নি, বংশগতির বাহক প্রোটিন নাকি ডি এন এ তা অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছিল। আর এন এ'কে হিসেবে না ধরে ডি এন এ'কে বিবেচনা করার কারণ হলো নিউক্লিয়াসে ডি এন এ'র অধিকতর উপস্থিতি।

অবশেষে ১৯৪৪ সালে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে এই ব্যাপারটি ফয়সালা হয়ে গেল। নিউমোনিয়ার জীবাণু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এটি সম্ভব হয়েছিল। এই জীবাণুর গবেষণায় পাওয়া গেল দু'রকমের জীবাণুর কলোনি। একটি সচরাচর সাধারণ নিউমোনিয়া জীবাণু যার উপরে একটি সুগার-আবরণ থাকে– তাই এর গা খসখসে। আর অন্যটি হলো একটি মিউটেশন হওয়া জীবাণু যার ঐ সুগার আবরণটি না থাকাতে সেটি মসৃণ। খসখসেগুলো নিউমোনিয়া সংক্রমণ করে, মসৃণগুলো করেনা। পরীক্ষাটিতে খসখসে জীবাণুর কলোনিকে উত্তাপ দিয়ে মেরে ফেলে তা মসৃণ জীবাণুর কলোনির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কাচের পাত্রে পুষ্টি মাধ্যমের মধ্যে এদের মিশ্রণকে যখন কালচার করা হয় তখন জীবন্ত মসৃণ জীবাণুগুলো পুষ্টি মাধ্যম ছাড়াও ঐ খসখসে জীবাণুর মৃতদেহও আত্মস্ত করে পুষ্টি হিসাবে । ঐ পাত্রের কোন অংশ নিউমোনিয়া সংক্রমণ করার কথা নয়– কারণ মসৃণ জীবাণু তা করতে পারেনা, আর খসখসেগুলো তো মৃত। কিন্তু সুস্থ ইঁদুরের দেহে পাত্রের এ মিশ্রণটি ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেখা গেছে যে এটি নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়েছে। এর থেকে একটি সিদ্ধান্তই নেয়া যায়– তা হলো মৃত খসখসে জীবাণুর কোন অংশ মসৃণ জীবাণুতে গিয়ে তাকে সংক্রমণকারীগুলোর মতই খসখসে আবরণ তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে, অর্থাৎ মৃত জীবাণু থেকে আবরণ তৈরির (সংক্রমণ ক্ষমতা দানের) জিন মসৃণ জীবাণুতে গেছে।মেরে ফেলার আগে খসখসে জীবাণুগুলোকে তেজষ্ক্রিয় ফসফরাস আইসোটোপ সমৃদ্ধ পুষ্টি মাধ্যমে রেখে কালচার করা হয়েছিল, যার ফলে তার ডি এন এ'র একটি উপাদান স্বাভাবিক ফসফরাসের বদলে তাতে তেজষ্ক্রিয় ফসফরাস যোগ হয়েছিল। পরে মৃত খসখসে জীবাণু থেকে জিন মসৃণ জীবাণুতে যাবার সময় সেই জিন যদি ডি এন এতে গঠিত হয় তা হলে তেজষ্ক্রিয় ফসফরাস মসৃণ জীবাণুতে যাবে এবং তেজষ্ক্রিয়তা উদ্ঘাটক যন্ত্রে তা অনায়াসে ধরা পড়বে। আর যদি জিন প্রোটিনে গঠিত হয় তা হলে এমন তেজষ্ক্রিয়তা সেখানে দেখা যাবেনা, প্রোটিন অণুতে ফসফরাস নাই বলে। সত্যি সত্যি ঐ সংক্রমণশীল হয়ে পড়া জীবন্ত জীবাণুতে তেজষ্ক্রিয়তা দেখা গেল। এভাবে প্রথম প্রমাণিত হলো যে বংশগতির ঐ বাহক হলো ডি এন এ, প্রোটিন নয়। পরে পরে আরো কিছু পরীক্ষার দ্বারা এটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে

টেষ্ট টিউবে অসংখ্য কোষ থেকে পৃথক করা ডিএনএ

বহুদিন ধরে যেই 'কণা' সদৃশ বাহক জীবের গুণাগুণ সমূহের কোড বা বার্তাকে বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে, ডিএনএ'ই সেই বার্তাবহ। এতবড় দায়িত্বের অধিকারী প্রমাণিত হবার পর স্বাভাবিকভাবে এই অবহেলিত জৈব অণুটির প্রতি বিজ্ঞানীদের আগ্রহ হঠাৎ খুবই বেড়ে গেল। তারই ধারাবাহিকতায় অল্প কিছু বছর পর ১৯৫৩ সালে ঘটেছে সেই যুগান্তকারী ঘটনা ডি এন এ'র গঠন আবিষ্কার, এবং সেই সঙ্গে জিনের প্রকৃতি উদ্ঘাটনে প্রথম পদক্ষেপ।

ডিএনএ'র গঠন, ডিএনএ'র কাজ

ডি এন এ'তে কী আছে ?

ডি এন এ'র গঠন আবিষ্কারের বহু আগে জীবকোষের নিউক্লিয়াসে ডি এন এ নামক অণু আবিষ্কৃত হবার পরপরই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এর উপাদানগুলো জানা গিয়েছিল। এর নামের শুরুতে যে ডি-অক্সিরিবো কথাটি এসেছে এর ডি-অক্সি রিবোজ নামের সুগারের কারণে। ডি এন এ'তে আছে এই সুগার। তাছাড়া আছে একটি ফসফেট অংশ। ঐ যে নিউমোনিয়া জীবাণু নিয়ে পরীক্ষায় ডি এন এ সনাক্ত করার জন্য তেজস্ক্রিয় ফসফরাস সাধারণ ফসফরাসের জায়গায় নিয়ে ঢুকানো হয়েছিল– তা এই ফসফেট অংশেই করা হয়েছিল। সুগার আর ফসফেট ছাড়া ডি এন এ'তে থাকে চার রকমের বেইস নামক অংশ। এরা হলো এ্যাডেনিন, থায়ামিন, গুয়ানিন এবং সাইটোসিন। নামের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী এরা যথাক্রমে A,T,G ও C এই ডাকনামেই পরিচিত। সব নমুনায় এদের সমান পরিমাণে পাওয়া না গেলেও দেখা গেছে এতে A ও T এর পরিমাণ সব সময় সমান, তেমনি G ও C এর পরিমাণ সব সময় সমান। আসলে A ও G পরিচিত দুটি পিউরিন নামক জৈব বস্তু, এবং T ও C অনুরূপ পরিচিত দুটি পিরামিডিন নামক জৈব বস্তু। রাসায়নিক ভাবে ডি এন এ'র এই উপাদানগুলোর কথা জানা থাকলেও এরা কী গঠন নিয়ে ডি এন এ'র মধ্যে আছে তা জানা ছিলনা। এর কাজকে বুঝতে গেলে সেই গঠন জানাটি জরুরী ছিল।

গঠন উদ্ঘাটিত

১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক ইংল্যাণ্ডের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এন এ'র গঠন উদ্ঘাটন করেছিলেন প্রধানত দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে। এর একটি হলো ডি এন এ'র কেলাসিত (কৃষ্টালাইজ্ড) রূপের এক্সরে ডিফ্রাকশন ছবির বিশ্লেষণ। আর অন্যটি হলো এর নানা উপাদানের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধনগুলোর প্রকৃতি, দূরত্ব, কোণ ইত্যাদির হিসাবের ভিত্তিতে সব কিছু যথাযথ ফিট করে বড় স্কেলে এমন মডেল তৈরি করে। কোন কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলো যখন নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর বিন্যস্ত হয়ে একটি কৃষ্টাল বা কেলাস গঠন করে তখন এর মধ্য দিয়ে এক্সরে চালনা করলে এক্সরে ঐ বিন্যাস অনুযায়ী কোথাও উচ্চকিত কোথাও অবদমিত হয় ও একটি প্যাটার্ন তৈরি করে– যেটি হলো এক্সরে'র ডিফ্রাকশান বা অপবর্তন। প্যাটার্নটি ধরা

পড়ে কৃষ্টালটিতে অপবর্তিত হওয়া এক্সরে ফটো তুল্‌লে। এরকম এক্সরে ছবির নানা অংশে দাগ কত ঘন বা ফিকে তার সূক্ষ্ম পরিমাপও বিশ্লেষণ করে কৃষ্টালটির গঠন বুঝা যায়। ডি এন এ'র মত বড় জটিল জৈব বস্তুর ক্ষেত্রে এই গঠন নির্ণয় বেশ দুরূহ। কিন্তু তা সম্ভব করেছিলেন এভাবে এক্সরে ডিফ্রাকশন বিশ্লেষণে পারদর্শী অন্য দুজন বিজ্ঞানী, যাদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা ছিল রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন নামক তরুণীর। তাঁর বহুদিনের সতর্ক ও পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে তোলা এক্সরে ছবি ডি এন এ গঠন আবিষ্কারে খুবই কাজে এসেছে। এ ছবির বিশ্লেষণ ও রাসায়নিক বন্ধনের মাপজোকের ভিত্তিতে ওয়াটসন ও ক্রিক কিছু ধাতবপাত, তার ইত্যাদিতে গড়া ডি এন এ'র একটি মডেল সার্থক ভাবে খাড়া করতে পেরেছিলেন। এই মডেলের সারল্য ও কার্যকারিতাটি স্পষ্টত বলে দিচ্ছিল যে গঠনটি সঠিক না হয়ে উপায় নাই।

ডি এন এ'র গঠন আবিষ্কার ছিল বিরাট যুগান্তকারী একটি ঘটনা, এবং স্বাভাবিক ভাবে এর আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীরা পরে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যে রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন ক্যানসারে মৃত্যুবরণ করেন, খুব সম্ভব এক নাগাড়ে দীর্ঘদিন এক্সরে নিয়ে কাজ করার ফলে। তাই তিনি পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এ ভাবে উদ্ঘাটিত ডিএনএ গঠনটি কী এবার তাই দেখা যাক। ডি-অক্সি রিবোজ সুগার এবং ফসফেট পর পর পরস্পর সংযুক্ত থেকে তৈরি করে ডি এন এ'র মেরুদণ্ড। দীর্ঘ চেইনের আকারে এরকম দুটি মেরুদণ্ড ডি এন এ'র দুটি সূত্র রূপে পরস্পরকে প্যাঁচিয়ে থাকে একটি কাল্পনিক অক্ষের চারিদিকে হেলিক্স বা সর্পিল আকৃতিতে। এ জন্যই ডি এন এ'র আকৃতিকে এক কথায় ডাবল হেলিক্স বলা হয়। প্রত্যেকটি সূত্রের মেরুদণ্ডে সর্বত্র একটি রিবোজ ও একটি ফসফেট অংশ পর পর পুনরাবৃত্ত হতে থাকে বহু দীর্ঘ একটি শেকলের আকারে। এমন ভাবে এরা প্যাঁচানো থাকে যেন সর্বত্র দুটি মেরুদণ্ড সব সময় পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে থাকে। মনে করা যায় এই দুটি সূত্র হলো একটি প্যাঁচানো মইয়ের দুই দিকের দুটি প্যাঁচানো খাড়া দণ্ড। এখন মইয়ের প্রত্যেকটি ধাপ সৃষ্টি হয় দুই সূত্রের মুখোমুখি দুটি রিবোজের প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত একটি করে বেইস, প্রত্যেকটি সূত্র থেকে হেলিক্সের ভেতরের দিকে অভিমুখি। একটি সূত্রের সঙ্গে যদি একটি পিউরিন বেইস যুক্ত থাকে (A অথবা G) তা হলে ঐ ধাপে অন্য সূত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে একটি পিরামিডিন বেইস (T অথবা C)। এভাবে মইয়ের প্রত্যেক ধাপ তৈরি হয় এক জোড়া বেইস দিয়ে। পিউরিন অপেক্ষাকৃত বড় ও পিরামিডিন ছোট হওয়াতে উভয়ে মিলে সূত্র দুটির দূরত্ব সমান থাকে,

এবং দুটি বেইসের মাঝে একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বন্ধন থাকে। ফলে বিশেষ পরিস্থিতিতে এখানে দুটি সূত্র আলাদা হতে পারে, আবার জোড় লাগতেও পারে। তাছাড়া আর একটি শর্ত এর গঠনে খুব স্পষ্ট– যেটি ডিএনএ'র কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা হলো কোন ধাপে একটি সূত্রের সঙ্গে বেইস যদি A হয় তা হলে তার বিপরীতে অন্য সূত্রে বেইস অবশ্যই থাকবে T, এবং একই ভাবে একটি সূত্রে G থাকলে তার বিপরীতে অবশ্যই থাকবে C। এ ভাবে A সব সময় T এর সঙ্গে জোড় নেয়, T সব সময় A'র সঙ্গে নেয়। তাই A ও T কে বলা হয় পরস্পর সম্পূরক বেইস। তেমনি G আর C হলো পরস্পর সম্পূরক বেইস। ডিএনএ'তে যে সব সময় A এর পরিমাণ T এর

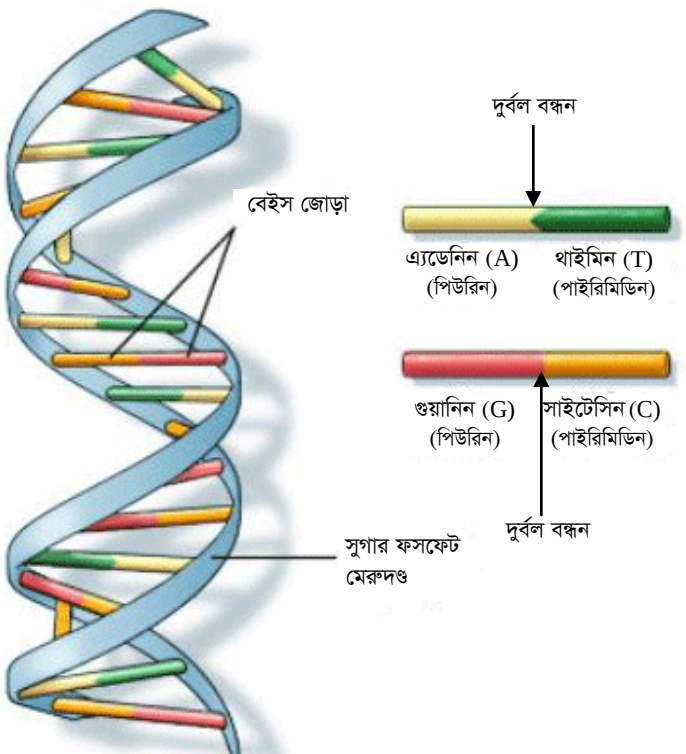

ডিএনএ'র গঠন
(ডানে সম্ভাব্য বেইস জোড়াগুলো আলাদা দেখানো হয়েছে)

এবং G এর পরিমাণ C এর সমান থাকে এটিই তার কারণ। দীর্ঘ ডাবল হেলিক্স আকৃতির ডিএনএ'র প্রতিটি একক অংশ এ ভাবে গঠিত হয়– দুই সূত্রে

দুটি সুগার ফসফেট আর তাদের সংযুক্ত বেইস জোড়া (A ও T অথবা G ও C)। দুপাশের মেরুদণ্ডের সংলগ্ন অংশসহ এরকম একটি একক অংশকে বলা হয় একটি নিউক্লিয়োটিড। পর পর অনেকগুলো নিওক্লিয়োটিডের প্যাঁচানো শেকলই হলো ডিএনএ।

ডি এন এ'র এই সরল সুন্দর গঠনটি নিজেই যেন বলে দিচ্ছে কীভাবে জীবনের নানা গুণের বার্তা এতে লিপিবদ্ধ থাকে আর কীভাবে এটি প্রতিলিপি হয়ে সব বার্তা হুবহু কোষ থেকে কোষে যেতে পারে। এর বিভিন্ন ধাপে A ও T (অথবা T ও A) এবং C ও G (অথবা G ও C) জোড়া বেইসগুলো শেকলের মধ্যে পর পর নানা ক্রমে থাকতে পারে যার ফলে এই চারটি বেইসের ভাষাতেই অসংখ্য রকম কোড বা বার্তা তৈরি হতে পারে। এর প্রত্যেকটি বার্তা হলো একটি জিন যা সেই মেণ্ডেলের নিয়মের 'কণার' মত করেই স্বাধীন ভাবে একটি গুণের কোড হিসাবে কাজ করতে পারে। অন্য দিকে ডি এন এ'র দুই সূত্র পৃথক হয়ে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি সূতন সূত্র সংশ্লেষিত হতে পারে– এখন একা হয়ে যাওয়া প্রত্যেকটি বেইসের সঙ্গে কোষে উপস্থিত নানা নিউক্লিয়োটিডের মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট একটি নূতন নিউক্লিয়োটিড সংযুক্ত হয়– A এর সঙ্গে T, এবং G এর সঙ্গে C জোড় নেবার বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে। এভাবে একটি ডি এন এ হুবহু একই রকম দুটি ডি এন এ'তে পরিণত হতে পারে সুন্দর সরল প্রক্রিয়ায়। এ বিষয়গুলো এখন আমরা আরো বিস্তারিত দেখবো।

ডিএনএ'র প্রতিলিপি কীভাবে হয়

ডি এন এ গঠন আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যে এর প্রতিলিপি হবার তত্ত্বটিও পরীক্ষণের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিলিপি হবার ঘটনাটির নানা পর্যায় ঘটে বিভিন্ন এনজাইমের কাজের ফলে। এই এনজাইমগুলো আবার ডি এন এ'র বার্তা অনুযায়ীই তারই অংশগ্রহণে তৈরি হয়- অন্য সব প্রোটিন যেমন ভাবে তৈরি হয়। যথাযথ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখা দিলে একটি এনজাইম কোষের নিউক্লিয়াসে ডি এন এ'র সূত্র দুটিকে অনেকটা জ্যাকেটের জিপার খোলার মত ক্রমান্বয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে। যেহেতু নূতন ডি এন এ সৃষ্টি হবার মত নানা উপাদান আশে পাশেই প্রচুর থাকে, সেই উপাদানগুলো জুড়ে জুড়ে বিচ্ছিন্ন পুরানো প্রত্যেকটি সূত্রের সঙ্গে একটি নূতন ডি এন এ সূত্র তৈরি হতে পারে। এতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন আগের সূত্রদুটির প্রত্যেকটি একটি ছাঁচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছাঁচের বেইসগুলোর বিপরীতে এখন তাদের সম্পূরকটি বসবে– যেমন A এর বিপরীতে T। এই নূতন ডি এন এ সংশ্লেষণের

কাজটিও করে কিছু বিশেষ এন-জাইম। এভাবে প্রত্যেকটিতে পুরাতনে নূতনে মিলে দুটি সূত্রের একটি জোড়া তৈরি হলো। অন্য রকম এনজাইম জোড়াটিকে

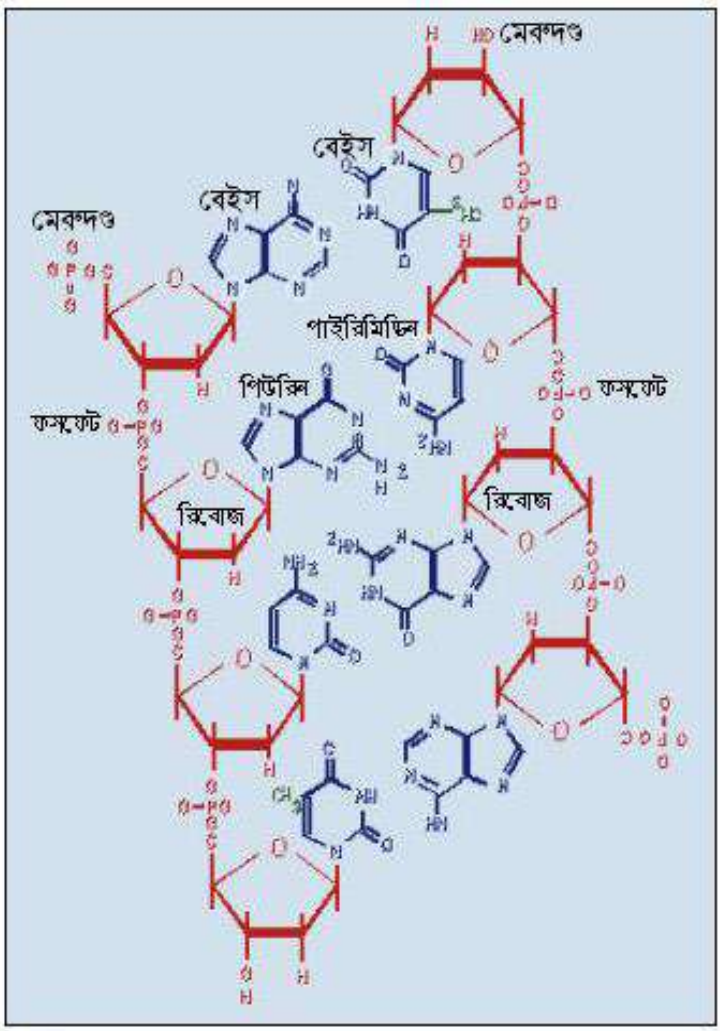

ডিএনএ গঠন (বিভিন্ন পরমাণু বিন্যাস)
দুই মেরুদণ্ডের মাঝে পিউরিন-পাইরিমিডিন (বেইস) জোড়া

ঘনিষ্ট ডাবল হেলিক্স বন্ধনে নিয়ে আসে অনেকটা জিপার বন্ধ করার মত। ফলে একটি ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের বদলে হুবহু দুটি ডিএনএ ডাবল হেলিক্স সৃষ্টি হলো।

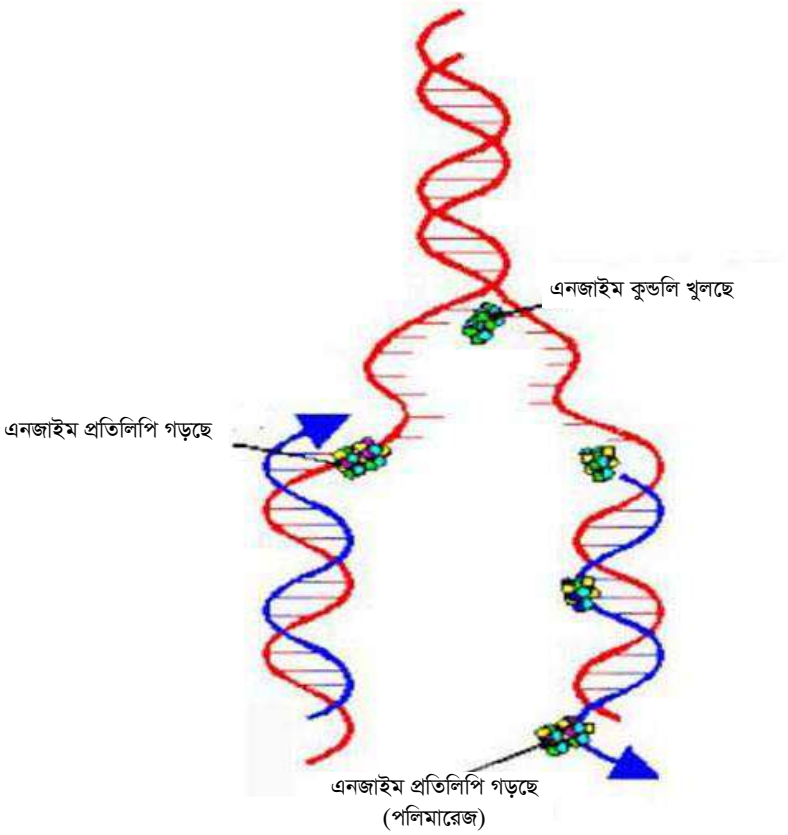

ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরি

এ ভাবে সৃষ্টি হওয়া প্রত্যেকটি ডি এন এ'র একটি সূত্র যে পুরাতন এবং একটি সূত্র যে নূতন এই বিষয়টিকে সুন্দর একটি পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রতিলিপি হবার পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রমাণ করছে। ই-কলাই ব্যাকটেরিয়াকে চেপ্টা কাচ পাত্রে (পেট্রি ডিশে) এমন পুষ্টি-মাধ্যমে কালচার করা হলো যেখানে স্বাভাবিক নাইট্রোজেন N^{14} এর বদলে ভারি নাইট্রোজেন N^{15} ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে এই ই-কলাইগুলোর কোষে নূতন ডি এন এ'র উপাদান হবার যে বেইসগুলো তাদের অণুতে নাইট্রোজেন পরমাণুগুলো ভারি প্রকৃতির। যে ব্যাকটেরিয়া কালচার হবে তাদের ডি এন এ'ও তাই অপেক্ষাকৃত ভারি হবে। এভাবে প্রতিলিপি হবার এক একটি প্রজন্মের পর ব্যাকটেরিয়া থেকে ডি এন এ আলাদা করে তাদেরকে সেন্ট্রিফি-উজ যন্ত্রে অত্যন্ত দ্রুত

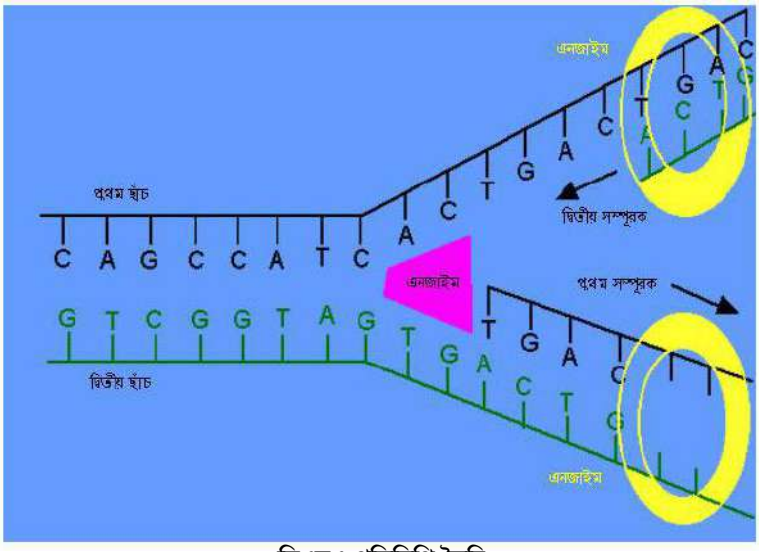

ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরি

গতিতে ঘুরানো হলো। এভাবে ঘুরালে অপেক্ষাকৃত ভারিগুলো অক্ষ থেকে অপেক্ষাকৃত একটু দূরে গিয়ে জমে, হালকাগুলো কাছে জমে। দেখা গেল কোষ একবার বিভাজিত হবার পর অর্থাৎ ডি এন এ একবার প্রতিলিপি হবার পর সেন্ট্রি-ফিউজ করলে তা জমে দূরেও নয়, কাছেও নয়, ভারি হওয়া আর হালকা হওয়ার মাঝামাঝি জায়গায়। এর কারণ ঐ N^{15} ভারি নাইট্রোজেন যুক্ত ভারি ডি এন এ সব ডাবল হেলিক্সের একটি সূত্রে (নূতন সূত্রটিতে) রয়েছে। আর পুরানো সূত্রটিতে রয়ে গেছে আদি কোষের স্বাভাবিক হালকা নাইট্রোজেন N^{14} যুক্ত ডি এন এ। ভারি ও হালকা মিলিয়ে মাঝারি ওজনের হওয়াতে এটি মাঝা-মাঝি জায়গায় গেছে। এরপর স্বাভাবিক হালকা N^{14} যুক্ত পুষ্টি-মাধ্যমে কালচার করে পরের প্রজন্মের ডিএনএ'র সেন্ট্রিফিউজে দেখা গেল ডি এন এ দুটি জায়গায় জমেছে। একটি আগের মত ভারি ও হালকার মাঝামাঝি জায়গায়, আর অন্যটি হালকার জায়গায়। বুঝা গেল পরের বারের প্রতিলিপিতে দুটি ডাবল হেলিক্স এবার চারটি হবার সময় তার দুটিতে আগের ভারি সূত্রের সঙ্গে নূতন তৈরি হওয়া হালকা সূত্র জোড় নিয়েছে (এরা মাঝামাঝি জায়গায়), আর অন্য দুটিতে আগের হালকা সূত্রের সঙ্গেই নূতন তৈরি হওয়া হালকা সূত্র জোড় নিয়েছে (এরা হালকার জায়গায়)। প্রতিলিপি হবার প্রক্রিয়াটি এভাবে সুন্দর প্রমাণিত হলো, প্রক্রিয়া থেকে যেমন আশা করা হয় পরীক্ষণে তাই দেখা গেল বলে।

বার্তা কী ভাবে বাস্তবায়িত হয়

আমরা দেখেছি অতীতের নানা গবেষণায় এটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েই ছিল যে বংশগতির বার্তাবাহক জিন সেই বার্তাকে বাস্তবায়িত করে এক একটি জিনের দ্বারা এক একটি এনজাইম সৃষ্টির মাধ্যমে। সব কাজের কাজী হিসাবে এরকম এক একটি এনজাইম প্রোটিনই আসলে শেষ পর্যন্ত এক একটি বার্তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। ডি এন এ'র কাজ হলো তাই নিজের বার্তা অনুযায়ী প্রোটিনটি তৈরি করা। প্রত্যেক প্রোটিন অবশ্য কয়েকটি এমাইনো এসিডের গ্রথিত চেইনের মত, যে চেইন নানা রকম ভাঁজ নিয়ে প্রোটিনে রূপ পায়। ভাঁজ কী রকম হবে তাও অবশ্য ঠিক করে দেয় ঐ চেইনে এমাইনো এসিডের পরম্পরায়টি। কারণ এক বিশেষ এমাইনো এসিডের সঙ্গে বিশেষ অন্যটির এক রকম আসক্তির কারণেই চেইনটি আঁকাবাকা হয়ে ভাঁজ নেয়। কাজেই মূলত ঐ এমাইনো এসিড পরম্পরায়টিই নির্দিষ্ট করে দেয়ার মাধ্যমে প্রোটিন চেইনটি গড়াই হল বার্তার দায়িত্ব। এমাইনো এসিড নামক এই গুরুত্বপূর্ণ অণুগুলো রয়েছে মোট ২০ রকমের, জীবকোষে যাদের যোগান থাকে। ওদের মধ্য থেকে নিয়েই কয়েকটির নানা সমন্বয়ে ঐ চেইন গড়তে হয় এক একটি প্রোটিনের ক্ষেত্রে। শেষ পর্যন্ত ডি এন এ'র নিউক্লিয়োটিড চেইনে বেইস পরম্পরায়ের বার্তাটিকেই প্রোটিনের চেইনে এমাইনো এসিডের পরম্পরায়ে রূপান্ত-রিত করাটাই হলো এ বার্তা বাস্তবায়নের মূল কাজ।

প্রোটিন চেইন সৃষ্টির কাজটি কোথায় ঘটছে দেখার জন্য কিছু পরীক্ষণে এমাইনো এসিডে থাকা কার্বনকে তেজস্ক্রিয় কার্বন দিয়ে বদলে নিয়ে সেগুলোই জীবকোষে প্রোটিন সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে জীবকোষের যেখানে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে সেখানটিতে তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়বে। দেখা গেছে এমন তেজস্ক্রিয়তা নিউক্লিয়াসের মধ্যে বা কোষের অন্যান্য অংশে যতটা না দেখা যাচ্ছে প্রতি গ্রাম প্রোটিন পিছু তার দ্বিগুণ দেখা যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের বাইরে রিবোজোম নামক ছোট অংশগুলোতে। অর্থাৎ নূতন তৈরি হওয়া প্রোটিনের সমাবেশটি হচ্ছে ঐ রিবোজোমেই। এর থেকে শিগ্‌গির বুঝা গেল যে জীবকোষে প্রোটিন তৈরির কারখানা ঐ রিবোজোমের সঙ্গেই জড়িত। আবার অন্য পরীক্ষণে দেখা গেল প্রোটিন তৈরির এ কাজের সঙ্গে ডি এন এ ছাড়াও আর এন এ'ও জড়িত রয়েছে। আমরা দেখেছি নিউক্লিক এসিড শুধু ডি এন এ রূপে নয় এর থেকে সামান্য ভিন্ন আর এন এ রূপেও জীবকোষে থাকে। দেখা গেল আর এন এ'কে ভেঙ্গে ফেলতে পারে এমন এনজাইম জীবকোষে ঢুকালে

প্রোটিন সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়– এর থেকে বুঝা যায় এ কাজে আর এন এ অপরিহার্য। তবে মনে রাখতে হবে যে আর এন এ অণুগুলো ডি এন এ'র মত জীবকোষে স্থায়ী জিনিস নয়। ডি এন এ'র একটি কাজ যেমন প্রোটিন তৈরি, আর একটি কাজ কয়েক রকমের আর এন এ সব সময় তৈরি করা। ডি এন এ নিজে অক্ষয় জিনিস, এটিই কোষ থেকে কোষে প্রতিলিপি হয়, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে যায়।

শেষ পর্যন্ত গবেষণায় পুরো প্রক্রিয়াটিই উদ্ঘাটিত হয়েছে। ডি এন এ সরাসরি নিজে প্রোটিন তৈরি করেনা, এটি সে করে আর এন এ'র মধ্যস্থতায়। ডি এন এ নিউক্লিয়াসে থাকলেও নিউক্লিয়াসে প্রোটিন তৈরি হয়না। ম্যাসেঞ্জার আর এন এ (এম আর এন এ) নামক আর এন এ সংশ্লেষিত হয়ে তা ডি এন এ'তে থাকা বার্তাকে নকল করে এনে নিউক্লিয়াসের বাইরে রিবোজোমের কাছে চলে আসে। সেখানে এটি নকল করা বার্তাটি ট্রান্সলেশন আর এন এ (টি আর এন এ) নামক অন্য আর এন এ'র কাছে হস্তান্তর করে। এই শেষোক্ত টি আর এন এ'গুলোর সঙ্গে আটকানো থাকে বিশেষ বিশেষ এমাইনো এসিড। তারা রিবোজোমের সহায়তায় ম্যাসেঞ্জার আর এন এ'র বয়ে আনা বার্তা অনুযায়ী ঐ এমাইনো এসিডগুলোকে চেইনে সাজিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রোটিনটিকে তৈরি করে।

আর এন এর গঠনটির পরিপ্রেক্ষিতে উপরের কাজগুলো এটি কীভাবে করে তা দেখা যাক। আর এন এ প্রায় হুবহু ডি এন এ'র একটি সূত্রের মত। ডি এন এ'তে দুটি সূত্র পরস্পর প্যাঁচিয়ে থাকলেও আর এন এ'র সূত্র শুধু একটি। অন্য তফাৎ হলো ডিএনএতে যেখানে থায়ামিন বা T বেইসটি থাকে, আর এন এ'তে তার বদলে সেখানে থাকে ইউরাসিল বা U নামক অন্য একটি বেইস। T যেমন A এর সম্পূরক, আর এন এ'র U'ও সেরকম A এর সম্পূরক। আর এন এ কর্তৃক প্রোটিন তৈরির কাজটিকে দুটি ধাপে দেখা যায়। ঐ যে এটি ডি এন এ থেকে বার্তাটি নকল
করলো তাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন বা বার্তা লিখন। এ সময় ডি এন এ'র দুটি সূত্র এনজাইমের প্রভাবে পৃথক হয়ে যায়, এর মধ্যে শুধু একটি সূত্রের ট্রান্সক্রিপশন ঘটে, অন্যটি একাজে লাগেনা। তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি নাই কারণ বার্তাটি তো দুই সূত্রেই একই থাকে একটিতে অন্যটির সম্পূরক থাকার কারণে। যেই সূত্রের ট্রান্সক্রিপশন হলো তার সম্পূরক বেইসের পরম্পরায় অনুযায়ী এম আর এন এ (বার্তাবহ আর এন এ) সংশ্লেষিত হয়ে যায় এনজাইমের কাজের ফলে– অর্থাৎ ডি এন এ সূত্রটি এখানে এম আর এন এ'র সংশ্লেষনের

ছাঁচ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐ ভাবে বার্তাটির প্রতিলিপিকে নিজের গঠনের মধ্যে বহন করে এমআরএনএ চলে আসে রিবোজামের কাছে।

সেখানে এবার এম আর এন এ নিজেই ছাঁচের কাজ করে বার্তাকে এমাইনো এসিডের ভাষায় পরিণত করার জন্য। একে বলা হয় ট্রান্সলেশন বা 'অনুবাদ' বেইসের ভাষার বার্তাকে এমাইনো এসিডের ভাষায়। কিন্তু এখানটিতে এসে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এক একটি এমাইনো এসিডের সঙ্গে বার্তার এক একটি অংশের সম্পর্কটি কী। স্পষ্টত একটি বেইস, বা কয়েকটি বেইসের একটি বিশেষ পরম্পরায়ে থাকা গুচ্ছের সঙ্গে, একটি মাত্র বিশেষ এমাইনো এসিডের এরকম সম্পর্ক থাকতে হবে। অনুবাদটি হতে হলে বেইসের ভাষার এক একটি এরকম গুচ্ছ দ্বারা (বলা যায় 'শব্দ') এমাইনো এসিডের ভাষার কোন্ এমাইনো এসিডকে বুঝাবে তার একটি 'অভিধান' থাকতে হবে। ঐ এক একটি বেইস গুচ্ছের নাম দেয়া হয়েছে কোডন। ইলেকট্রিসিটির একককে ইলেকট্রন, ফটো বা আলোর একককে ফোটন, এরকম রেওয়াজ থেকেই বার্তা বা কোডের একককে নাম দেয়া হয়েছে কোডন। এই কোডনের প্রকৃতিটি এবং এই 'অভিধানের' আবিষ্কার জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর একটি অত্যন্ত বড় ঘটনা।

ভাষার যে উপমা ব্যবহার করছি তাতে এক একটি কোডন যেন এক একটি 'শব্দ' যার অর্থটি হলো একটি বিশেষ এমাইনো এসিড। ডি এন এ'তে সঠিক পরম্পরায়ে বেশ কিছু কোডন পর পর থাকলে তা একটি জিন তৈরি করে, যা একটি সম্পূর্ণ বার্তা দেয়। এ যেন শব্দ গেঁথে গেঁথে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি হওয়া। কোডন অনুযায়ী এমাইনো এসিড গেঁথে প্রোটিন তৈরি হলেই জিনটি কার্যকর হয়– যেন বার্তার বাক্যটিই এভাবে কাজে পরিণত হলো। আর কোডন বা বেইস গুচ্ছ যে ক'টি বেইস দিয়ে গঠিত তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি 'বর্ণ' মনে করা যায় যারা 'শব্দ' গঠন করছে। ডি এন এ'র ভাষায় অবশ্য 'বর্ণ' মাত্র চারটি, কারণ বেইস রয়েছে চারটি A,T,G ও C এই চারটি অণু।

কোডন অভিধান উদ্ঘাটিত হলো

দেখলাম একটি এমাইনো এসিডের জন্য বার্তার একটি অথবা পর পর কয়েকটি বেইসের একটি গুচ্ছ দায়ী থাকবে, কিন্তু সেই সংখ্যাটি কত? গুচ্ছে বেইসের সংখ্যা একটি হলে চারটি বেইস মাত্র চারটি এমাইনো এসিডের জন্য দায়ী হবে, কিন্তু এমাইনা এসিড তো ২০টি, বাকিগুলোর কী হবে? দুটি করে যদি নেয়া হয়

৪টি বেইস দুটি করে ১৬ রকমে সাজানো যায়– তাই ১৬টি এমাইনো এসিডের জন্য কোডন পাওয়া যায়, কিন্তু তাও ২০টি হয়না। প্রতিটি কোডন যদি পর পর তিনটি বেইসে গড়া হয় তা হলে সমস্যা থাকেনা, কারণ ওভাবে ৬৪টি কোডন তৈরি হতে পারে- কাজেই প্রায়োজনের অতিরিক্তই বরং পাওয়া যায় সেভাবে। এদিক থেকে ন্যূনতম সংখ্যা হিসাবে তিন বেইসের কোডনই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু পরীক্ষণে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়না।

এজন্য একটি পরীক্ষণ হয়েছে এমন একটি ভাইরাস দিয়ে যা ব্যাকটোরিয়াকে আক্রমণ করে, যেরকম ভাইরাসকে বলা হয় ব্যাকটেরিও ফেইজ বা ফেইজ। এই ভাইরাসকে বিশেষ বিশেষ ক্যামিকাল্‌স দিয়ে আক্রান্ত করে তার ডি এন এ'তে মিউটেশন সৃষ্টি করা যায়। ডি এন এ'তে মিউটেশন হবার অর্থ হলো বেইসের ক্রমে পরিবর্তন ঘটা– হয়তো একটি বেইস যোগ করা অথবা একটি বেইস কমিয়ে ফেলা, অথবা একাধিক বেইসে কোন সংখ্যায় তা করা। ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ক্যামিক্যাল্‌স প্রয়োগ করে মিউটেশন সৃষ্টি করে একটি, অথবা দুটি অথবা তিনটি বেইস ফেইজের ডি এন এ'তে একই জায়গায় বাড়াবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এভাবে করে দেখা যায় যে ডি এন এ'র শুরুতে একটি বেইস বাড়াবার মত মিউটেশন সৃষ্টি করা হলে ব্যাকটেরিয়াতে সেই ফেইজ ভাইরাস কার্যকর হতে পারেনা। শুরুতে দুইটি বেইস বাড়াবার মত মিউটেশন সৃষ্টি করলেও একই ব্যাপার ঘটে, এটি কার্যকর হতে পারেনা। কিন্তু শুরুতে তিনটি বেইস বাড়াবার মত মিউটেশন যদি সৃষ্টি করা হয় তখন কিন্তু এটি স্বাভাবিকের মতই কার্যকর হয়– এত বড় মিউটেশন সত্ত্বেও। এ ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার একটিই পথ আছে– কোডনকে তিন বেইসে গড়া বলে মনে করা। অর্থাৎ ডি এন এ'তে শুরুর প্রান্ত থেকে তিনটি তিনটি করে বেইস নিয়ে এভাবে এক একটি কোডন 'পড়ে' যেতে হয়। যদি একটি অতিরিক্ত বেইস শুরুতে ঢুকে তা হলে পড়ার সময় ভুল জায়গা থেকে শুরু করে তিনটি তিনটি গুণা হবে বলে সব গোলামাল হয়ে যাবে– কারণ নূতনটি ঢুকার ফলে সেটি ও তার সংলগ্ন আর দুটি বেইস নিয়ে অন্য রকম একটি কোডন হবে, এবং তারপরেরগুলোও অন্য রকম কোডন হবে। আগের কোডন গুলোর বার্তার কিছুই ঠিক থাকবেনা। ফলে সঠিক বার্তার অভাবে ডি এন এ কাজ করতে পারবেনা। দুটি নূতন বেইস ঢুকলেও একই ঘটনা হবে। কিন্তু শুরুতে তিনটা বেইস ঢুকলে একটি পুরো অতিরিক্ত কোডন এবার যোগ হবে, যার জন্য হয়তো বাড়তি একটি এমাইনো এসিড তৈরি হবে। এ ছাড়া ডি এন এ'র বাকি কোডনগুলো পূর্ববৎ পড়ে নিয়ে হুবহু আগের মত পেতে কোন অসুবিধা হবে

না। কাজেই ডি এন এ কার্যকর থাকবে। তিনটার বদলে চারটি নূতন ঢুকলে কিন্তু আবার সেই গোলমাল শুরু হয়ে যায়। এভাবে প্রমাণিত হলো যে কোডন তিনটি বেইসেই তৈরি হয়, তার কমও নয়, বেশিও নয়।

একটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ একটানা ডিএনএ বেইস ক্রমের মধ্যে তিনটি তিনটি করে বেইস এক একটি কোডন যে গঠন করে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ফাঁক বা যতি চিহ্ন নাই যা কোডেনগুলোকে আলাদা করে। এক প্রান্ত থেকে তিনটা করে গুণে এমনিতেই তারা পৃথক হিসাবে নির্ধারিত হয়। যেহেতু প্রত্যেকটি কোডন ব্যতিক্রমহীন ভাবে তিন বেইসে গড়া– তাই এটি সম্ভব

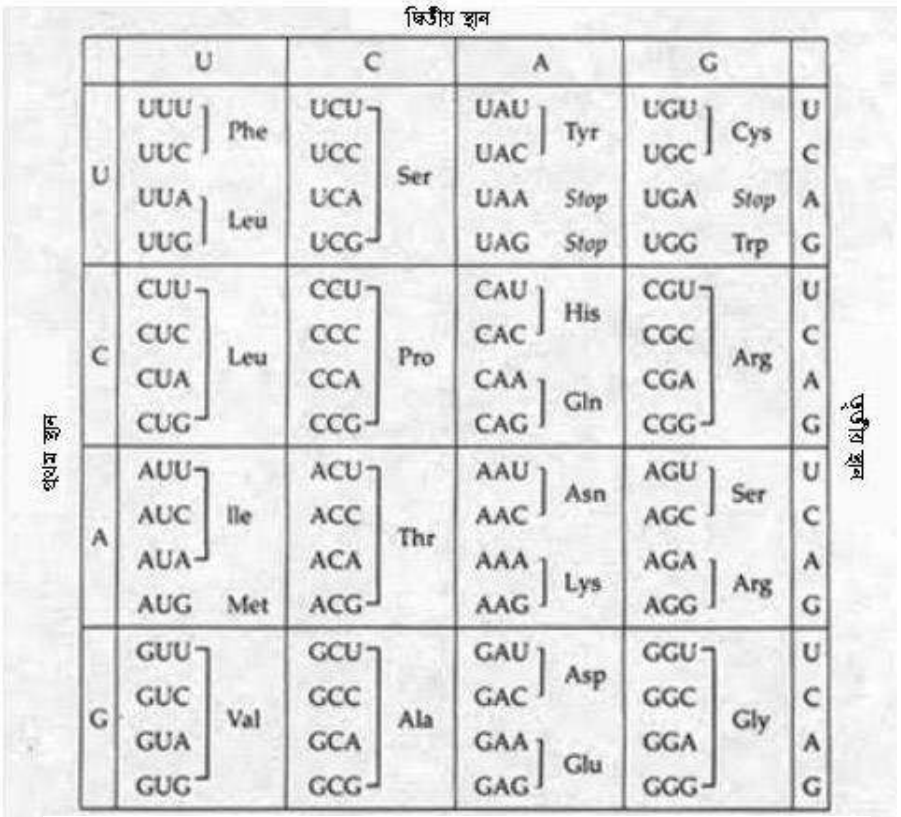

কোডন অভিধান

phe, ser ইত্যাদি বিভিন্ন এমাইনো এসিডের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।
তিনটি কোডন (UAA,UAG, ও UGA) হলো ষ্টপ কোডন।

হচ্ছে। ভাষার উপমায় বলতে গেলে এখানে সব শব্দই তিনটি বর্ণে তৈরি হয়, তাই শব্দগুলোর মধ্যে কোন ফাঁক বা কমা না থাকা সত্ত্বেও তিনটি তিনটি বর্ণ

নিয়ে পড়ে যেতে অসুবিধা হয় না। কোডনে বেইসের সংখ্যা যে তিনটি সেটি না হয় বুঝা গেল, কিন্তু কোন্ তিনটি নিয়ে তৈরি কোডন যে কোন্ এমাইনো এসিডের কোড হয় তা জানবো কী করে? সেটি জানতে হলো সত্যি সত্যি কোন্ কোডন কোন্ এমাইনো এসিড গ্রথিত করছে সেটি লক্ষ্য করে। এর জন্য শুরুটা করা হলো এভাবে।

একটি বিশেষ ধরনের আর এন এ'কে বলা হয় পলিইউরিডাইলিক এসিড– এর বৈশিষ্ট হলো এতে শুধু আগাগোড়া একই বেইস ইউরিক এসিড U। অর্থাৎ এই আর এন এ'র বেইস ক্রম হলো U U U U U U এমনি ভাবে। জীবকোষের নির্যাসে এই আর এন এ মিশিয়ে সেখানে একটি প্রোটিন তৈরি হতে দেখা গেল– যার এমাইনো এসিড চেইনে শুধু একটি এমাইনো এসিডই বার বার পুনরাবৃত্ত হয়– তা হলো ফিনাইলেলেনাইন যাকে সংক্ষেপে লেখা হয় Phe। অর্থাৎ U U U U U U U এই আর এন এ দিয়ে তৈরি প্রোটিন হচ্ছে Phe-Phe-Phe এই ক্রমে। স্পষ্টত U U U এই তিন বেইসের কোডনটি Phe এর এমাইনো এসিডের কোড। এটি ভাগ্যক্রমে বেশ সহজে পাওয়া গেল। এভাবে একই রকম পদ্ধতিতে অন্যান্য এমাইনো এসিডের কোডনগুলোও উদ্ঘাটিত হয়েছে– ২০টিরই কোডন। এদের মধ্যে অধিকাংশেরই একাধিক কোডন রয়েছে। তিন বেইসের কোডন যখন ৬৪টি হতে পারে ২০টি এমাইনো এসিডের জন্য তাতে একই এমাইনো এসিডের কোডন একাধিক হতে অসুবিধা কোথায়। উদাহরণ স্বরূপ UUU যেমন ফিনাইলেলেনাইনের কোডন, তেমনি UUC ও তারই কোডন। দুটির যে কোনটিতেই ঐ এমাইনো এসিডটি তৈরি হয়। এভাবে একটি এমাইনো এসিডের পেছনে একাধিক কোডন নিয়োজিত করা ছাড়াও তিনটি আলাদা কোডন রয়েছে যারা একটি প্রোটিনের তৈরি শেষ হবার পর সমাপ্তি বা ষ্টপ চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ঐ প্রোটিনটির সব এমাইনো এসিডের সব কোডনের পর ডি এন এ'তে থাকে একটি ষ্টপ কোডন। এতে বুঝা যায় এখানে একটি জিনের শেষ, এর পরের কোডনগুলো ভিন্ন একটি জিনের। এ যেন একটি বাক্য শেষ হয়ে আর একটি বাক্য শুরু হবার আগে দাড়ি চিহ্ন দেয়া। প্রত্যেক বার্তা বা জিনের একটি প্রারম্ভের কোডনও রয়েছে AUG– যা একই সঙ্গে মেথিওনিন এই এমাইনো এসিডেরও কোডন। প্রত্যেক জিন এই কোডন দিয়ে শুরু হয়, সেজন্য সব প্রোটিনও মেথিওনিন এমাইনো এসিডটি দিয়ে শুরু হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই ভাঁজ হবার সময় এমাইনো এসিড চেইন থেকে এটি বাদ পড়ে যায়।

এ ভাবেই কোডনের পুরো অভিধান আমাদের জানা হয়ে গেছে– সকল এমাইনো এসিডের জন্য কোডন, প্রতিটি জিনের শুরুর কোডন, শেষ হবার কোডন। ডি এন এ'তে এরকম পর পর বেশ কিছু কোডন মিলেই গঠিত হয় আলাদা আলাদা জিন, যে গুলোকে পৃথক করে নিতে পারি শুরু আর শেষের কোডনগুলো লক্ষ্য করে। এই যে অভিধান, বলতে গেলে এটি সমস্ত জীবনের অভিধান, কারণ দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষ সব রকম জীবের জন্যই এই একই অভিধান। একই সব কোডনের ভাষায় তাদের সবার সব জেনেটিক গুণাগুণ তাদের ডি এন এ'তে লিপিবদ্ধ। সমস্ত জীবজগতের উৎস যে এক, এবং সেই আদি ব্যাকটেরিয়া থেকে বিবর্তিত হয়ে যে যাবতীয় জীব এসেছে এটি তার চমৎকার প্রমাণ। অভিধান বলতে ভাষার কথা মনে হয়। সেই অর্থে ডি এন এ'র ভাষাটি ৪টি বর্ণের বর্ণমালায় রচিত (৪টি বেইস), আর তাতে শব্দ রয়েছে ৬৪টি (কোডন) যতি চিহ্ন সহ, প্রত্যেকটি ৩ বর্ণের। অবশ্য এসব শব্দের অর্থ হয় মোট ২০টি– ২০টি এমাইনো এসিডের জন্য। ঐ অভিধানটি বলে দেয় কোন্ শব্দের কোন অর্থ (অবশ্য একাধিক শব্দের একই অর্থ রয়েছে)।

ডিএনএ'র ভাষা থেকে প্রোটিনের ভাষায়

ডি এন এ'র ভাষা থেকে প্রোটিনের ভাষায় অনুবাদের কাজটি করে টি-আর এনএ (ট্রান্সলেশন আর এন এ)। ডি এন এ থেকে বার্তার নকল নিয়ে বার্তাবহ

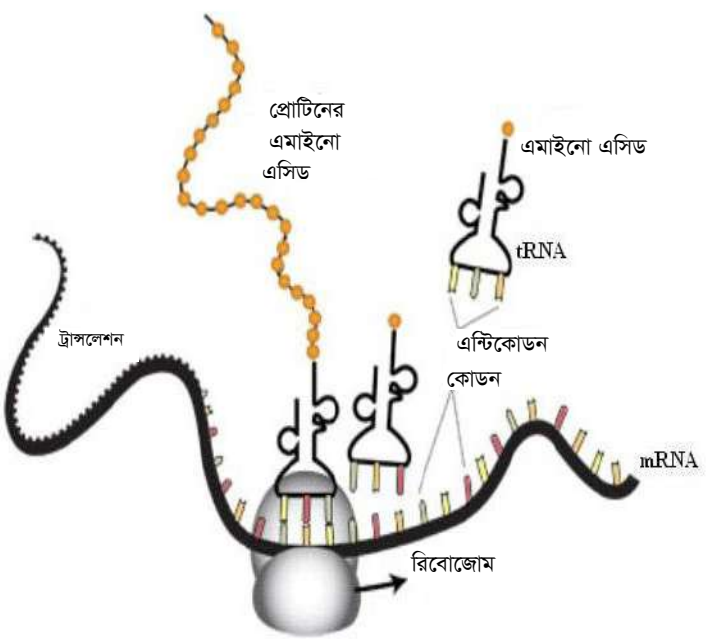

ট্রান্সলেশনঃ tRNA এক একটি এমাইনো এসিড এনে প্রোটিন চেইন গাঁথে।
এর জন্য ছাঁচ হিসাবে ব্যবহৃত হয় mRNA যা DNA থেকে নকল করে সম্পূরক বার্তা বহন করে এনেছে (ট্রান্সক্রিপশন)

এম আর এন এ যখন রিবোজোমের কাছে চলে আসে, রিবোজোম তাকে এমন ভাবে ধরে রাখে যেন কোষের রসে ভাসমান টি আর এন এ'গুলোর সঙ্গে তার যোগাযোগ হতে পারে। প্রত্যেকটি টি আর এন এ'র এমন বক্র আকৃতি থাকে যে এর একদিকে থাকে একটি এন্টি কোডন– অর্থাৎ কোডনের সম্পূরক তিনটি বেইস, আর অন্যদিকে তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ঐ কোডনের সংশ্লিষ্ট এমাইনো এসিডটির একটি অণু। এম আর এন এ'তে যেখানে যেই কোডনের বেইস ত্রয়ী থাকে, সেই এন্টি কোডনের বেইস তিনটি (টি আর এন এ'তে) তার সঙ্গে যুক্ত হয় সম্পূরকতার কারণে। সেই সঙ্গে একই টি আর এন এ'র সংলগ্ন তার এমাইনো এসিডটিকেও সেখানে প্রতিস্থাপিত করে দেয় চেইনের মধ্যে। ছবিতে টি আর এন এ'র বক্র আকৃতিটি, এর সংলগ্ন কোডন ও এমাইনো এসিড, এবং ট্রান্সলেশনে এর কাজটি লক্ষ্য করা যায়। এর পর রিবোজোম এম আর এন এ'র পরবর্তী বেইস ত্রয়ীতে আসে এবং তার সংশ্লিষ্ট এমাইনো এসিডটিকে চেইনে প্রতিস্থাপিত করে। এমনি ভাবে এক এক করে এমাইনো এসিড গ্রথিত হয়ে প্রোটিন চেইন তৈরি হতে থাকে ষ্টপ চিহ্নের কোডন না আসা পর্যন্ত। এটি সম্পূর্ণ হলে এমাইনো এসিডটি রিবোজোম থেকে খসে ভাঁজ হয়ে প্রোটিন হয়ে কোষের যথাস্থানে চলে যায়। এম আর এন এ'র পরবর্তী অংশ নিয়ে পরবর্তী প্রোটিনটির কাজ শুরু হয়। এভাবে নানা রিবোজোমে একই সঙ্গে প্রোটিন তৈরির কাজ চলতে থাকে। চলে ডি এন এ'র ভাষা থেকে প্রোটিনের ভাষায় অনুবাদের কাজ।

ওদিকে টি আর এন এ'গুলো তার সঙ্গে আনা এমাইনো এসিড চেইনে সাজিয়ে দিয়েই কিন্তু আবার চলে যায় নিজের বৈশিষ্ট অনুযায়ী আর একটি এমাইনো এসিড আবার ধরে আনার জন্য। কোষের মধ্যেই এসব এমাইনো এসিডের যোগান থাকে। একটি জিনিস লক্ষ্যনীয়। ডি এন এ সূত্রে যেই বার্তাটি ছিল তা সম্পূরক রূপে এম আর এন-এ'তে নকল হয়েছিল ট্রান্সক্রিপশনের সময়। এবার টি আর এন এ'তে অনুবাদ হবার সময় সম্পূরকেরও আবার সম্পূরক হলো, অর্থাৎ কিনা মূল সেই ডি এন এ'র বার্তাটিই ফিরে এলো সেটিই এমাইনো এসিড নির্ধারণ করলো।

ডি এন এ'র মিউটেশন

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে স্বাভাবিক গুণের অধিকারী জীবের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ঐ গুণের অস্বাভাবিক রূপ দেখা যায় যাকে মিউটেশন বলা হয়। গোড়াতেই বুঝা গেছে যে মিউটেশনের কারণ জিনের মধ্যে পরিবর্তন বা

বৈকল্য। ডি এন এ'র গঠন আবিষ্কৃত হবার পর বুঝা গেছে এই মিউটেশন গুণাগুণের বার্তা বহনকারী ডি এন এ'র বেইস পরম্পরায়ে পরিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনের বহু রকম কারণ থাকতে পারে। ক্ষতিকর ক্যামিকালস্, এক্সরে, আলট্রা ভায়োলেট, তেজস্ক্রিয় রশ্মি ইত্যাদি বিপজ্জনক রশ্মির তীব্র প্রভাবে এরকম অনেক পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাছাড়া বিরল ক্ষেত্রে ইতস্তত কিছু পরিবর্তন এমনিতেই ঘটে– বিশেষ করে ডি এন- এ প্রতিলিপি হবার সময়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিউটেশনের ফলাফল ক্ষতিকর, এমনকি মারাত্মক হয়ে থাকে। সে রকম ক্ষেত্রে মিউটেশন হওয়া জীবটি প্রায়ই দ্রুত মরে যায়, তাই ওটি বংশানুক্রমে খুব বিস্তৃত হতে পারেনা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মিউটেশনের ফলে এমন নূতন বৈচিত্র সৃষ্টি হয় যা পরিবেশে খাপ খেয়ে বংশানুক্রমে টিকে থাকে, এবং জীবকে নূতন পথে নিয়ে যায়– যার ফলে বিবর্তন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন হলো মিউটেশনের সময় ডি এন এ'তে কী ঘটে? অনেক ক্ষেত্রে এতে ডি এন এ'তে একটি বেইসের শুধু পরিবর্তন হয়– হয় একটি বেইস যোগ হয় (যেমনটি আমরা দেখেছি), অথবা একটি বেইস বিলুপ্ত হয়, অথবা একটি বেইসের স্থান অন্য একটি বেইস এসে দখল করে। এরকম যখন ঘটে তখন এর ফলে সৃষ্ট বৈচিত্রগুলোকে বলা যেতে পারে একক নিউক্লিয়োটিড জনিত বৈচিত্র (সিঙ্গল নিউক্লিয়োটিড পলিমরফিজম– সংক্ষেপে এস এন পি মিউটেশনের মধ্যে এরকম এস এন পি'র ঘটনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে। এই সামান্য পরিবর্তনেই বেশ চোখে পড়ার মত মিউটেশন সৃষ্টি হয়– কারণ জিনে একটি বেইসের পরিবর্তনেই প্রোটিন তৈরিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। প্রোটিন পরিবর্তনের ফলে একটি জীবে দেহগত পরিবর্তন যেমন ঘটে তেমনি তার শারীরবৃত্তীয় আচরণগত পরিবর্তনও ঘটতে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আজ যে আমরা ডিমের জন্য মুরগি (লেয়ার), মাংসের জন্য মুরগি (ব্রয়লার) বা রেশমি পালকের জন্য মুরগি (সিলকি) কে আলাদা ভাবে দেখি তা একই মুরগির ডি এন এ'তে শুধু একটি বেইসের নানা মিউটেশনের ফল। অর্থাৎ এটি এস এন পি'র একটি দৃষ্টান্ত।

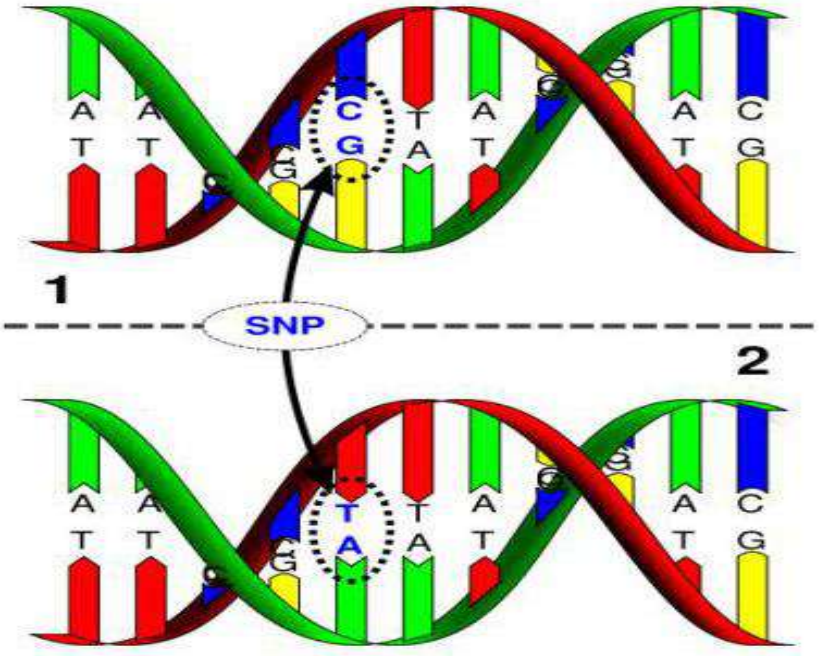

একটি নিউক্লিয়োটিড পরিবর্তনে বৈচিত্র সৃষ্টি

তবে এরকম এসএনপি'র কারণে মারাত্মক সব পরিবর্তনও দেখা দিতে পারে। তেমনি একটি হলো সিকল্ সেল এনিমিয়া বলে মানুষের রক্তের অসুখ– যা শরীরে প্রকাশিত হলে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। অথচ ডি এন এ'তে মিউটেশনের ফলে GUA এই কোডনটির একটি মাত্র বেইস U যদি A তে পরিবর্তিত হয় তা হলেই এটি ঘটে থাকে। কারণ GUA ভেলাইন নামক এমাইনো এসিড তৈরি করে, অথচ GAA তৈরি করে গ্লুটামিক এসিড নামক এমাইনো এসিড। ফলে প্রোটিনটি বদলে গিয়ে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। একই অসুখ ঘটতে পারে GUG কোডনটি যদি GAG তে পরিণত হয়– কারণ এগুলোও একই এমাইনো এসিড দুটির জন্য দায়ী। এরকম পরিবর্তিত কোডন বাবা বা মা একজন থেকেই পেলে সন্তান রোগটির বাহক হয় কিন্তু আক্রান্ত হয়না। কিন্তু বাবা ও মা উভয়ের কাছ থেকে মিউটেশন হওয়া কোডন পেলে সন্তান আক্রান্ত হয়।

ধংসাত্মক মিউটেশন সৃষ্টি হতে পারে যদি তার ফলশ্রুতিতে অকেজো বা ক্ষতিকারক প্রোটিন তৈরি হয়ে যায়। এমনো হতে পারে যে ঐ পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক কোডনটি ষ্টপ চিহ্নের কোডনে পরিণত হলো– তা হলে ঐ

প্রোটিন তৈরি বন্ধই হয়ে যাবে। সঙ্গের চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছি একটি C মাত্র বিলুপ্ত হবার ফলে এটি কীভাবে ঘটছে। আগেই আমরা দেখেছি একটি মাত্র বেইস বাড়তি বা কমতি হবার ফলে এর পরের সব কোডন পড়ার ক্ষেত্রে গোলমাল হয়ে যেতে পারে– যার ফলে ফেইজ ভাইরাসের মত পুরো জীবটি অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে ভুল জায়গা থেকে তিনটি তিনটি করে বেইস গুণা আরম্ভ হয় বলে পরের কোডনগুলো আর ঠিক থাকে না।

একটি বাড়তি U অনুপ্রবেশ

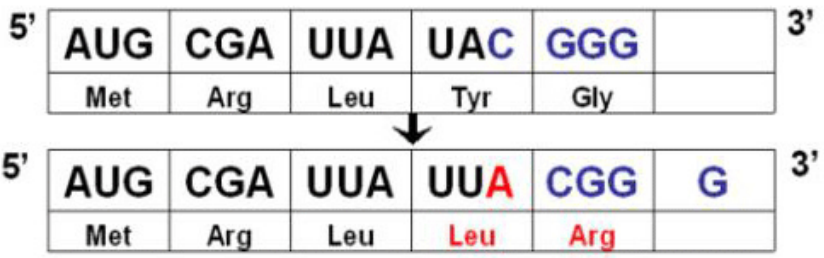

একটি C বিলুপ্ত

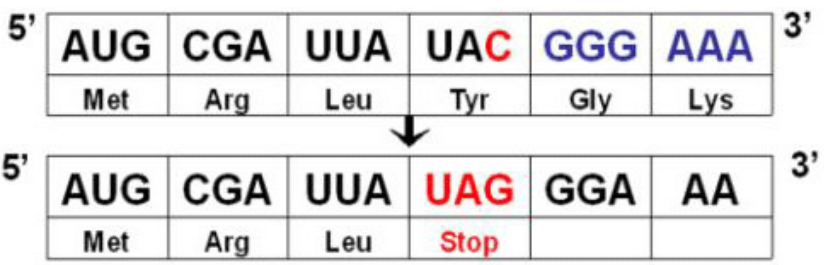

একটি মাত্র বেইস অনুপ্রবেশ বা বিলুপ্তিতে মিউটেশন

(5′ চিহ্নিত প্রান্তটি বেইস গুণা শুরু করার প্রান্ত)

তবে একটি সান্ত্বনা হলো ডিএনএতে বেইস পরিবর্তন হলেই সব ক্ষেত্রে কার্যত মিউটেশন সৃষ্টি হবে এমন কোন কথা নাই। যেমন আমরা দেখেছি একাধিক কোডন একই এমাইনো এসিড তৈরি করতে পারে। তাই উদাহরণ স্বরূপ UUU কোডনটি পরিবর্তিত হয়ে UUC তে পরিবর্তিত হলে কার্যত কিছু আসে যায়না। কারণ উভয়েই একই এমাইনো এসিড ফিনাইলেলেনাইন তৈরি করে। উল্লিখিত সিকল্ সেল এনিমিয়ার ক্ষেত্রে একটি এমাইনো এসিড অন্যটিতে পরিণত হওয়াতে মারাত্মক ফলশ্রুতি ঘটেছে। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রোটিনের একটি এমাইনো এসিড বদলে গেলে প্রোটিনটির কাজে কোন

অসুবিধাই ঘটেনা। সেক্ষেত্রে মিউটেশনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি থাকেনা। আর কিছু ক্ষেত্রে এ রকম মিউটেশন পরিবর্তন আনে বটে তাতে ভাল মন্দের কোন ব্যাপার ঘটেনা– যেমন মানুষের সোজা চুলের বদলে কোকড়ানো চুল সৃষ্টি করা, ইত্যাদি।

ডি এন এ'র সবগুলো মিউটেশন যে শুধু এস এন পি বা একটি বেইসে পরিবর্তনের ফলে হবে এমনো কোন কথা নাই। ডি এন এ'তে আরো বড় পরিবর্তনের ফলেও মিউটেশন ঘটে, যদিও সেগুলো অপেক্ষাকৃত বিরল। এমনকি ক্রোমোজোমের পর্যায়ে পর্যন্ত মিউটেশন হতে পারে– যেমন একটি ক্রোমোজোম কমে যাওয়া, অথবা একটি বাড়তি ক্রোমোজোম সৃষ্টি হওয়া। মনে রাখতে হবে ডি এন এ'র একটি একটানা ডাবল হেলিক্স এক একটি ক্রোমোজোমে আলাদা ভাবে বাণ্ডিল করা থাকে। এক একটি জীবের জন্য ক্রোমোজোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট থাকে। উদ্ভিদ জগতে মিউটেশনে এই সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি প্রায়শ দেখা যায়– সেখানে তা খুব প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বয়ে আনেনা। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি ক্রোমোজোমের কারণে ডাউন সিনড্রোম নামক শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে শিশু জন্ম নেয়। আসলে মানুষের ও অন্যান্য জীবের অনেক রোগেরই মূলে রয়েছে ডি এন এ'র কোন না কোন ধরনের মিউটেশন। এই মিউটেশন যদি সাধারণ শারীরিক কোষে ঘটে তা হলে যার ক্ষেত্রে ঘটেছে পরিবর্তনটি বা রোগটি শুধু তার ক্ষেত্রেই দেখা দেবে। কিন্তু যদি এটি জনন কোষে ঘটে বা সেখানে যায়– তা হলে এটি বংশগত ভাবে সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা থাকে, হয় বাহক হিসাবে, অথবা রোগাক্রান্ত হিসাবে। এসব আমরা পরে বিস্তারিত দেখবো।

অকেজো ডিএনএ'র ছড়াছড়ি

ডিএনএ'র কাজ কী ?

বংশগতির বার্তা বহন করাই ডিএনএ'র মূল কাজ। আমরা দেখেছি ডিএনএ'র বার্তা থেকে কেমন করে এমাইনো এসিডগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে একটি প্রোটিন তৈরি হয়। ঐ বার্তার বা জিনের একটি প্রারম্ভ থাকে, একটি সমাপ্তিও থাকে, প্রারম্ভের ও সমাপ্তির কোডন রূপে তাও আমরা দেখেছি। ঐ যে প্রোটিনটি তৈরি হলো তাই হতে পারে একটি বিশেষ গুণের জন্য দায়ী। কাজেই প্রোটিন তৈরি করাটাই ডি এন এ'র মূল কাজ। প্রোটিন তৈরি করার সময় অবশ্য বিভিন্ন ধরনের আরএনএ'র ব্যবহার হতে হয়। সেই আরএন- এ'গুলো তৈরিও ডিএন এ'র অন্যতম কাজ।

এ সব কাজ করার জন্যই ডি এন এ'র মধ্যে নানা জিনের বার্তা রয়েছে। ব্যবহারের দিক থেকে কাজগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, সেই হিসাবে জিনগুলোকেও। এক ধরনের কাজ হলো গঠনগত। জীবদেহের সব গঠনের এবং সকল কাজ সম্পাদনের জন্য জন্য দরকারী প্রোটিন তৈরি গঠনগত কাজের মধ্যে পড়ে, আরএনএ তৈরিও। এভাবেই ডিএনএ জীবদেহের সব অংশ, এর নানা কাজের এনজাইম-গুলো, হরমোনগুলো, বাইরের অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দিতে এন্টিবডিগুলো ইত্যাদি সব কিছু তৈরির ব্যবস্থা করে। ডিএন এ'র অন্য কাজের প্রকারটি হলো নিয়ন্ত্রণগত। আমরা এখানে যত সহজভাবে বলছি যে একটি জিন একটি গুণ নির্ধারণ করে, ব্যাপারটি কিন্তু এত সরল নয়। ঐ জিনটি আদৌ বাস্তবে প্রকাশিত হবে কি হবেনা, এটি একটি প্রশ্ন। জীবদেহের সব কোষে একই ডিএনএ থাকে, একই সব জিন থাকে। কিন্তু সব কোষে সব জিন প্রকাশিত হয়না। যেমন যেই সব জিন শরীরের ত্বকের গুণগুলো নির্ধারণ করে সেগুলো শুধু ত্বকের কোষেই প্রকাশিত হয়, লিভারের কোষে প্রকাশিত হয়না। প্রকাশ হবে কি হবেনা এটি নির্ধারণ একটি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার। সেটিও ডি এন এ'র দ্বারাই নির্ধারিত, কোন্ পরিস্থি-তিতে প্রকাশিত হবে, কোন্ পরিস্থিতিতে হবেনা। তাছাড়া একই কোষেও একটি জিন সব সময় প্রকাশিত নাও হতে পারে– কখন হবে তাও একটি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার। এ যেন একটি বাতির সুইচ অন্ অফ্ করার মত। পরিস্থিতি ও পরিবেশ থেকে তথ্য নিয়ে সেই অনুযায়ীই এই সুইচ কার্যকর হয়। আরো ভাল উপমা হলো এটি ফ্রিজের মধ্যে থাকা থার্মোষ্টাট সুইচের মত, যা তাপমাত্রা মেপে যদি যথেষ্ট ঠাণ্ডা

না পায় তাহলে ফ্রিজকে অন্ করে দেয়, আবার যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে গেলে অফ্ করে দেয়। তাছাড়া এখন দেখা যাচ্ছে সব জিন পরস্পর থেকে একেবারে স্বাধীন নাও হতে পারে। একটি জিনের কার্যকারিতা অন্যান্য জিনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটিও নিয়ন্ত্রণের আর একটি মাত্রা যার স্বরূপ এখন ক্রমেই আবিষ্কৃত হচ্ছে। জনন কোষ থেকে জীব কী ভাবে প্রথমে ভ্রূণ, আর সেই ভ্রূণ কীভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ জীব হয়ে উঠে, সেখানেও জটিল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার রয়েছে। এসবের বিস্তারিত পরে আমরা দেখবো। তবে এখানে জানলাম এই নিয়ন্ত্রণের বার্তাও ডিএনএ'র মধ্যেই রয়েছে নিয়ন্ত্রণগত জিনের রূপে।

ডিএনএ'র বেকার অংশ

সাম্প্রতিক কালে মানুষের পূর্ণাঙ্গ ডি এন এ'র বেইস পরম্পরায়, যাকে বলা হয় পুরো জেনোম, তা উদ্ঘাটন করা হয়েছে, এবং তার মধ্যে জিনগুলোকে চিহ্নিত করার কাজ চলেছে। একই ভাবে মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব হবার আগে পরে অন্যান্য বেশ কিছু জীবেরও পুরো জেনোম উদ্ঘাটিত হয়েছে। এটি করার ফলে এক অদ্ভূত বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে যে ডি এন এ'র অধিকাংশ অংশেরই জিন হিসাবে কোন কাজ নাই। এভাবে দেখা গেছে মানুষের জেনোমের শতকরা ৯৫ ভাগই বেকার– কোন কাজ নাই। অন্যান্য জীবের অবস্থাও প্রায় সে রকম। তবে ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি অতি সরল জীবের ক্ষেত্রে এরকম বেকার অংশ অনেক কম।

ডাবল হেলিক্স সূত্রে জিনের বেইস পরম্পরায়ে কার্যকর জিনের ফাঁকে ফাঁকে অনেক বেদরকারী বেইস পরম্পরায় থাকে প্রচুর পরিমাণে। এরা কোডিংও করে অর্থাৎ এর অনুসরণে এম আর এন এ'ও তৈরি হয় যা এমাইনো এসিড সাজাতে পারতো। কিন্তু শেষ অবধি এগুলো সে কাজ করেনা, অর্থাৎ কোন প্রোটিন তৈরি করেনা। নিউক্লিয়াসের বাইরে যাবার আগেই বিশেষ এনজাইম এম আর এন এ'র এই অংশগুলো কেটে বাদ দিয়ে দেয়। এই বেদরকারী অংশগুলোকে বলা হয় ইনট্রন। এগুলো বেকার ডি এন এ'রই অন্তর্ভূক্ত। অন্য দিকে কাজ করে এমন ডি এন এ অংশগুলোকে বলা হয় এক্সন। এ যেন একটি উপন্যাসে অল্প কিছু অর্থপূর্ণ বাক্যের পর অনেকগুলো অর্থহীন বাক্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে সঠিক বাক্যগুলো পড়ে উপন্যাসটি উপভোগ করতে হয়।

ইনট্রন ছাড়াও আরো নানা রকমের বেদরকারী অংশে ডি এন এ ভর্তি। এরা সাধা-রণত কোন কোডিংই করেনা। অর্থাৎ ডি এন এ'র ভাষায় এদের কোন অর্থ নাই, কোন কিছু তৈরির কোন সংকেত এতে নাই। এদের মধ্যে কিছু কিছু আছে যারা দুটি জিনের ফাঁকে তাদের মধ্যে নেহাৎ যেন একটি ব্যবধান সৃষ্টির জন্যই ওখানে আছে। আবার কিছু আছে যেখানে যেন একেবারেই খামখেয়ালী ভাবে একই কিছু বেইস পরম্পরায় বার বার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলে। যা এভাবে পুনরাবৃত্ত হয় তা কয়েকটা মাত্র বেইসের ছোট পরম্পরায় হতে পারে, আবার বেশ দীর্ঘও হতে পারে। ছোটগুলো তো এত ছোট যে তাদের পক্ষে কোন জিন হওয়া সম্ভবই নয়। অদ্ভূত রকম ভাবে এই একই অংশটুকু ডি এন এ'র নানা জায়গায় থেকে কোথাও পাঁচ দশবার, কোথাও আরো বেশি এমনকি শত বার হাজার বার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। কখনো মাত্র একটি অথবা কয়েকটি মাত্র বেইস বার বার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে বেইস পরম্পরায়ে একটি বিশেষ অংশে গিয়ে। এ যেন ডি এন এ'র এক রকম 'তোতলানোর' দুর্বলতা। এরকম অংশে একই বেইস বার বার আসতে থাকে। ডি এন এ'র এরকম বেকার অংশগুলোকে চলতি কথায় জাংক্ ডি এন এ বা ফেলনা ডি এন এ বলাটি রেওয়াজ হয়ে গেছে। ডি এন এ'র মূল কাজের সঙ্গে তাদেরকে সম্পর্কিত করতে না পারার কারণেই এই নাম।

তবে এর মানে এই নয় যে এদের সবটা একেবারে ফেলনা। কিছু পরেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারের কথা আলোচনা করবো। সে যাই হোক জীবকোষ ও জীবটির প্রয়োজনে বেকার ডি এন এ'কে এখন বেকার মনে হলেও অনেক বিজ্ঞানীর মতে এদের কোন না কোন জীবতাত্ত্বিক কাজও রয়েছে যা এখনো আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। কেউ মনে করেন জিনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এদের দায়িত্ব থাকতে পারে, আবার কেউ মনে করেন বিবর্তনে ভবিষ্যতে নূতন জিন সৃষ্টির কাঁচামাল হিসাবে রয়েছে এগুলো। তবে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মতে বেকার ডি এন এ'র অধিকাংশ হলো বিবর্তনের সূত্রে অতীত জীব থেকে পাওয়া ডি এন এ'র স্মৃতি স্মারক, এক সময় তার কাজ ছিল, এখন আর নাই।

জেনেটিক ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ

যে ডি এন এ আজকের মানুষ বা অন্যান্য প্রাণির দেহে বেকার, তা এক সময় ব্যাকটেরিয়ার মত সরল জীবের দেহের ডি এন এ ছিল, এবং তাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতো। এক ধরনের পরজীবি হিসাবে ঐ ব্যাকটেরিয়া উন্নততর

বহুকোষী জীবের কোষে আশ্রয় নিয়েছিল জেনেটিক ইতিহাসের সুদূর অতীতে। কালক্রমে এরা আশ্রয়দাতা জীবটির ডি এন এ'তে আত্মীকৃত হয়ে পড়েছে। খুব সম্ভব এদের অনেকগুলো এসেছে ভাইরাস আক্রমণের ফলে। ভাইরাসের চরিত্রই হলো জীবকোষে গিয়ে নিজের ডি এন এ'কে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে ঐ জীবকোষের ব্যবস্থাদি ব্যবহার করে সে নিজের ডি এন এ বহুবার প্রতিলিপি করিয়ে নিতে পারে। মূল ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস থেকে অন্যের ডি এন এ'তে অঙ্গীভূত হবার পর ঐ ডি এন এ'গুলো তার মূল কাজ হারিয়ে বেকার ডি এন এ'তে পরিণত হয়েছে।

এ ভাবে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের অন্য জীবের কোষে অঙ্গীভূত হবার ব্যাপারটি মোটেই কষ্টকল্পিত নয়। বহুকোষী উন্নততর জীবের ক্লোরোপ্লাষ্ট ও মাইটোকোন্ড্রিয়ার উৎস সম্পর্কে বর্তমানে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত যেখানে ঠিক এই ব্যাপারটিই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সুদূর অতীতে সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম নীল-সবুজ ব্যাকটেরিয়া আশ্রয় নিয়েছিল নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট উন্নততর জীবের কোষে। কালক্রমে এটি ঐ জীবকোষেরই অঙ্গীভূত হয়েছে ক্লোরোপ্লাষ্ট হিসেবে। এই সব জীব উদ্ভিদের পূর্বসুরি এবং ক্লোরোপ্লাষ্টের কারণেই সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম। একই কথা অন্য রকম জীবের মাইটোকেন্ড্রিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে। এটিকেও মনে করা হয় অতীতের কোন ব্যাকটেরিয়া যা নিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট উন্নততর জীবের কোষে আশ্রয় নিয়েছিল। কালক্রমে মাইটোকোন্ড্রিয়া হিসাবে ঐ জীবকোষে অঙ্গীভূত হয়ে এখন তার শক্তি উৎপাদনের দায়িত্ব পালন করছে। শুধু তাই নয় ঐ ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ এখন মাইকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ হিসাবে আশ্রয়দাতা জীবের ডি এন এ'র অংশে পরিণত হয়েছে। যদিও তার অবস্থান উন্নততর আশ্রয়দাতা জীবের নিউক্লিয়াসে বাকি ডি এন এ'র সঙ্গে নয়– বরং আলাদাভাবে মাইটোকোন্ড্রিয়াতে। একই ভাবে দীর্ঘ জেনেটিক ইতিহাসে নানা জীবের অতীতে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস পরীজীবি হিসাবে তাদের মধ্যে আশ্রয় না পাওয়ার কারণ নাই। আজ যাকে আমরা বেকার ডি এন এ হিসাবে দেখছি তা খুব সম্ভব ঐ পরজীবিদের ডি এন এ'রই ভগ্নাবশেষ।

যেহেতু এদের অনেকগুলোই এসেছে অতীতের ভাইরাস আক্রমণ থেকে, তাই ভাইরাসের একটি চরিত্র বেকার ডি এন এ'র মধ্যে প্রায়শ দেখা যায়। সেটি হলো অন্যকে দিয়ে নিজের কপি করিয়ে নেবার অভ্যাস। ডি এন এ গঠনের মধ্যে প্রতিলিপি তৈরির যে ব্যবস্থা রয়েছে একেই সুকৌশলে ভাইরাস ব্যবহার করে নিজের ডি এন এ কপি করাবার জন্য। এক্ষেত্রে আক্রান্ত জীবের ডি এন এ'তে অঙ্গীভূত ঐ ভগ্নাবশেষও (যা এখন বেকার ডি এন এ) নিজেকে কপি

করিয়ে নিয়ে ডি এন এ'র এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলে গিয়ে নিজেকে সংযুক্ত করে। এজন্য অবশ্য এই অকাজের ডি এন এ'কেও অনেক কাজ করতে হয়েছে। এমন সব এনজাইম এটি তৈরি করে যা তাকে ডি এন এ'র প্রথম অংশ থেকে কেটে বাদ দেয়। একই সঙ্গে অন্যত্র ডি এন এ'কে কেটে সেখানে নিজেকে জুড়ে দেয়। এসব কাটাচেরার কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ এনজাইম যে রয়েছে তা আমরা পরে দেখবো। এসব বেকার ডি এন এ'রই আর একটি অভ্যাস হলো একই অংশকে বার বার কপি করে বহু পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করা।

তোতলানো অংশের বৈচিত্র

একই দু'একটি বেইস বার বার পুনরাবৃত্তি হবার যে ব্যাপারটিকে এক রকম তোতলামি হিসেবে আমরা দেখেছি তার পুনরাবৃত্তির সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কয়েকজন মানুষের ডি এন এ'তে এটি দেখলে (অন্য প্রাণির ক্ষেত্রেও তাই) এক জনের থেকে অন্য জনে এই পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ভিন্নতর হবে। এই পুনরাবৃত্তিকে বলা হয় টেনডেম রিপীট– অর্থাৎ একটানা পুনরাবৃত্তি। আর পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বিভিন্ন বলে এরকম অংশকে বলা হয ভেরিয়েবল নাম্বার অব টেনডেম রিপীট (বিচিত্র সংখ্যায় একটানা পুনরাবৃত্তি) সংক্ষেপে ভি এন টি আর।

যে কারো ডি এন এ'তে এরকম অসংখ্য ভি এন টি আর থাকে। এদের অনেকগুলো-তেই পুনরাবৃত্ত অংশের মাঝখানে একটি কেন্দ্রীয় অংশ হুবহু একই থাকে যাকে বলা হয় কোর অংশ। যেমন GGCAGGANA এটি একটি সুপরিচিত কোর অংশ। এর দুপাশে আরো কিছু বেইস যোগ হয়ে বিভিন্ন রকম ভি এন টি আর তৈরি হয়। কোর অংশ চেনা রয়েছে বলে তার উদ্ঘাটন থেকে ভি এন টি আর'গুলোকেও চেনা যায়– তার বহু সংখ্যক পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও।

এই বেকার ভি এন টি আর'গুলো আমাদের একটি বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনে দারুণ কাজে লেগে যায়– সেটি হলো ব্যক্তি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে। এদের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা দু'জন ব্যক্তির কখনো এক রকম হয়না। মানুষে মানুষে এদের অসংখ্য বৈচিত্রের সুযোগ নিয়েই এই সনাক্তকরণের কাজটি করা যায়। ঠিক যেমন দু'জন মানুষের আঙ্গুলের ছাপ কখনো এক রকম না হওয়ার সুযোগে আঙ্গুলের ছাপকে সনাক্ত করণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বহুদিন থেকে। উভয়ের এই মিলের কারণে ডিএনএ'র দ্বারা সনাক্ত করার ব্যাপারটিকেও ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয়।

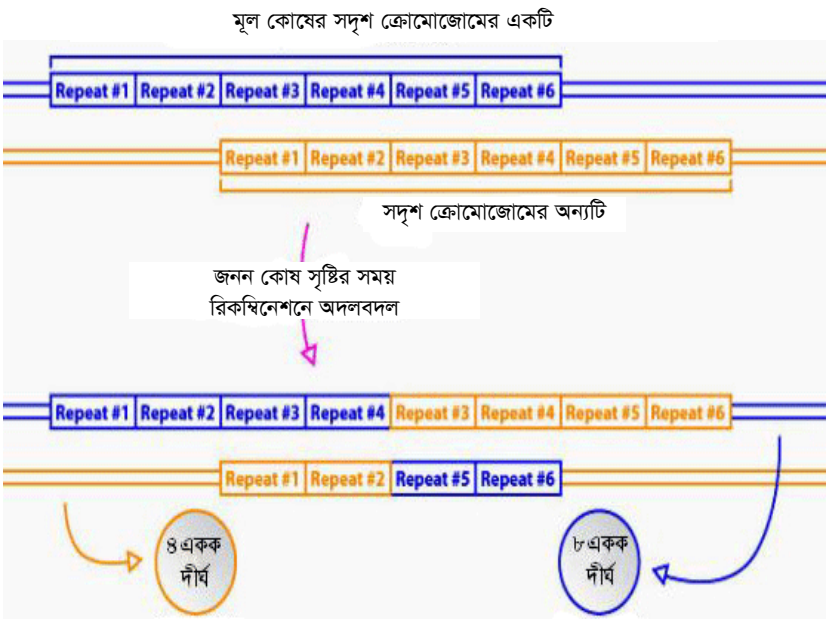

জনন কোষ তৈরির সময় ভিএনটি আর'এ বৈচিত্র সৃষ্টি

কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন ভি এন টি আর এর পুনরাবৃত্তি সংখ্যায় এতো বেশি বৈচিত্র সৃষ্টি হয়? তার কারণ এর মধ্যে থাকা বার্তার নির্দেশনায় (প্রাচীন ভাইরাস থেকে পাওয়া অভ্যাসের দরুণই হয়তো) এগুলো ডি এন এ সূত্রের নানা জায়গায় থাকা অনুরূপ অংশের সঙ্গে বেইস অদল বদল করে। এটি করতে গিয়ে বেশ কিছু ভুল তৈরি হয়। জনন কোষেও এমনটি হয় বলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই ভুলগুলো জমে জমে ভি এন টি আর এর পুনরাবৃত্তি সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটে অসংখ্য বৈচিত্রে। বাবার সঙ্গে বা মায়ের সঙ্গে সন্তানের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন নগণ্য থাকে। কিন্তু তারপর সম্পর্ক যত দূরের হবে পার্থক্যও তত বেড়ে যাবে দ্রুত। কাজেই জনে জনে এত রকম বৈচিত্র। প্রত্যেক মানুষের ডি এন এ'র ভি এনটিআর অংশগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হলে প্রত্যেকের তালিকা হবে একেবারেই অনন্য– তার আঙ্গুলের ছাপের মতই অনন্য।

কিন্তু এই তালিকা করতে পারার ও অন্যের তালিকার সঙ্গে তুলনা করার উপায় কী? এখানেই ডি এন এ'কে নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে আমাদের কাজ করার সক্ষমতাটির প্রশ্ন এসে পড়ে। বইয়ের বাকি অংশে আমরা দেখবো কী ভাবে এই সক্ষমতার কারণে ডি এন এ আমাদের জন্য অনেক রকমের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

ডিএনএ দিয়ে যায় চেনা

ডিএনএ নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে কাজ

গোঁফের মাহাত্ম্য বুঝতে কবির কথা 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা'। কথাটি আরো বৈজ্ঞানিক হতো যদি তিনি 'ডি এন এ দিয়ে যায় চেনা' বলতেন। কারণ মানুষকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে শেষ কথা হচ্ছে ডি এন এ। ডি এন এ'র গঠন ও কার্যক্রম উদ্ঘাটনের মাধ্যমে নানা দিকে যে অনেক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তার তার মধ্যে আমাদের কাছে ইতোমধ্যে যথেষ্ট সুপরিচিত হয়ে উঠেছে ডি এন এ'র মাধ্যমে ব্যক্তি সনাক্ত করার ব্যাপারটি। বিশেষ করে অপরাধী নির্ণয়ে এবং পিতৃত্ব (এবং মাতৃত্ব) নির্ণয়ে এর আধুনিক আটপৌরে ব্যবহার এই দিকটির বিষয়ে আমাদেরকে যথেষ্ট কৌতুহলী করে তোলে। তা ছাড়া অন্যান্য নানা ডি এন এ প্রযুক্তির তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক, তাই ঐ প্রযুক্তিকে বুঝতে এটিই প্রথম ধাপ হতে পারে।

তবে তারো আগে দেখতে হবে ডি এন এ দেহকোষ থেকে কী ভাবে আলাদা করা হয়, বিশুদ্ধ করা হয়, একে নিয়ে নানা কাজ করা হয়। সহজভাবে শরীরে যে কোন অংশ থেকে কোষ সংগ্রহ করে তার থেকে ডি- এন এ নিষ্কাশন করা যায়। সাধারণত রক্ত, থুথু, থেকে অথবা গালের ভেতর থেকে একটু খানি ঘষে কোষ তুলে নিয়েই (সোয়াব) যে স্যাম্পল পাওয়া যায় তার মধ্যে থাকে অনেক কোষ। ডিটারজেন্ট দ্রবণে মিশিয়ে তার দ্বারা এই স্যাম্পলের কোষ দেয়ালগুলো গলিয়ে কোষের ভেতরের অংশ বের করে আনা হয়। তারপর ফিনোল আর ক্লোরোফরম মিশিয়ে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে সজোরে ঘুরালে কোষের প্রোটিন অংশ আলাদা হয়ে যায় দ্রবণ থেকে। বাকি অংশের সঙ্গে ইথানোল (এলকোহল) মিশিয়ে তার থেকে নিউক্লিক এসিড থিতিয়ে পৃথক করা যায়। এই নিউক্লিক এসিড অংশে ডি এন এ ও আর এন এ উভয়েই থাকে। আর এন এ বিনষ্টকারী এনজাইম দিয়ে তাকে নষ্ট ও বের করে ফেললে বিশুদ্ধ ডি এন এ পাওয়া যায়। সাধারণত যে কাচপাত্রে ডি এন এ থিতানো হয় তাতে একটি কাচের রড ডুবিয়ে ধীরে ধীরে তা ঘুরালে দেখতে সাদা আঁশের দলার মত থকথকে ডি এন এ এতে পাক খেয়ে জড়িয়ে উঠে আসে।

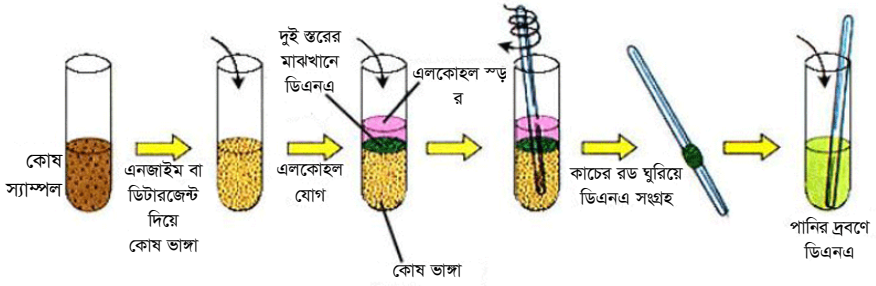

স্যাম্পল থেকে ডিএনএ সংগ্রহঃ সহজতর উপায়

এই দলার মধ্যে জমাট হয়ে আছে কোটি কোটি ডি এন এ ডাবল হেলিক্স। ডি এন এ অনেক দীর্ঘ সূতার মত হলেও এর কুণ্ডলি পাকানো সূত্র অত্যন্ত সরু আণবিক আকারের। কাজেই এর এক একটিকে আলাদা ভাবে দেখার বা

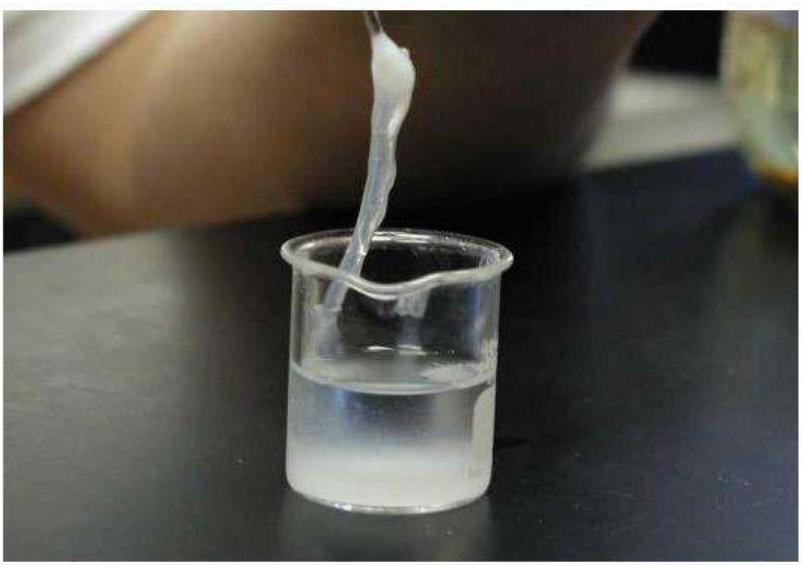

কাচের রডে জড়িয়ে তোলা পৃথকীকৃত ডি এন এ।
এতে রয়েছে কোটি কোটি ডিএনএ।

সুনির্দিষ্ট ভাবে তার কোনটির উপর কিছু করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। যা কিছু করার সবই করা হয় রাসায়নিক ভাবে কোটি কোটি ডি এন এ সূত্রকে একই সঙ্গে, দুটি তরলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় যেভাবে এর মধ্যে কোটি কোটি

নানা অণুর মধ্যে ভাঙ্গা গড়া যেভাবে ঘটে সে ভাবে। এক্ষেত্রে বড় কাজে আসে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম। ডিএনএর উপর নানা ভাবে কাজ করে এরকম নানা এনজাইম আবিষ্কারের ফলে এর উপর কাজ করা এখন অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যেমন কিছু এনজাইম আছে যার কাজ হলো ডি এন এ'কে কেটে টুকরা টুকরা করা। তাদের বলা হয় কর্তনকারী এনজাইম (রেষ্ট্রিকশন এনজাইম)। এর প্রত্যেকটি একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে কাটে– যেই স্থানে এটি কয়েকটি বেইসকে সুনির্দিষ্ট পরম্পরায়ে পাবে বেছে বেছে ঠিক সেখানে কাটে। কর্তনকারী এনজাইমগুলো বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়। ব্যাকটেরিয়া এগুলো ব্যবহার করে ভাইরাস তাকে আক্রমণ করলে ভাইরাসের ডি এন এ'কে বিভিন্ন জায়গায় কেটে ফেলে আত্মরক্ষা করার কাজে। নানা সুনির্দিষ্ট জায়গায় কাটার মত বেশ কিছু কর্তনকারী এনজাইম এখন বিজ্ঞানীদের হাতে রয়েছে। এগুলো যেন অসংখ্য ডি এন এ'কে একসঙ্গে সুনির্দিষ্ট জায়গায় কাটার কাঁচি।

এনজাইম দিয়ে ডি এন এ কাটার একটি চমৎকার বৈশিষ্ট হলো এক একটি এনজাইম খুবই সুনির্দিষ্ট একটি বেইস পরম্পরায়ের বিশেষ জায়গাতেই শুধু কাটে। কোনটি কাটে চারটি বেইসের বিশেষ ক্রমে সাজানো থাকলে, আবার কোনটি কাটে ছয়টি বেইসের বিশেষ রকমের পরম্পরায়ের মধ্যে, ইত্যাদি। ডি এন এ'তে ঐ জায়গাগুলোকে বলা হয় রেষ্ট্রিকশন সাইট বা 'কাটার জায়গা'। পরে দেখবো কাচ পাত্রে ডি এন এ'র সঙ্গে যথাযথ কাটার এনজাইমগুলো মেশালে ডি এন এ'র দীর্ঘ সূতা নানা সুনির্দিষ্ট জায়গায় কেটে গিয়ে আমরা অসংখ্য ডি এন এ'র অসংখ্য ছোট বড় টুকরা পাব। এরকম টুকরা টুকরা ডি এন এ বহু রকম কাজের জন্য খুবই প্রয়োজন।

অল্প ডি এন এ থেকে দ্রুত বিপুল সংখ্যক প্রতিলিপি

অপরাধী নির্ণয় অথবা অন্যান্য কারণে ব্যক্তি সনাক্ত করণের কাজে শরীরের ছিটে- ফোটা নমুনা থেকে যে ডি এন এ পাওয়া যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কাজ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হলো এই ডি এন এর অনেক প্রতিলিপি তৈরি করে নেবার ব্যবস্থা করা। আজকাল পলিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন বা সংক্ষেপে পি সি আর নামক পদ্ধতিতে এটি দ্রুত সহজে করা যায়। পলিমারেজ হলো এমন কিছু এনজাইম যেগুলো ডি এন এ'র প্রতিলিপি তৈরি করে। আর চেইন রিয়্যাকশন সে সব পদ্ধতিকে বলে যেখানে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে ষোলটি

এভাবে পর পর অতি দ্রুত ঘটনার বিস্তার ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে ওভাবে দ্রুত গুণোত্তর হারে নকল হয়ে অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি হতে পারে। এজন্য ৯৬° সেলসিয়াস উত্তাপে গরম করে মূল ডি এন এ'র দুটি সূত্রকে পৃথক করে ফেলা হয়। ডি এন এ সূত্রের যেই অংশের প্রতিলিপি করতে চাই তার শুরুর অংশের সম্পূরক খানিকটা বেইস পরম্পরায় যুক্ত স্বল্প দৈর্ঘের নিউক্লিয়োটিড চেইন (ডিএনএ সূত্রের অংশ) সরবরাহ করা হয়, যাকে বলা হয় 'প্রাইমার' বা প্রারম্ভিক অংশ। এ সময় উত্তাপ ৫৫° সেলসিয়াসে নামিয়ে আনতে হয়। মূল ডিএনএ'র দুই সূত্রের জন্য দু'রকমের প্রাইমার দরকার– একটি নকল করার অংশের এক দিকের প্রান্ত নির্দেশ করবে ও সম্পূরক হিসাবে তার পাশে সংলগ্ন হবে, এবং অন্যটি অন্য সূত্রে তার অন্য প্রান্ত নির্দেশ করবে এবং তার পাশে সংলগ্ন হবে। যথাযথ এনজাইমের কাজের দ্বারা উভয় দিক থেকে দুই সূত্রে নকল হয়ে এসে উভয়ের মধ্যকার ঐ অংশটুকুর জন্য এখন দুটি সূত্রের বদলে চারটি সূত্র পাওয়া যাবে। এভাবে এখানে প্রতিলিপি হচ্ছে শুধু ডি এন এ'র প্রাসঙ্গিক অংশের জন্য। প্রতিলিপি হওয়ার ব্যাপারটি ঘটাতে হয় ৭২° সেলসিয়াসে। তারপর উত্তাপ কমালে ঐ চার সূত্র পুরাতন ও তার সম্পূরক নূতনটি জোড় নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে দুটি ডাবল হেলিক্স ডি এন এ অংশে পরিণত হয়। মূলত ঐ অংশ যেখানে একটি ছিল সেখানে হলো দুটি। এরপর পুরো ব্যাপারটির আবার পুনরাবৃত্তি করানো হয় ঐ উত্তাপ চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে– ফলে এবার দুটি ডি এন এ হয়ে পড়ে চারটিতে। এমনি ভাবে চলতে থাকে খুব দ্রুত হারে। এর জন্য যে পলিমারেজ এনজাইম ব্যবহার করতে হয় তা উষ্ণ প্রস্রবণের অধিক উত্তাপ সহ্যকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগ্রহ করে নিতে হয় যাতে অধিক উত্তাপেও কাজ করতে পারে।

আজকাল এই প্রক্রিয়াটিকে একেবারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার জন্য যন্ত্র রয়েছে, যার ফলে পি সি আর করে সহজে ডি এন এ'র প্রাসঙ্গিক অংশের অনেক প্রতিলিপি তৈরি করে নেয়া যায়। ব্যক্তি সনাক্তকরণের কাজে পি সি আর পদ্ধতির প্রাইমারকে এমনভাবে বেছে নিতে হয় যাতে ডি এন এ'র বেকার অংশ যা বার বার পুনরাবৃত্ত হয় বিভিন্ন সংখ্যায় সেই ভি এন টি আর অংশগুলোরই শুধু প্রতিলিপি তৈরি হয়। যে উপাদানগুলো গ্রথিত হয়ে হয়ে প্রতিলিপি তৈরি হবে তাদের কোন কোন পরমাণুতে স্বতপ্রভা হবার বা রাসায়নিকভাবে আলো বিচ্ছুরণের উপাদান মিশিয়ে দেয়া হয়। ফলে এভাবে তৈরি প্রতিলিপিগুলো থেকে বিশেষ ধরনের আলো বিকীর্ণ হয়। প্রতিলিপি হওয়া ভি এন টি আর সম্বলিত ডি এন এ টুকরাগুলো পুনরাবৃত্তির সংখ্যা অনুযায়ী নানা দৈর্ঘের হবে।

পুনরাবৃত্তি যেখানে যত বেশিবার, টুকরার দৈর্ঘ সেখানে তত বেশি। এবার নানা দৈর্ঘের এই টুকরাগুলোকে দৈর্ঘের ক্রম অনুযায়ী বিশেষ ভাবে সাজিয়ে নেবার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপটি নিতে হয়।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে রেখে অনন্য প্যাটার্ন

ডি এন এটি আর এর পুনরাবৃত্তি সংখ্যা অনুযায়ী লম্বা বেঁটে হবার মানে হলো এদের মধ্যে ভরেরও পার্থক্য থাকে। যেগুলোর পুনরাবৃত্তি বেশি সেই টুকরাগুলোর দৈর্ঘ বেশি, তাই এরা ভারী বেশি। যেহেতু ডি এন এ'র সব টুকরা ডি এন এ'র উপাদান ফসফেট গ্রুপের কারণে নেগেটিভ বিদ্যুৎ ধারণ করে, তাই এগুলো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে তার নেগেটিভ প্রান্ত থেকে পজিটিভ প্রান্তের দিকে আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। একটি থকথকে জেল জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে রাখা এই ডি এন এ টুকরাগুলো কোন্‌টি কতখানি বেগে এগিয়ে যাবে তা নির্ভর করবে টুকরার ভরের উপর। তাই হালকাগুলোই এগিয়ে থাকবে

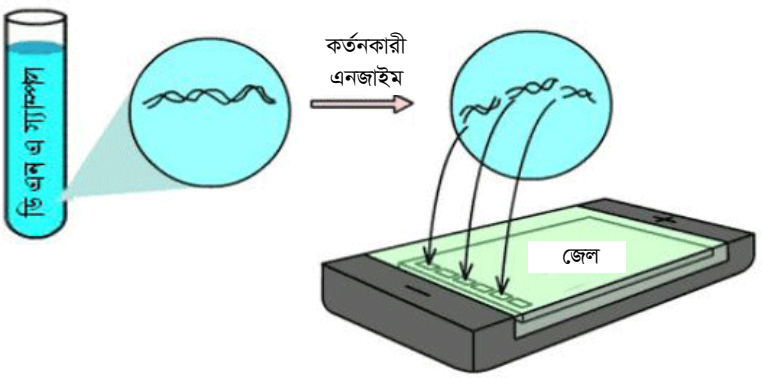

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে জেলের মধ্যে রাখা টুকরাগুলো

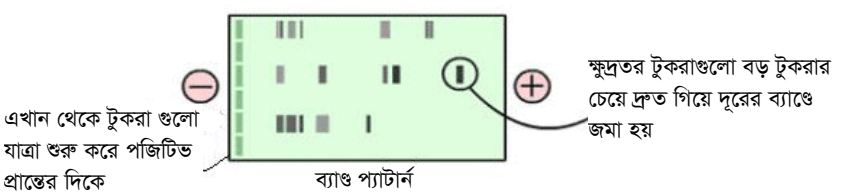

ইলেকট্রোফোরেসিস

সব চেয়ে বেশি, ভারীগুলো অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকবে। যখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে লম্বা ফিতার আকৃতির একটি গর্তের মধ্যে ঐ ডি এন এ মেশানো জেল রাখা হয় তখন তাতে ভর অনুযায়ী টুকরাগুলো ঐ ফিতার নানা স্থানে আগে

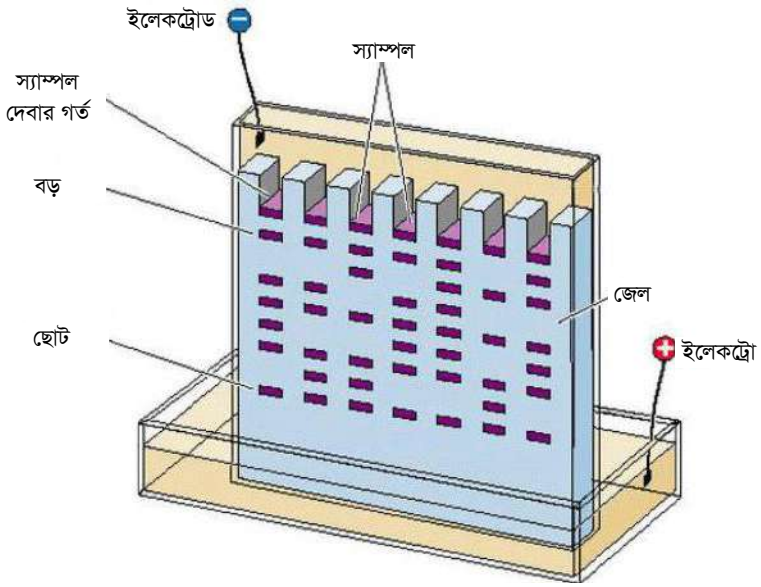

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে জেলের মধ্যে রাখা ডিএনএ টুকরার বিন্যাস (প্রকৃত যন্ত্রপাতি)

পিছে জড়ো হয়। একই ভরের বিপুল সংখ্যক টুকুরাগুলো এভাবে এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে পর পর বেশ স্পষ্ট মোটা কিছু দাগে (ব্যান্ডে) পরিণত হয়,

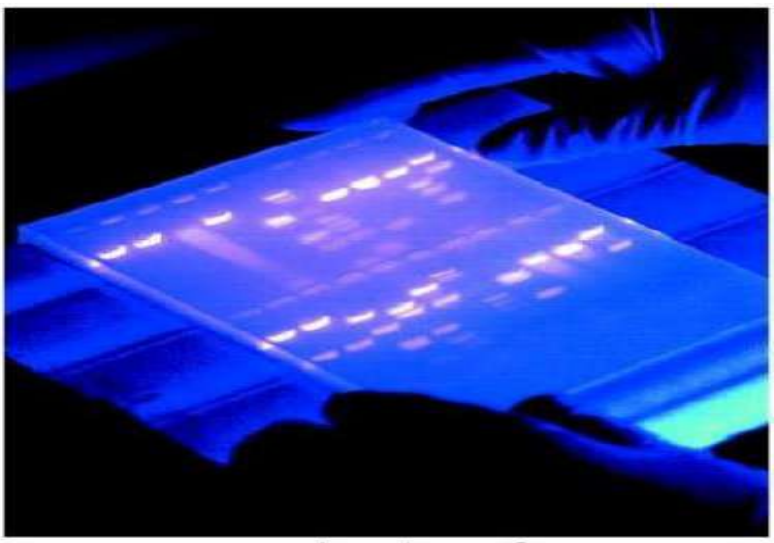

ইলেকট্রোফোরেসিস প্রতিপ্রভায় উজ্জ্বল ব্যান্ড প্যাটান

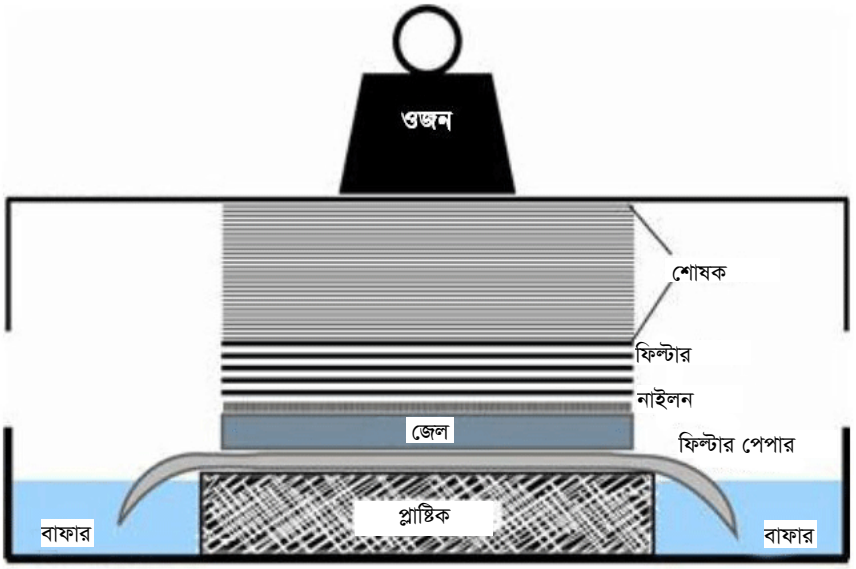

ব্লটিং

অনেকটা দোকানের পণ্যের লেবেলের উপর থাকা বার কোডের মত। টুকরাগুলোতে স্বতঃপ্রভ বা রাসায়নিক প্রভার পরমাণু থাকাতে প্রত্যেক দাগে অসংখ্য টুকরার সম্মিলিত প্রভায় বিশেষ আলোতে দাগগুলো জ্বলজ্বল করে। ঐ অবস্থায় ফটো তুলে নিলে নানা দাগের সুন্দর একটি প্যাটার্ন পাওয়া যায়। এই

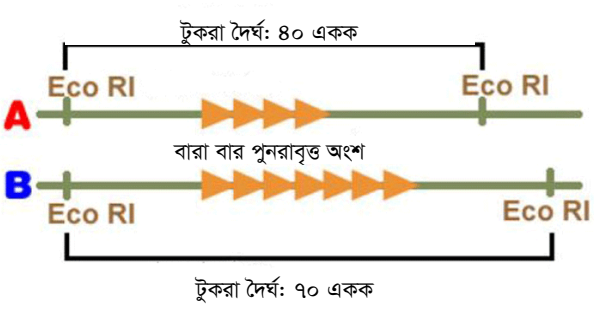

ECO RI নামক এনজাইম দিয়ে সেটির
যথাযথ কাটার জায়গাগুলিতে ডিএনএ কাটা হয়েছে

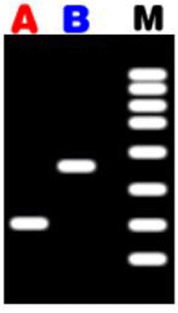

ইলেকট্রোফোরেসিস প্যাটার্নে
A ও B এর অবস্থান
M হলো রেফারেন্স প্যাটার্ন

বিভিন্ন সংখ্যক পুনরাবৃত্তির কারণে
A ও B এর সংশি- ষ্ট টুকরা দুটির দৈর্ঘ ভিন্ন।
প্যাটার্নে এদের গঠিত ব্যান্ডের অবস্থানও তাই ভিন্ন।

প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ইলেকট্রোফোরেসিস। আগেই দেখেছি পি সি আর'এ টুকরাগুলোর প্রতিলিপি হবার সময় তার উপাদানের সঙ্গে স্বতঃপ্রভ বস্তু মিশিয়ে দেয়া হয় বলে জড়ো হওয়া টুকরার সৃষ্ট দাগগুলো জ্বল জ্বল করে। তুলনা করার জন্য বিভিন্ন স্যাম্পল থেকে পাওয়া প্যটার্ন পাশাপাশি সৃষ্টি করা যায়।

তবে ফটো তোলার আগে আর একটি কাজ করে নিতে হয়। ঐ যে জেলের মধ্যে নানা স্থানে টুকরাগুলো জমে জমে দাগগুলো গড়ে উঠলো তাদের একটি ছাপ নাইলনের সূক্ষ্ম ঝিল্লির উপর নিয়ে নিতে হয়। এই ঝিল্লি জেলের উপর রেখে তার উপর আবার অনেক স্তর ব্লটিং পেপার (চোষ কাগজ) রেখে চাপ দেয়া হয়। এর ফলে জেল অংশটি ব্লটিং পেপারে চুষে যায় এবং ডি এন এ টুকরার দাগগুলো ঝিল্লির উপর চলে আসে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ব্লটিং। ফটো আসলে নেয়া হয় ঝিল্লির উপরের দাগগুলোরই, যাকে বলা হয় ব্লট। অন্ধকারে ঝিল্লির স্বতঃপ্রভ দাগগুলোই ফটোতে আসে।

এই যে ফটোটি নেয়া হলো তার মধ্যে দাগের যে প্যাটার্ন তা কোন দুই ব্যক্তির জন্য কখনো একই রকম হবেনা। কারণ আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি এসব ভি

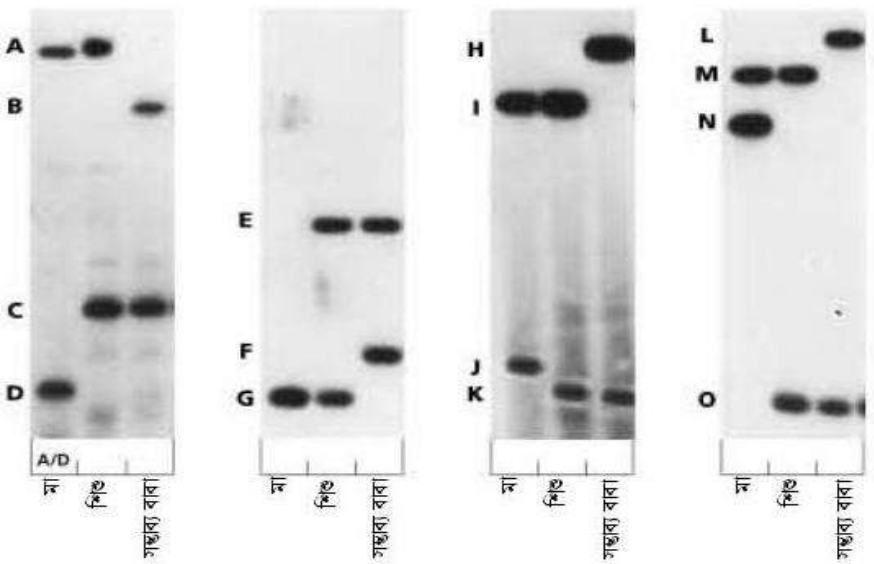

ডি এন এ দিয়ে পিতৃত্ব নির্ণয়।
দীর্ঘ ইলেকট্রোফোরেসিস প্যাটার্নটিকে চার ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। শিশুর A থেকে O পর্যন্ড় ব্যান্ডগুলো হয় মায়ের সঙ্গে মিলছে, নইলে সম্ভাব্য বাবার সঙ্গে মিলছে। কাজেই তিনিই প্রকৃত বাবা।

এনটিআর এর পুনরাবৃত্তির সংখ্যা কখনো দুই ব্যক্তির মধ্যে এক রকম হয়না। তাই এই দাগগুলোর পরপর সেজে যাওয়ার প্যাটার্নটি যেহেতু ঐ পুনরাবৃত্তির ও প্রকারান্তে বিভিন্ন টুকরার সাইজের উপর নির্ভর করছে, তাই এই প্যাটার্নও কোন দুই ব্যক্তির এক হবেনা। আঙ্গুলের ছাপের মতই এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনন্য। এভাবেই সম্ভব হচ্ছে ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। অপরাধ স্থলে পাওয়া কোন স্যাম্পলের ডি এন- এ'র থেকে পাওয়া এই প্যাটার্ন যদি কোন ব্যক্তির থেকে নেয়া ডি এন এর প্যাটার্নের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঐ ব্যক্তি অপরাধ স্থলে ছিল। এবং অপরাধ স্থলের ডি এন এ কী অবস্থায় কোথায় পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় সে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা।

পিতৃত্ব নির্ণয় ও প্রফাইলিং

নিজের জন্য এই অনন্য প্যাটার্ন আমরা প্রত্যেকে পেলাম কোথা থেকে? অবশ্যই বাবা মায়ের কাছ থেকে। মেণ্ডেলের সরল নিয়মে যেমন করে সন্তান কোন ক্ষেত্রে জিনের বাবার কপিটি আর কোন ক্ষেত্রে মায়ের কপিটি ইতস্ততভাবে পায়– ফলে গড়পড়তা প্যাটার্নের অর্ধেক দাগ আসে বাবার কাছ থেকে অর্ধেক মায়ের কাছ থেকে, সন্তানের প্যাটার্নটি বাবার ও মায়ের প্যাটার্নের পাশাপাশি রাখলে সন্তানের কোন কোন ব্যান্ড বাবার প্যাটার্নের মধ্যে একই জায়গায় একই ব্যান্ডের সঙ্গে মিলবে, অন্যগুলো মায়ের প্যাটার্নের সঙ্গে মিলবে। এখন ধরা যাক একটি সন্তানের বাবা কে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে যাকে বাবা বলে মনে করা হচ্ছে তার প্যাটার্নটি সন্তান ও মায়ের প্যাটার্নের পাশে রাখলেই ব্যাপারটি উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। যদি উনিই বাবা হোন তা হলে মায়ের সাথে মেলা ব্যান্ডগুলো বাদ দিলে সন্তানের বাকি ব্যান্ডগুলো তাঁর সঙ্গেই মিলবে। যদি না মিলে তা হলে তিনি বাবা নন। যদিও এর প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম ঘটে, তবুও মাতৃত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এই একইভাবে ডি এন এ'র এই পদ্ধতি কার্যকর হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটি কাজে লাগে। যেমন অভিবাসন সংক্রান্ত একটি ঘটনায় কয়েকজন ছেলেমেয়ে তাদের মায়ের সঙ্গে কোন একটি দেশে অভিবাসনের অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু অভিবাসন কর্তৃপক্ষ তাদের একজনকে ঐ পরিবারের সন্তান নয় বলে দাবী করছিল। ডি এন এ পরীক্ষা থেকে সব ভাই বোনের ডি এন এ প্যাটার্নে মায়ের সঙ্গে মিলে যাওয়া ব্যান্ডগুলো বাদ দিলে বিভিন্ন সন্তানের প্যাটার্ন থেকে নিয়ে তাদের অনুপস্থিত বাবার প্যাটার্নটি মোটামুটি খাড়া করা যায়। দেখা গেল

সন্দেহ করা ঐ বাচ্চাটির প্যাটার্নও ঐ মা আর ঐ বাবার ব্যান্ডগুলো দিয়েই তৈরি। এভাবে সে যে ঐ পরিবারেরই সন্তান সে ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া গেল।

ব্যক্তিগত ডিএনএ পরিচয়
(ডিএনএ প্রোফাইলিং)

কোন একটি জনগোষ্ঠির সবার ডি এন এ প্যাটার্ন এভাবে নিয়ে সংরক্ষিত করা যায়– যা পরে কোন সনাক্তকরণের কাজে লাগে। এ কাজকে বলা হয় ডি এন এ প্রফাইলিং। প্যাটার্নগুলো সাধারণ ইমেজের আকারে কম্পিউটারে অনায়াসে সংরক্ষণ করা যায়। এজন্য ব্যাপক ভাবে সবার থেকে ডি এন এ স্যাম্পল সংগ্রহ করতে হয় ও তার ডি এন এ থেকে প্যাটার্ন সৃষ্টি করে তা সংরক্ষণ করতে হয়। পরে অপরাধ সংক্রান্ত, আত্মীয়তা সংক্রান্ত, চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত বা এরকম অন্যান্য প্রয়োজনে কোন বিশেষ প্যাটার্নটির সঙ্গে এই সংগ্রহের কোন ব্যক্তির প্যাটার্ন মেলে কিনা তাও কম্পিউটারের সাহায্যেই নির্ভুলভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়। সনাক্তকরণ যে শুধু জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হয় তা নয়। মৃতদেহ এমনকি কঙ্কাল থেকে ডি এন এ নিয়ে সেটি কোন্ ব্যক্তির তা তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে পাওয়া ডি এন এ থেকে, অথবা নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে তুলনা থেকে উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

ডি এন এ'র বর্ণ পাঠ

বর্ণ পাঠের মানে

ডি এন এ নিয়ে কিছু কিছু কাজ আছে যা তার ভাষা না পড়েই করা যায়। অর্থাৎ দীর্ঘ ডি এন এ সূত্রের মধ্যে C,G,A,T এই চারটি বেইস (ভাষার উপমায় যাদেরকে আমরা বর্ণ বলেছি) কোথায় কোন্‌টির পর কোন্‌টি সাজানো রয়েছে সর্বাংশে তা না জেনেও কাজটি করা যায়। সে রকম একটি কাজ আমরা দেখলাম ডি এন এ'র মাধ্যমে সনাক্তকরণের কাজে। এক্ষেত্রে আমাদের শুধু ভি এন টি আর'গুলো চিনে নিয়ে তাদের জায়গাগুলোর অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করতে হয়েছে। এই তোতলানো অংশের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা অনুযায়ী টুকরাগুলো ছোট বড় হবার সুযোগটিই শুধু আমরা নিয়েছি সনাক্তকরণের কাজে এর জন্য, বিস্তারিত বেইস পরম্পরায়গুলো আমাদের জানতে হয়নি।

কিন্তু ডি এন এ'র এক একটি বার্তাবহ অংশ যাকে জিন বলা হয় তার বার্তাকে উদ্ঘাটিত করতে হলে জানতে হয় সেখানে বেইসগুলো কী পরম্পরায়ে সাজানো আছে, কোন্‌টির পর কোন্‌টি রয়েছে। তারপরেই প্রশ্ন উঠবে ওভাবে বেইসের 'বর্ণ' সাজিয়ে যে 'বাক্য' বা জিন তৈরি হলো তার অর্থটি কী? কিন্তু সবার আগে বেইসের ঐ পরম্পরায়টি উদ্ঘাটন করতে হবে– যাকে বলা হয় সিকোয়েন্সিং বা পরম্পরায় উদ্ঘাটন। ডি এন এ সূত্রের বেইস দিয়ে গড়া নিরবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ ক্রমটিতে কোন্ বেইসের পর কোন বেইস রয়েছে সেটি দ্রুত পড়ে ফেলার উপায় উদ্ভাবন আধুনিক ডি এন এ বিজ্ঞানের একটি বড় সাফল্য। কারণ ঐ আণবিক আকারের ডি এন এ'তে বেইস অণু কোন্‌টি কোথায় রয়েছে তা জানা সহজ কাজ নয়। রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতেই শুধু তা করা সম্ভব। এটি দীর্ঘ সময় ও সূক্ষ্ম নিঁখুত পরীক্ষণ সাপেক্ষ। আমরা যে আজকাল মানুষ সহ এক একটি জীবের সম্পূর্ণ জেনোম উদ্ঘাটনের কথা বলছি তার প্রাথমিক কাজটিও মূলত এটিই– তার সকল ডিএনএর সিকোয়েন্সিং। তবে আধুনিকতম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কল্যাণে এখন প্রক্রিয়াটি সহজতর ও দ্রুততর হয়ে পড়েছে।

প্রত্যেক ক্রোমোজোমে বাণ্ডিল করা অবস্থায় যে ডি এন এ রয়েছে জেনোম উদ্ঘাটনের জন্য বাণ্ডিল খুলে এর পুরো ডি এন এ উন্মুক্ত করে তার সিকোয়েন্সিং করতে হয়। প্রত্যেক ক্রোমোজোমের ডি এন এ'র জন্য এটি করতে হয়। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি ডি এন এ'র বার্তা তিন বেইসে গড়া কোডনের

আকারে রয়েছে। এই এক একটি কোডন এক একটি এমাইনো এসিড গঠনের বার্তা বহন করছে। এভাবে কোডনের পর কোডনে তৈরি হয়েছে পুরো বার্তা– জিন, যা একটি প্রোটিন গঠন করার নির্দেশিকা। এর মধ্যে আবার থাকতে পারে মিউটেশন বা বিচ্যুতি। এর সব কিছু উদ্ঘাটনেরই প্রথম ধাপ হলো বেইসের পরম্পরায় নির্ণয়– সিকোয়েন্সিং।

ডিএনএ কর্তনের মাধ্যমে সিকোয়েন্সিং

সিকোয়েন্সিং করার মূলত দুটি পদ্ধতি রয়েছে। উভয়টিতেই কৌশল হচ্ছে ডি এন এ'র স্যাম্পলে সম্ভাব্য সব রকম দৈর্ঘের টুকরা পাওয়ার ব্যবস্থা করা যার প্রত্যেকটির প্রান্তে স্বাভাবিক ভাবেই A,T,C,G এই চার বেইসের কোন না কোনটি থাকবে। প্রত্যেক টুকরার ঐ প্রান্তের বেইসটিকেই আসলে নির্ণয় করা হয়। এরকম ব্যবস্থা দুভাবে করা যায়। এর একটিতে প্রত্যেকটি ডি এন এ'কে ইতস্তত যে কোন জায়গায় কেটে ফেলা যায়। অন্যটিতে মূল ডি এন এ অনুসরণ করে একটি একটি করে বেইস সংশ্লেষণ করে এবং বিশেষ বেইসে থেমে গিয়ে সব রকম দৈর্ঘের টুকরা তৈরি করে ফেলা যায়। প্রথমে কাটার মাধ্যমে সিকোয়েন্সিংটাই দেখা যাক।

ডি এন এ'র পুরো স্যাম্পলটি চার ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগের সঙ্গে এমন রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় যার বিক্রিয়া ডি এন এ'র সূত্রটিকে কোন A বেইসের কাছে কেটে দেয় শুধু একটি জায়গায়, যাতে কাটা জায়গার প্রান্তে A বেইসটিই থাকে। কাজ শুরুর আগে মূল ডি এন এ'র অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করে স্যাম্পল বাড়িয়ে নেয়া হয়। এখন স্যাম্পল ডি এন এ এত অসংখ্যটি রয়েছে যে সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে এই কাটার কাজটি এক এক ডি এন এ সূত্রের ক্ষেত্রে এক এক জায়গায় হবে– যত জায়গায় A বেইস রয়েছে। ফলে এরকম টুকরা যত রকম দৈর্ঘের সাইজে পাওয়া সম্ভব সব রকম'ই পাওয়া যাবে। আর প্রত্যেক সাইজের এরকম টুকরার সংখ্যাও হবে অনেক। শুরু থেকে মাত্র একটি বা দুটি বেইসের পরে যে A আছে সেখানে কাটলে যেমন খুবই বেঁটে টুকরা দেবে, আর শত শত বেইসের পর যে A আছে সেখানে কাটলে দেবে একটি লম্বা টুকরা– এভাবে সব রকমের দৈর্ঘের টুকরা পাওয়া যাবে, প্রত্যেকটি অনেক সংখ্যায়। এভাবে স্যাম্পলের অন্য তিন ভাগের একটিতে T বেইসে কাটার, অপরটিতে C বেইসে কাটার, ও বাকিটিতে G বেইসে কাটার মত রাসায়নিক দ্রব্য দেয়া হয়। A বেইসের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে T,C,G এই বাকি তিনটির ক্ষেত্রেও ঐ একই ঘটনা ঘটবে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রিয়ায়। অর্থাৎ ঐ বিশেষ বেইসের

জায়গাতে কেটে গিয়ে অসংখ্য টুকরায় এগুলোও প্রান্তে থাকবে– সব রকমের দৈর্ঘের টুকরায়। কারণ A বেইসের সব রকম অবস্থানে যেমন কর্তন ঘটে, অন্য তিনটিরও সব অবস্থানে এটি ঘটে।

এখন আলাদা পাত্রে রাখা চার ভাগ এক সঙ্গে বিবেচনা করলে, অর্থাৎ প্রান্তে A থাকা, T থাকা, G থাকা অথবা C থাকা সব টুকরা বিবেচনা করলে, এক সাইজের টুকরার সঙ্গে তার পরবর্তী সাইজের টুকরার দৈর্ঘের ব্যবধান হবে মাত্র একটি বেইস। সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে সব জায়গায় কাটার সম্ভাবনা থাকার ফলেই এটি ঘটবে। শুরুতেই সব ডি এন এ সূত্রের প্রারম্ভিক প্রান্তে নিউক্লিয়োটিডে ফসফরাস পরমাণুকে তেজষ্ক্রিয় ফসফরাস আইসোটোপ দিয়ে বদলে দেয়া হয়। এখন ডি এন- এ স্যাম্পলের প্রত্যেক ভাগের টুকরাগুলোকে আলাদাভাবে ইলেকট্রোফোরেসিস ও ব্লটিং করা হয়, ঠিক যেমন ভাবে ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিংএ সনাক্ত করার প্যাটার্ন সৃষ্টির জন্য করতে আমরা দেখেছি। দৈর্ঘের ক্রম অনুযায়ী সেজে গিয়ে সমান দৈর্ঘের সব টুকরা এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে সে ভাবেই দাগ সৃষ্টি করে। এগুলো থেকে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় বলে তা ফিল্মে দাগ সৃষ্টি করে ফটোতে সে রকমই প্যাটার্ন সৃষ্টি করে। চার পাত্রের চারটি প্যাটার্নকে পাশাপাশি রাখলে এবং একই সঙ্গে বিবেচনা করলে, ঐ ডিএনএর প্রথম বেইস থেকে শেষ বেইস পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে শেষ হওয়া টুকরার জন্য দাগ এই চারটি প্যাটার্নের কোন না কোনটিতে পাওয়া যাবে। সব চেয়ে বেঁটে হালকা টুকরা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ডিএনএ নিয়ে সব চেয়ে দীর্ঘ পর্যন্ত টুকরার পরপর কোন দাগ কোন প্যাটার্নে (A তে, না T তে, না C তে, না G তে শেষ হওয়া টুকরার প্যাটার্নে) পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে বুঝা যায় কোনটির পর কোন বেইস ডি এন এ'টিতে রয়েছে। এই পদ্ধতিতে টুকরা পাওয়ার জন্য আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যবহার করেছি বলে একে রাসায়নিক পদ্ধতি বলা যায়। উদ্ভাবনকারীদের নামে একে ম্যাক্সাম-গিলবার্ট পদ্ধতিও বলা হয়।

ডিএনএ সংশ্লেষণের মাধ্যমে সিকোয়েন্সিং

বিভিন্ন বেইসে ডি এন এ কাটার মাধ্যমে আমরা যা করেছি, মূল ডি এন এ'র অনুরূপ ডিএনএ সংশ্লেষণ শুরু করে এবং তাকে বিভিন্ন বেইসে থামিয়ে দিয়েও একই কাজ করা যায়। এখানে স্যাম্পলের মূল ডি এন এ'র একটি সূত্রকে ছাঁচ হিসাবে ব্যবহার করে পলিমারেজ এনজাইমের সাহায্যে তার একটি প্রতিলিপি

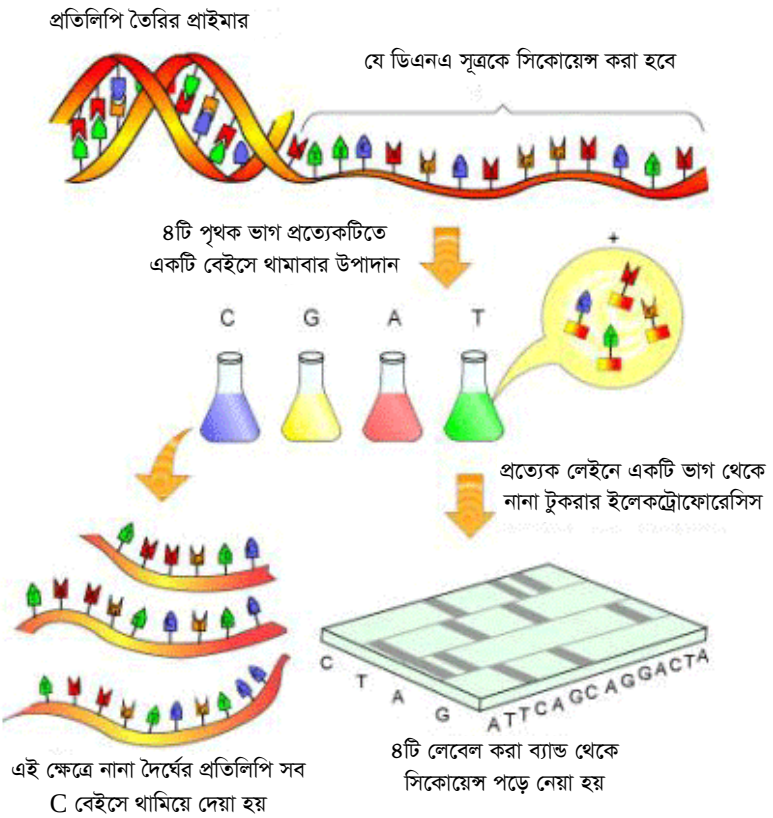

ডিএনএ সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি
(এক এক বেইসে প্রতিলিপির কাজ থামিয়ে দিয়ে)

তৈরির কাজ শুরু করা হয়। বিভিন্ন নিউক্লিয়োটিড জুড়ে জুড়ে এরকম সংশ্লেষণ হবার সময় A বেইস সংলগ্ন কোন কোন নিউক্লিওটিডে কিছু বিকৃত অংশ থাকে বলে সংশ্লেষণে সেটি আসার পর সেখানটিতে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি থেমে যায়। কাজেই এখান থেকে আমরা এমন একটি ডি এন এ টুকরা পাই যার প্রান্তে A রয়েছে। কাণ্ডটি ঘটে অসংখ্য ডি এন এ'র প্রতিলিপিতে– এই কপিতে এখানে, ঐ কপিতে ওখানে করে ইতস্তত সব রকমের জায়গায় যেখানে A বেইসটি থাকে। কাজেই টুকরাগুলো সবচেয়ে বেঁটে থেকে সবচেয়ে দীর্ঘ সব রকমেরই হয়। ভিন্ন ভিন্ন রকম বিকৃত নিউক্লিয়োটিড ব্যবহার করে একই ঘটনা T,C,G এর ক্ষেত্রেও করা যায় যা ঐ বিশেষ বেইসে সংশ্লেষণ থামিয়ে দেবে।

ডিএনএ সিকোয়েন্সিং
(চারটি লেইন থেকে পর পর পড়ে নেয়া)

এই ক্ষেত্রেও ডিএনএ স্যাম্পলকে চার ভাগে ভাগ করে ফেলা হয় এক ভাগে A সংলগ্ন নিউক্লিয়োটিডটি বিকৃত ব্যবহার করে, আরেকটিতে T সংলগ্নটিকে বিকৃত ব্যবহার করে, এমনিভাবে C ও G এর জন্যও। চারটি পাত্রে চার রকমের বেইসে শেষ হওয়া ইতস্তত সব রকম দৈর্ঘের টুকরা পাব। বাকি কাজ আগের মতই। চারটি ভাগ থেকে ইলেকট্রোফোরেসিস ও ব্লটিং এর মাধ্যমে প্যাটার্ন পাব, যা এক সঙ্গে বিবেচনা করলে পর পর দাগগুলোর পরস্পর ব্যবধান মাত্র এক বেইসের হবে। এবার ঐ চারটি প্যাটার্ন থেকে পর পর দাগগুলো কোন্‌টি কোন্ প্যাটার্নে পাওয়া যাচ্ছে সেই অনুযায়ী বলতে পারবো পরপর বেইসগুলো কী? কারণ একটি প্যাটার্নের সব দাগ A তে শেষ হওয়া টুকরায় গড়া, অন্যটিতে তা T তে শেষ হওয়া টুকরায়, অন্য দুটিতে C ও G এ। ধরা যাক সবার নিচের দাগটি পাওয়া গেল T এর প্যাটার্নে, তার ঠিক উপরে যেটি হবার কথা তা খুঁজে পাওয়া গেল A এর প্যাটার্নে, পরেরটি C এর প্যাটার্নে, তারপরেরটি G এর প্যাটার্নে, এমনি ভাবে। তা হলে বলা যাবে ডিএনএটির বেইস পরম্পরায়ের শুরুটি হলো T A C G A G A T. . . এভাবে। (পাশের ছবির মত)।

এই পদ্ধতিতে পলিামরেজ এনজাইম ব্যবহার করে ডিএনএ সংশ্লেষণের মাধ্যমে টুকরাগুলো তৈরি হয়েছে বলে একে এনজাইমেটিক পদ্ধতি বলা যায়। তাছাড়া উদ্ভাবনকারীদের নামে একে স্যাঙ্গার-কুলসন পদ্ধতিও বলা হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিই প্রধানত অনুসৃত হয়।

অটোমেটিক মেশিনে সিকোয়েন্সিং

উল্লিখিত দুটি পদ্ধতিতে প্রথম যখন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সম্ভব হয় তখন তা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। অল্প কিছু অংশের সিকোয়েন্সিং করতেও এতে অনেক সময় লেগে যেত, ভুলের সম্ভাবনা এড়াতে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন এটি একেবারে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। এতে মূলত স্যাঙ্গার-কুলসন পদ্ধতি (প্রতিলিপি সংশ্লেষণ করে ও তা বিভিন্ন বেইসে থামিয়ে দিয়ে) অটোমেটিক মেশিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা হয়।

ডিএনএ সিকোয়েন্সিং মেশিন

এতে চারভাগে ভাগ করে ডিএনএ স্যাম্পল দিয়ে দেয়া হয়। উপযুক্ত প্রাইমার দিয়ে তাদের প্রত্যেকটিতে মূলটির ছাঁচে নূতন ডি এন এ সংশ্লেষিত হয়ে প্রতিলিপি তৈরি হতে থাকে। প্রত্যেক ভাগে A,T,C,G চার বেইসের এক একটিতে সংশ্লেষণ থামিয়ে দেবার জন্য যার যারটির উপযুক্ত বিক্রিয়ার মিশ্রণ (রিয়্যাকশন মিক্সচার) মিশিয়ে দেয়া হয়। তা ছাড়া এর প্রত্যেকটির সঙ্গে মেশানো হয় চারটিতে চার রকমের প্রতিপ্রভ রঙ-বস্তু (ফ্লোরোসেন্ট ডাই) যার

উপর লেজার আলো পড়লে এক একটি এক এক রঙের আলোতে জ্বলে উঠবে।

পরের কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতে থাকে। সংশ্লেষণ এক এক ভাগে এক এক বেইসে থেমে গিয়ে প্রত্যেক জায়গায় সব রকম দৈর্ঘের অসংখ্য টুকরা তৈরি হয়, যার প্রান্তে সবগুলোর ঐ বেইসই থাকে। যথারীতি ইলেকট্রোফোরেসিস হয়ে চারটি প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যায়। চারটি প্যাটার্ন পাশাপাশি চারটি 'লেইনের' আকারে থাকে। এবার এগুলোর উপর প্রয়োগ করা হয় ফ্লুরোমিটার অর্থাৎ প্রতিপ্রভা (ফ্লুরোসেন্স) পরিমাপের যন্ত্র। এতে একটি লেজার রশ্মি খুব দ্রুত পর পর চারটি লেইনের উপর আসা যাওয়া করতে থাকে প্রত্যেকবার চার লেইন শেষ করার পর প্যাটার্নের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দিকে এক ঘর এগিয়ে গিয়ে (বেঁটে টুকরার সৃষ্ট দাগ থেকে লম্বা টুকরার সৃষ্ট দাগের দিকে)। চার লেনের একই অংশের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় যেই লেনের উপর ওখানে দাগ পাবে সেই দাগের উপর লেজার পড়লে সেই লেইনের বেইস অনুযায়ী (সে ভাগে মেশানো ফ্লুরোসেন্ট রঙ-বস্তু অনুযায়ী) এক এক রঙের আলোতে তা জ্বলে উঠে এবং সেই রঙ কম্পিউটারে রেকর্ড হয়– যা ওখানে টুকরার প্রান্তে কোন বেইস রয়েছে তা রেকর্ড হবারই নামান্তর মাত্র।

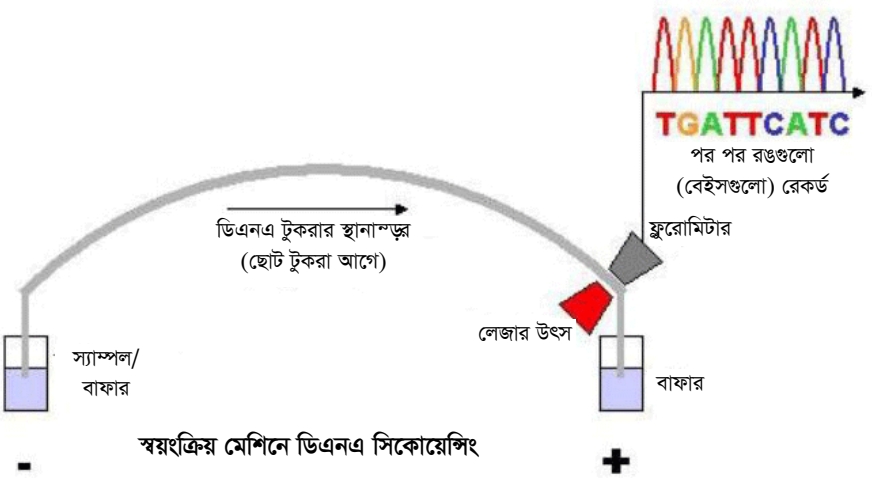

স্বয়ংক্রিয় মেশিনে ডিএনএ সিকোয়েন্সিং

অর্থাৎ লেজার যখন চারটি লেইনে এক দিক থেকে দাগ খুঁজতে থাকে সেই প্রক্রিয়ায় ডি এন এ'তে পর পর কোন বেইস সাজানো আছে তাই কম্পিউটারে রেকর্ড হতে থাকে স্বয়ং-ক্রিয়ভাবে। উদাহরণ স্বরূপ TGCAGGTCGATG .

.. এভাবে চলতেই থাকে। অটোমেটিক মেশিনে দ্রুত সব কিছু চলতে থাকে বলে এভাবে দীর্ঘ ডিএনএ'র সিকোয়েন্সিং খুব অল্প সময়ে করে ফেলা যায়।

তবে এক একবারে কত দীর্ঘ ডিএনএ অংশের ক্ষেত্রে এভাবে সিকোয়েন্সিং করা যাবে মেশিনে তার একটি সীমাবদ্ধতা আছে। সাধারণত ৩০০ বেইসের বেশি দীর্ঘ ডি এন এ একবারে এতে প্যাটার্নে আনা যায় না। কাজেই পুরো ডি এন

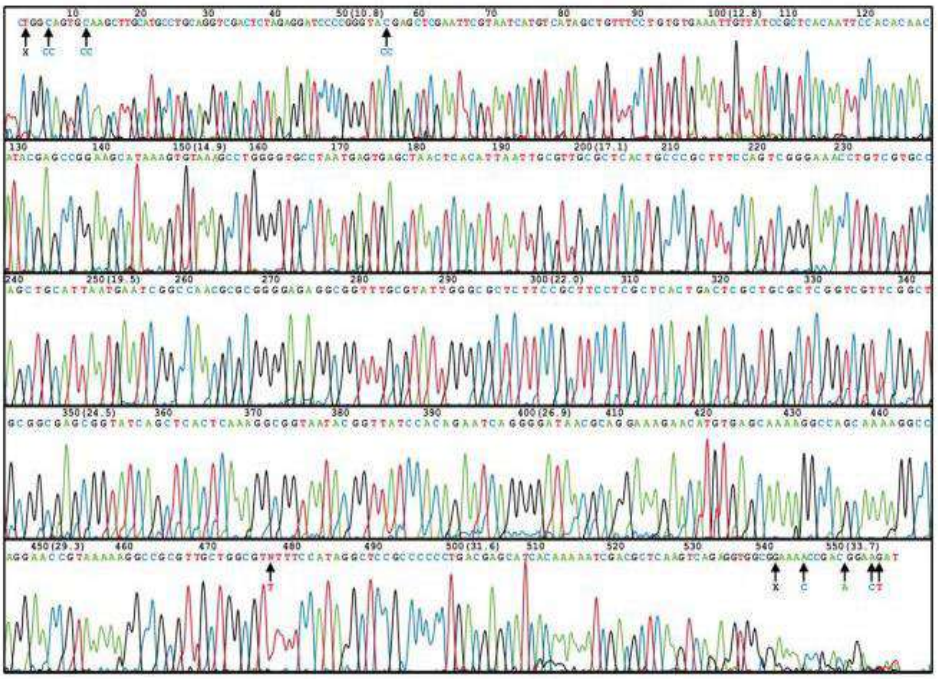

স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিনে
ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ফলাফল

এ'কে অনেকগুলো টুকরাতে ভেঙ্গে ফেলে একে একে টুকরাগুলোর সিকোয়েন্সিং করতে হয়। ডি এন এ কেটে ফেলার যে কর্তন-কারী এনজাইমগুলো রয়েছে টুকরা করার জন্য সেগুলো ব্যবহার করা হয়। টুকরাগুলো কোনটির পর কোনটি আসবে কম্পিউটার যেন তা বুঝে নিতে পারে এ জন্য কাটার সময় টুকরাগুলোর মধ্যে কিছু উপরিপাতন (ওভারল্যাপ) রাখা হয়। অর্থাৎ একটি টুকরার শেষ প্রান্তের কিছু অংশ পরের টুকরার শুরুতে আবার থাকে। এই উপরিপাতিত অংশ দেখে যন্ত্র বুঝতে পারে কোনটির পর কোনটি আসবে সিকোয়েন্সিংএ।

অটোমেটিক সিকোয়েন্সিং মেশিন দ্রুত অধিকতর দক্ষ ও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। তাই দুনিয়ার অনেক ল্যাবোরেটরিতে এখন নিয়মিতভাবেই দ্রুত ডি এন এ'র সিকো-য়েন্সিং করা সম্ভব হচ্ছে। এখন এমনকি অনেক সৌখিন বিজ্ঞানীর পক্ষেও এই কাজ সম্ভব হচ্ছে। মানুষের নিজের জেনোম উদ্ঘাটনের যে কাজটি ২০০০ সাল নাগাদ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সিকোয়েন্সিং সহজলভ্য হওয়াতে এটি এখন নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আশা করা হচেছ যে অদূর ভবিষ্যতে অসংখ্য মানুষ নিজের ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ ডি এন এ'র (জেনোমের) সিকোয়েন্সিং করিয়ে যার যার ডি এন এর বার্তা জানতে ও ব্যবহার করতে পারবে– যেমন একান্ত নিজের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার ধরণটি জানতে।

আজকের ডিএনএ থেকে অতীত অনুসন্ধান

ডিএনএ থেকে অতীত জানি কী ভাবে ?

আজকের কোন জীবের ডি এন এ'র বার্তা কিন্তু সেই জীবের মধ্যে তার জীবদ্দশাতে সৃষ্টি হয়নি। এটি বংশানুক্রমে সুদূর অতীত থেকে এসেছে, বিবর্তনের পূর্বতন পর্যায়ে, এই জীবের পূর্বসূরিরা যখন অন্য জীব ছিল তখন থেকেও। কাজেই আজকের ডি এন এ'র মধ্যে অতীতের পরিচয় থাকবে বৈকি। ডি এন এ'র গঠন উদ্ঘাটনের পর, বিশেষ করে এর সিকোয়েন্সিং করতে পারার ফলে, এই অতীতকে উন্মোচন করার বিরাট সুযোগ দেখা দিয়েছে। যেমন আজকের কিছু মানুষের ডি এন এ'র মধ্যে মিল-অমিল লক্ষ্য করে বুঝা যায় যে তাদের সবার সাধারণ পূর্বপুরুষ কত নিকট অতীত বা দূর অতীতে ছিল। আজকের ঐ মানুষদের ডি এন এ'র মধ্যে পার্থক্য যত কম থাকে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ তত নিকট অতীতে ছিল বলে ধরা যায়। কারণ বংশধরদের মধ্যে ডি এন এ'র পার্থক্য দেখা যায় কালক্রমে তার বিভিন্ন জনের ডি এন এ'তে বিভিন্ন ধরনের মিউটেশন জমতে জমতে। যত বেশি কাল অতিক্রান্ত হবে তত বেশি এই পার্থক্য দেখা দেবে। কোন অঞ্চলের আজকের মানুষদের ডি এন এ'তে যদি এমন কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট থাকে যা অন্য কোন অঞ্চলেরও আজকের মানুষের মধ্যে প্রচুর রয়েছে– তা হলে মনে করা যেতে পারে যে অতীতে এদের পূর্বপুরুষরা ঐ দূরদেশ থেকে এসে এখানে অভিবাসী হয়েছে অথবা উল্টো এখান থেকে ওখানে।

এভাবে অতীতের দিকে যেতে যেতে আজকের ডি এন এ পরীক্ষা করে আমরা বিবর্তনের ক্ষেত্রেও বহু লক্ষ বছর আগের যুগের কথাও জানতে পারি। এখন যে সকল জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতিতে রয়েছে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ ঐ অতীতে কোন যুগে বাস করছিল তা জানা সম্ভব। এভাবে নানা জীবের আজকের ডি এন এ পরীক্ষা করে আমরা বিবর্তন বৃক্ষের কোন কোন শাখার হদিশ পেতে পারি। এর অর্থ কোন্ জীব বিবর্তনের কোন্ ধারায় কোন্ শাখা প্রশাখা থেকে এসেছে তা। কিন্তু এভাবে আজকের নানা জনের ডি এন এ'র মিল-অমিল পরীক্ষা করে অতীতের কথা স্পষ্ট করে জানতে গেলে একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর জন্য ডি এন এ'কে অবিমিশ্র ভাবে বংশানুক্রমে স্থানান্তরিত হতে হয়। কিন্তু যৌন প্রজনন ব্যবস্থা এটি হতে দেয়না। সন্তানের ডি এন এ শুধু একা বাবার, বা একা মায়ের নয়, বরং উভয়ের সংমিশ্রণ। আর এই সংমিশ্রণ ঘটে ইতস্তত

নেহাত দৈব চয়নের ভিত্তিতে এক সন্তানের মধ্যে এক এক রকম মিশ্রণে। কাজেই আজকের নানা জনের ডি এন এ'র মধ্যে মিল-অমিল থেকে অতীত অনুসরণের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা এর ফলে থাকেনা। প্রত্যেক প্রজন্মে বাবা আর মায়ের ডি এন এ এলোমেলোভাবে মেশার ফলে এ কাজে বিঘ্ন ঘটে। যদি ডি এন এ'র এমন কোন অংশ থাকে যা বরাবর শুধু মায়ের থেকে অথবা শুধু বাবার থেকে সন্তান পায়, এবং ওভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুধু মাতৃ-ধারায় বা পিতৃ-ধারায় বাহিত হয়ে আসে, তা হলে মিশ্রণের সুযোগ না থাকায় এর মধ্যে কালক্রমে জমা মিউটেশনগুলো সুশৃঙ্খলভাবে থেকে যেত– অতীত অনুসন্ধানের ঐ ব্যবস্থাটি তা হলে কার্যকর হতো। এই সুযোগটি এনে দিয়েছে উন্নততর জীবকোষে (যাদের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে) বিশেষ ধরনের কিছু ডি এন এ– মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ।

যে ডি এন এ শুধু মাতৃ-ধারায় পাই

উন্নত জীবের কোষে মূল ডি এন এ'গুলো থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোমে বাণ্ডিল করা অবস্থায়। কিন্তু এর বাইরে স্বল্প দৈর্ঘের কিছু ডি এন এ ছোট্ট লুপ বা রিং এর আকারে থাকে কোষের মাইটোকোন্ড্রিয়ায়। জীবকোষে ছোট ছোট এই মাইটোকোন্ড্রিয়া বেশ কিছু সংখ্যায় থাকে। মনে করা হয় সুদূর অতীতে বিবর্তনের আদি যুগে কোষে আশ্রয় নেয়া এক রকম ব্যাকটেরিয়াই কালক্রমে মাইটোকোন্ড্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। এই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ ঐ ব্যাকটেরিয়ারই ডি এন এ থেকে এসেছে, তাই ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ'র মতই তা লুপ আকৃতির, নাতিদৈর্ঘ। কিন্তু এখন তা তার আশ্রয়দাতার ডি এন এ হিসাবেই অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। ক্রোমো-জোমে না থাকলেও এটিও সেখানকার ডি এন এ'র মত কোডিং করে, অর্থাৎ বার্তা বহন করে এবং বার্তা কাজেও পরিণত করে।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো প্রত্যেক জীব মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ পায় শুধু তার মায়ের দিক থেকে, বাবার দিক থেকে নয়। স্ত্রীর ডিম্বকোষ আর পুরুষের শুক্রকোষ মিলিত হয়ে সন্তানের কোষ যখন গঠিত হয় তখন ডিম্বকোষের মাইটোকোন্ড্রিয়া তাতে যায়, কিন্তু শুক্রকোষের মাইটোকোন্ড্রিয়া বাদ পড়ে যায়। ফলে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ প্রত্যেকে পায় শুধু মাতৃ-ধারায়– ছেলে মেয়ে পায় মায়ের থেকে, মা পায় নানির থেকে, নানি পায় তার মা'য়ের থেকে– এমনি ধারায়। ফলে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'তে বাবা ও মা'র ডি এন এ ইতস্তত মিশে এই ধারা এলোমেলো হবার কোন সুযোগ নাই।

তাই নানা জনের এই ডি এন এ পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে মিউটেশন জনিত পার্থক্য থেকে বিভিন্ন জনের পূর্বপুরুষদের অতীত সম্পর্কের কালক্রম জানা সম্ভব। মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ দিয়ে একাজ করার আরো কিছু সুবিধা রয়েছে। এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল। মানুষের ক্রোমোজোমের ডি এন এ যেখানে তিন হাজার কোটি বেইস দীর্ঘ, মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ সেখানে মাত্র ১৬,৫০০ বেইস দীর্ঘ। এর কাজও সরল– মাত্র কয়েক রকমের প্রোটিন ও আর এন এ তৈরি করা। আর এগুলো খুব আবশ্যকীয় বলে জনে জনে বেশি পৃথক হবার কোন সুযোগ নাই। অথচ তার মধ্যেও এতে মিউটেশনের হার অপেক্ষাকৃত বেশি– সাধারণ ডি এন এ'র থেকে প্রায় ২০ গুণ হারে এতে মিউটেশন সৃষ্টি হয়। মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র একটি বিশেষ অংশ 'ডি-লুপে' মিউটেশনের এই হার আরো বেশি। ডি-লুপের ডি এন এ কোডিং করেনা

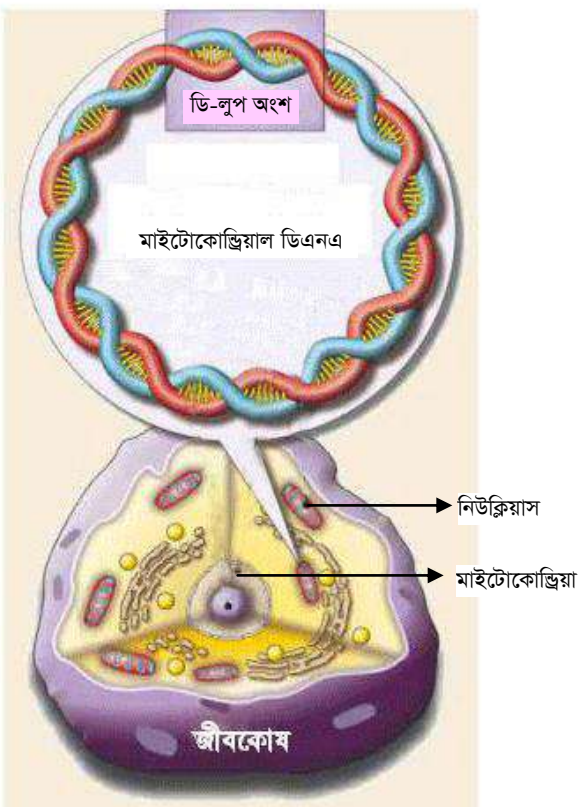

জীবকোষের মধ্যে মাইটোকোন্ড্রিয়া। উপরে তার ডিএনএ বড় করে দেখানো হয়েছে।

বা বার্তা বহন করেনা বলে এখানকার মিউটেশন হার বেশি হতে পেরেছে, জীবের কোন ক্ষতি না করে। কাজেই তুলনামূলক ভাবে অল্প সময়েই এই অংশে মিউটেশন জমা হয়, বর্তমানের নানা জনের মধ্যে ডি-লুপের মিউটেশনের পরিমাণের পার্থক্যও বেশি স্পষ্ট হয়। আজকের নানা মানুষের থেকে কোষ নিয়ে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র, বিশেষ করে তার ডি-লুপের সিকোয়েন্সিং করলে তাদের মিউটেশনের মিল-অমিল দেখে অতীত সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব। আর একটি সুবিধা হলো ডি-লুপে মিউটেশন একেবারে লাগামছাড়া ভাবেও হয়না। মিউটেশন হারটি বেশ স্থিতিশীল– কয়েক প্রজন্মে কয়েকটির বেশি মিউটেশন ঘটেনা, হঠাৎ করে কখনো অনেক বেশি, কখনো অনেক কম এমনটি ঘটেনা।

রাশিয়ার জার ঃ সমাধির সমাধান

নিকট অতীতের ক্ষেত্রে ডি এন এ'র দ্বারা অতীত উদ্ঘাটন অপেক্ষাকৃত সহজতর। সাম্প্রতিক কালের এমনি একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো রাশিয়ার শেষ জারের (সম্রাটের) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেহাবশেষ সনাক্ত করে যথোপযুক্ত ভাবে সমাধিস্থ করার ঘটনা। রুশ বিপ্লবের গৃহযুদ্ধের সময় বন্দী জারকে সপরিবারে হত্যা করে অজ্ঞাত স্থানে একসঙ্গে কবরস্থ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯১ সালে রাশিয়ার উরাল অঞ্চলের একটি গণকবর থেকে কিছু মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয় যাকে জার, জারিনা (সম্রাজ্ঞী) এবং তাঁদের সন্তানদের বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু একে প্রমাণ করতে প্রয়োজন হলো ডিএনএ পরীক্ষার।

কঙ্কালগুলোর হাড় বিচ্ছিন্ন হয়ে ও পরস্পর মিশে গিয়ে ৮০০ টুকরা আলাদা হাড় হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। এগুলোকে খুবই বৈজ্ঞানিক যত্ন সহকারে জুড়ে জুড়ে ৬ জন পূর্ণপয়স্ক নারীপুরুষ ও ৩ জন কম বয়সীর কঙ্কাল খাড়া করা সম্ভব হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছিল যে এগুলো জার, জারিনা, তাঁদের তিন সন্তান, পারিবারিক ডাক্তার এবং ৩ জন গৃহকর্মীর। কিন্তু প্রয়োজন ছিল প্রমাণের।

ইতোমধ্যে দেহাবশেষের হাড় ও অন্যান্য অংশ থেকে ডি এন এ উদ্ধার করার এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। অনেক প্রাচীন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির ক্ষেত্রে এটি করার বিষয়টি আমরা পরে আর একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখবো। উল্লিখিত গণ কবরে পাওয়া বিভিন্ন কঙ্কালের হাড় থেকে ডিএনএ উদ্ধার করে তাতে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং করা হলো। পিতৃত্ব-

মাতৃত্ব নির্ণয় করার যে পদ্ধতি আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি সেভাবে দেখা গেল অল্প বয়সী তিন জন ওদের মধ্যে একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও একজন নারীর সন্তান। বাকিরা কেউ কারো নিকটাত্মীয় নন। এদিক থেকে অনুমানটি কিছুটা সত্য বলে মনে হলো। কিন্তু ঐ বাবা ও ঐ মা যে সত্যি জার ও জারিনা তার প্রমাণ কোথায়? সেটি না প্রমাণিত হলে তো ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়না।

এখানেই এগিয়ে এলো মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ – মাতৃ-ধারায় আত্মীয়তার ভিত্তিতে সনাক্তকরণের কাজে। মৃত্যুর প্রায় সত্তর বছর পর জার জারিনার নিজেদের ডি এন এ'র নমুনা কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা আর ছিল-না। কাজেই তাঁদের জীবিত মাতৃ-ধারার আত্মীয়দের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ এবং গণকবরে পাওয়া সম্ভাব্য কঙ্কালের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ এই উভয়ের সিকোয়েন্সিং করে দেখতে হবে তাদের মধ্যে নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক রয়েছে কিনা। এ কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন জারিনার বোনের দিক থেকে নিকটাত্মীয় বৃটেনের প্রিন্স ফিলিপ এবং জারের নানির দিক থেকে ডেনমার্কের কাউন্ট টুবেটস্কয়। মাতৃ-ধারাতেই তাঁরা জার অথবা জারিনার সঙ্গে সম্পর্কিত। জারিনার যিনি আত্মীয়, এ দম্পতির সন্তানদের সঙ্গেও (মাতৃ-ধারায়) তাঁর একই রকম সম্পর্ক থাকার কথা। কারণ মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ এই মাতৃ-ধারাতেই বংশের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। জারিনার আত্মীয় প্রিন্স ফিলিপের ঐ ডি এন এ'র ডি-লুপের অংশের (৫০০ বেইস মাত্র) সিকোয়েন্সিং করে দেখা গেল ইউরোপীয় মানুষের গড়পড়তা যেই রেফারেন্স সিকোয়েন্স রয়েছে তার থেকে সেটি দুটি জায়গায় পৃথক। আবার কথিত জারিনার ও তিন সন্তানের একই ডি এন এ অংশ সিকোয়েন্সিং করে দেখা গেছে যে এসব ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ দুটি জায়গাতেই এরা রেফারেন্স সিকোয়েন্স থেকে পৃথক। পরে ইতস্তত ৬০০০ জন ইউরোপীয়দের একই ডি এন এ পরীক্ষা করে তাদের কারো ক্ষেত্রেই রেফারেন্সের সঙ্গে এই দুটি জায়গার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। বেশ বুঝা গেল যে সম্ভাব্য আত্মীয়ের সঙ্গে এই মিলটি নেহাৎ কাকতলীয় হবার সম্ভাবনা সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে খুবই কম। মাতৃকূলের নিকটাত্মীয় বলেই তাঁদের মধ্যে এই মিল ঘটতে পেরেছে।

জারের মাতৃধারার আত্মীয় কাউন্টের অভীষ্ট ডি এন এ'তে দেখা গেল রেফারেন্সের সঙ্গে চারটি জায়গার অমিল, আর কথিত জারের কঙ্কালের অভীষ্ট ডি এন এ'তে এর মধ্যে তিনটি জায়গার অমিল একই রকমের – ইতস্তত ৬০০০জন ইউরোপীয়ের ক্ষেত্রে এই অমিল নাই। চতুর্থ অমিলটি কঙ্কালের ডি এন এ'তে খুঁজে না পাওয়াটি একটু ভাবিয়েছে বটে, কিন্তু পরে তার কারণটিও

বুঝা গেছে। কাউন্টের ডি এন এ'র চতুর্থ অমিলটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের মিউটেশনে সৃষ্ট, জারের দেহে এটি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার সময় পায়নি। এটি বুঝা গেছে কারণ জারের ডি এন এ'র অনেক কপি করার পর তার কোন কোন কপিতে এই চতুর্থ অমিলেরও আভাস পাওয়া গেছে। কাজেই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র কল্যাণে প্রায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ঐ গণকবরে জার, জারিনা এবং তাঁদের তিন সন্তানের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। পরে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় সম্মান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেন্টপীটার্সবার্গে তাঁদেরকে পুনঃসমাহিত করা হয়েছে।

পলিনেশিয়ানরা আদিতে কোথা থেকে এসেছিল?

প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে কোন মূল মহাদেশ থেকে বহু হাজার মাইল দূরে বিরাট জলরাশির ব্যাপ্তিতে যে সব দ্বীপ আর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে তাদের আদিবাসী পলিনোশিয়ানরা কোথা থেকে এসেছে সেটি একটি পুরানো বিতর্ক। এখানে রয়েছে তাহিতি, সামোয়া, টঙ্গা, ফিজি, ভানুয়াতু, হাওয়াই, সলোমন আইল্যাণ্ডস– প্রভৃতি। এসব জায়গার আদিবাসী বাসিন্দাদের চেহারা, দেহাবয়ব, ভাষা, কালচার ইত্যাদির বিবেচনায় তাদের সবাইকে মোটামুটি একই গোষ্ঠির মনে করা হয়। এই গোষ্ঠির আদি নিবাস সম্পর্কে দুটি প্রধান মত ছিল। একটির মতে তারা পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছে, অন্যটির মতে তারা এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য, ভাষা, পোষা প্রাণি ইত্যাদির দিক থেকে পূর্ব এশিয়া থেকে আসার মতটিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু আবার বাতাসের গতি, সমুদ্রের স্রোত ইত্যাদি বিবেচনা করলে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে সমুদ্র যাত্রাটি সে যুগে সহজতর হবার কথা। সেদিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসার তত্ত্বটিও যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা রাখে। এই শেষোক্ত তত্ত্বটি হাতে কলমে প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন নরওয়েজিয়ান অভিযাত্রী থর হেয়েরডাল, ১৯৪৭ সালে তাঁর বিখ্যাত কনটিকি অভিযানের মাধ্যমে। দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যাওয়া হালকা বালসাম গাছের একেবারে সাদামাটা ভেলা বানিয়ে (যার নাম দিয়েছিলেন 'কনটিকি') তিনি অনুকূল বায়ু আর স্রোতের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজেই ১০১ দিনে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে পলিনেশিয়ায় তুয়ামতু দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ৪,৩০০ মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে আদি যুগে একমাত্র এদিক থেকেই এমন সমুদ্র যাত্রা সম্ভব ছিল। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত অবশ্য এ নিয়ে বিতর্ক দূর হচ্ছিলনা। অবশেষে ডি এন এ'ই এর সুরাহা করে দিয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের একেবারের মাঝখানে থাকা কুক্স আইল্যাণ্ডের রোরোটোঙ্গার হাসপাতালে এ অঞ্চলের নানা জায়গার আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত রক্তের ২০টি নমুনা ছিল। এদের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র ডি-লুপের সিকোয়েন্সিং করে দেখা গেছে যে রেফারেন্স সিকোয়েন্সের সঙ্গে তুলনায় এগুলোর ১৯টি প্রায় হুবহু একই রকম। এদের মধ্যে ১৬টি তো একেবারেই হুবহু এক– রেফারেন্সের সঙ্গে চারটি বেইসে আলাদা যাদের বেইস নম্বর ১৮৯, ২১৭, ২৪৭ এবং ২৬১। বাকি তিনটিতে শুধু ২৪৭ নম্বর বেইসের অমিলটি নাই, বাকি তিনটি অমিল একই। বিশতম নমুনাটি অবশ্য একেবারেই আলাদা– বুঝা যায় সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারো কাছ থেকে এসেছে। এর থেকে মনে হয়েছে ১৯টি নমুনার সবই আদি পলিনেশিয়ানদের মাইটোকোন্ড্রিয়ার ডি এন এ বহন করছে। আজকের পলিনেশিয়া-নরা যে একই নৃত্বাত্ত্বিক গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত তা মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র এই ধরন থেকে বুঝা যাচ্ছে। এখন এদের সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমের বাসিন্দাদের একই ডি এন এ তুলনা করলে বুঝা যাবে তারা অতীতে কোন্ দিক থেকে এসেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা অঞ্চল থেকে নানা আদিবাসী মানুষের ঐ একই ডি এন এ'র সিকোয়েন্সিং করে দেখা গেছে তার অনেকগুলোতেই রেফারেন্সের সঙ্গে ১৮৯ ও ২১৭ এই দুই জায়গায় আলাদা– অর্থাৎ পলিনেশিয়ানদের সঙ্গে তাদের অন্তত এই দুটি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। তাছাড়া আরো একটি মিল দেখা গেল মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র রিং এ ডি-লুপের ঠিক বিপরীত জায়গায় ৯টি বেইস পলিনেশিয়ানদের ক্ষেত্রেও নাই, আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যেও নাই।

অন্যদিকে রোরোটঙ্গার পশ্চিমের এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১৮৯ ও ২১৭তে অমিল হওয়ার ব্যাপারটি এবং ৯টি বেইস না থাকার ব্যাপারটি সেখানেও একই, তবে ক্রমে এর প্রবণতা বোর্ণিও, ফিলিপাইন এসব জায়গায় পশ্চিম দিকে কমে গিয়ে গিয়ে তাইওয়ানেও তার অল্প কিছু মাত্র হদিস পাওয়া যাচ্ছে। রোরাটঙ্গায় ১৯টির মধ্যে ১৬টি নমুনার ১৮৯, ২১৭, ২৪৭, ২৬১তে রেফারেন্সের সঙ্গে অমিল থাকলেও তিনটিতে ২৪৭ এর অমিলটি ছিলনা। এখানে ২৪৭ এর এই ব্যতিক্রমটি অপেক্ষাকৃত কম (১৯টিতে ৩টি)। কিন্তু যতই পশ্চিমে আসতে থাকি এই ব্যতিক্রমের অনুপাতটি ততই বাড়তে থাকে অর্থাৎ ২৪৭ এর অমিল খুঁজে না পাওয়ার ব্যাপারটি বাড়ে। আর একেবারে তাইওয়ানে এসে দেখা যায় ২৪৭ এর অমিল আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছেনা।

স্পষ্টত ১৮৯ ও ২১৭ এর অমিলটি এবং ডি-লুপের বিপরীতে ৯টি বেইস না থাকাই পলিনেশিয়ানদের আদি পূর্বসূরিদের সাধারণ বৈশিষ্ট, আর পলিনেশিয়া থেকে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত এই বৈশিষ্টের ঐক্য অথচ পূর্ব এশিয়ার দিকে তা কমে যাওয়া দেখে, এবং অন্য বৈশিষ্টের ক্রমে পশ্চিম থেকে পূর্বে বাড়তে দেখে (২৪৭ এর অমিল) মনে হচ্ছে পলিনেশিয়ানরা পূর্ব এশিয়া থেকেই গিয়েছিল।

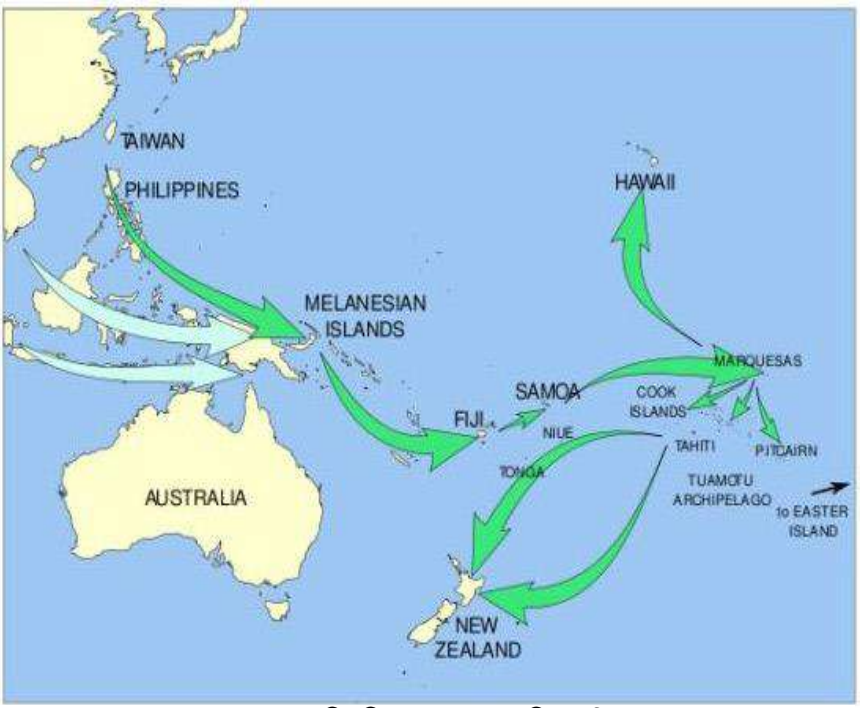

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে অতীত অভিবাসন

১৮৯, ২১৭ ও ডি-লুপের ব্যাপারগুলো এখানে একেবারে পশ্চিমে তাইওয়ানে অংশত কিছু কিছু মানুষের ছিল (এখনো যেমন আছে)। সেখান থেকে অল্প কিছু মানুষ যারা দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অভিবাসী হয়েছে তাদের অধিকাংশের মধ্যে (অথবা সবার মধ্যে) এগুলো ছিল। ফলে ঐ অল্প ক'জন মানুষের বংশধর হিসাবে এ সব জায়গার আজকের মানুষে এগুলোর প্রবণতা বেশি। সেখান থেকেই যাওয়া বলেই আজকের পলিনেশিয়ানদের মধ্যে প্রায় সবারই এগুলো রয়েছে। ২৪৭ এর অমিলটি পরে পলিনেশিয়ানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, পূর্ব এশিয়া থেকে মানুষের পূর্ব অভিমুখে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাওয়ার পথে যা হয়েছে। তাহলে অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ১৮৯ ও ২১৭ এর

অমিল, এবং নয়টি বেইস না থাকা, অর্থাৎ পলিনেশিয়ানদের কিছু আদি বৈশিষ্ট খুঁজে পাওয়ার কারণ কী? স্পষ্টত এর কারণ হলো ঐ পূর্ব এশিয়া থেকেই মানুষ আরো প্রাচীন কালে শুকিয়ে যাওয়া বেরিং প্রণালী পার হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল। যারা গিয়েছিল তারা অধিকাংশ এই দুই বৈশিষ্ট বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। যেহেতু ২৪৭ এর অমিলটি সেখানে ছিলনা তাই এটি আজকের আমেরিকানদের মধ্যেও নাই– যদিও পলিনোশিয়ায় এবং তার পশ্চিমের জায়গাগুলোতে আছে, যতই পূর্ব দিকে পলিনেশিয়ার দিকে গেছে ততই বেশি সংখ্যায় আছে। এতে বুঝা যায় নয়টি বেইস না থাকা এবং ১৮৯ ও ২১৭ এর অমিল এসব পলিনোশিয়ানরা তাদের পূর্বসূরি পূর্ব এশীয়দের থেকে পেলেও ২৪৭ এর অমিলটি পরবর্তীতে অভিবাসনের পথে সৃষ্ট পলিনেশিয়ানদের নিজস্ব বৈশিষ্ট। আর এটি আমেরিকাতে একেবারে না থাকাটিও সেখান থেকে মানুষের পলিনেশিয়া যাওয়ার তত্ত্বটিকে খুবই দুর্বল করে দিয়েছে।

এভাবে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র বিশ্লেষণ এখন প্রায় নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করেছে যে পলিনেশিয়ানরা পূর্ব এশিয়া থেকেই গিয়েছে। শুধু তাই নয় আরো বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে এখন বুঝা যাচ্ছে পূর্ব এশিয়া (তাইওয়ান অঞ্চল) থেকে মানুষ ক্রমান্বয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে গিয়ে প্রশান্ত মধ্যসাগরীয় এই বিস্তীর্ণ এলাকার দ্বীপপুঞ্জগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অভিবাসন ঘটেছে এখন থেকে ৬/৭ হাজার বছর আগে শুরু হয়ে হাজার খানেক বছর আগে পর্যন্ত। আর ঐ পূর্ব এশিয়া থেকেই মানুষ প্রথম আমেরিকায় গিয়েছিল তার অনেক আগে এখন হতে ১২/১৩ হাজার বছর আগে।

পলিনেশিয়ান মানুষদের একই পৃথক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি হিসাবে পরিচয় পেতে দেখেছি তার মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'তে সুনির্দিষ্ট 'স্বাক্ষর' (মার্কার) দেখে। এভাবে নানা গোষ্ঠির ডি এন এ স্বাক্ষর এখন চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলে ডি এন এ থেকেই কারো এরকম গোষ্ঠিগত পরিচয় আন্দাজ করা আজকাল সম্ভব হচ্ছে– যা কখনো কখনো বেশ কাজে লেগে যায়। ২০০৪ সালে স্পেনের মাদ্রিদে ট্রেনে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছিলো। প্রথমে মনে করা হয়েছিলো যে স্থানীয় বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই এর জন্য দায়ী। গোয়েন্দা অনুসন্ধানে বোমা হামলাকারীরা হামলার আগে যে পরিত্যক্ত ফ্ল্যাটবাড়িতে ছিল তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে সাম্প্রতিক ব্যবহৃত যে টুথ ব্রাশ পাওয়া গিয়েছে তার থেকে ডি এন এ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে সেই ডি এন এ বাস্ক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির নয়, এমনকি ইউরোপীয় কোন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠিরই নয়– বরং উত্তর আফ্রিকান নৃতাত্ত্বিক

গোষ্ঠির। পরে যখন অপরাধী ধরা পড়েছে তখন দেখা গেছে যে আসলেই তারা আলজেরীয় বংশোদ্ভূত।

উন্মেষ স্থান আফ্রিকা থেকে মানুষের অভিবাসন

আজকের নানা পলিনেশীয়দের ডি এন এ বিশ্লেষণ করে যেমন নিশ্চিত হওয়া গেছে যে আদিতে তারা পূর্ব এশিয়ার তাইওয়ান অঞ্চল থেকে এসেছে, তেমনি আজকের সারা পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির মানুষের ডি এন এ বিশ্লেষণ তাদের সবার সাধারণ পূর্বসূরির যে আদি নিবাসের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করছে তা হলো আফ্রিকা, আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে পূর্ব আফ্রিকা। অবশ্য প্রাচীন মানুষের ফসিল গবেষণায় এটি অনেক আগে থেকেই বুঝা যাচ্ছিল। ডি এন এ বিজ্ঞান তা অকাট্য-ভাবে নিশ্চিত করেছে।

এক্ষেত্রেও প্রাথমিক অবদান এসেছে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র সিকোয়েন্সিং থেকে। অর্থাৎ মাতৃ-ধারায় এসে আজকের নানা মানুষের এই ডি এন এ'তে মিউটেশন ইতস্তত জমে জমে পরস্পর কী পরিমাণ ব্যবধান জমা হয়েছে তার থেকে। কত বছর আগে বা কত প্রজন্ম আগে আজকের সব মানুষের সাধারণ পূর্বসূরির উন্মেষ হচ্ছিল তা জানতে হলে গড়পড়তা কী হারে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র ডি-লুপে মিউটেশন সৃষ্টি হয় সেটি জানা থাকা চাই। এটি এত ধীরে হাজার হাজার বছর ধরে ঘটে যে এই হার সরাসরি জানা সম্ভব নয়। তবে ফসিল গবেষণা থেকে জীবতাত্ত্বিক ভাবে কাছাকাছি আজকের দুটি প্রাণির সাধারণ পূর্বপুরুষের কাল যদি জানা থাকে, তাহলে এই দুইয়ের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'তে পার্থক্য থেকে মিউটেশনের এই হার জানা সম্ভব। এই পার্থক্য থেকে বুঝা যাবে যে ঐ কালের মধ্যে কতগুলো মিউটেশন সৃষ্টি হয়েছে। তা হলে একটি মিউটেশন সৃষ্টি হতে কত বছর লেগেছে (হার) তাও জানা যায়। এশীয় এইপ্ ওরাং ওটাং এবং আফ্রিকান এইপ্ শিম্পাঞ্জির সাধারণ পূর্বপুরুষের কাল ফসিল গবেষণায় মোটামুটি জানা রয়েছে। আজকের শিম্পাঞ্জি এবং আজকের ওরাং ওটাং এর মধ্যে গড়পড়তা মিউটেশন সংখ্যার পার্থক্যের সঙ্গে এই কাল মিলিয়ে তার থেকে মিউটেশন হারের একটি হিসাব পাওয়া সম্ভব। আবার মানুষের ক্ষেত্রে আমরা ফসিল ও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে জানি ১২০০০ বছর আগে পূর্ব এশিয়া থেকে মানুষ শুকিয়ে যাওয়া বেরিং প্রণালী হয়ে আমেরিকা গিয়েছে, তারপর সমুদ্রতল উঁচু হওয়াতে সেই স্থলসেতু আর থাকেনি। ঐ সময় আমেরিকায় আসার পরের হাজার হাজার বছরে আমেরিকায় ঐ মূল অভিবাসী মানুষরাই নানা নৃ-গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে গেছে।

এখন তাদের মধ্যে জমা মিউটেশনের পার্থক্য থেকেও মিউটেশনের হারটি আন্দাজ করা সম্ভব। এসব থেকে মোটামুটি জানা গেছে যে গড়পড়তা ২০ হাজার বছরে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি-লুপে একটি নূতন মিউটেশন দেখা দেয়। অর্থাৎ আজকের দুজনের এই ডি এন এ'তে যদি একটি মিউটেশনের পার্থক্য দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে যে তাদের সাধারণ পূর্বসূরি আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত যে কোন সময় বাস করছিল। আর দুটি মিউটেশন হলে ২০ হাজার থেকে ১০ হাজার বছর আগের সময়ের মধ্যে বাস করছিল। মিউটেশনের এই হারটির উপর ভিত্তি করে অতীত উদ্ঘাটনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় আণবিক ঘড়ি– ডি এন এ'র আণবিক পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে বলেই এই নাম।

পৃথিবীর নানা জায়গার নানা গোষ্ঠির মানুষ থেকে ডি এন এ সংগ্রহ করে এবং তাদের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র ডি-লুপে সিকোয়েন্সিং করে দেখা যাচ্ছে যে তাদের সবার মাতৃ-পূর্বসূরি আফ্রিকায় ছিল আজ থেকে দেড় লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ বছর আগের মধ্যে। একে আরো সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টায় মাঝামাঝি বলা যায় প্রায় ১৯০ হাজার বছরের মত আগে। পরবর্তীতে কিছুটা ভিন্ন উন্নততর ডি এন এ গবেষণায় এই সময়টি নির্ধারিত হয়েছে ১৪৩ হাজার বছরে– যার সম্ভাব্য পরীক্ষাগত ভুল ১০ হাজার বছর কমবেশির মধ্যে থাকার কথা। ফসিল গবেষণায় এর যে সময় নির্দেশ করে তার সঙ্গে এটি প্রায় মিলে যায়। বলা যায় এটিই প্রজাতি হিসাবে আজকের মানুষ হোমো সেপিয়েন্সের বয়স। তাদের উন্মেষ যে আফ্রিকায় হয়েছিল তাও বুঝা গেছে নানা জায়গায় মানুষের মধ্যে মিউটেশনের বিস্তার দেখে। আফ্রিকায় পরস্পরের কাছাকাছি বাস করা মানুষের মধ্যেও মিউটেশন বৈচিত্র অনেক বেশি, কারণ সেখানকার অনেক মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ বাস করতো সুদূর অতীতে, মানুষের উন্মেষ কালে। অথচ এশিয়া বা ইউরোপে বা অন্যত্র সব মানুষই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের অল্প কিছু মানুষের বংশধর যারা আফ্রিকা থেকে এসেছিল। তাদের কম মিউটেশন বৈচিত্র থেকেই তা বুঝা যায়। মাতৃ-ধারা দিয়ে হিসেবটা করা হয়েছে বলে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ যেটি বলতে পারছে তা হলো আজকের কাল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মাতৃ-ধারা বজায় রাখতে পেরেছে মানুষের এমন সাধারণ স্ত্রী পূর্বসূরির বসবাস ছিল আজ থেকে ঐ রকম সময় আগে আফ্রিকায়। এভাবেই 'আফ্রিকান ইভ' বা আফ্রিকান আদি মাতার ধারণাটি ডি এন এ বিজ্ঞান এনেছে। স্পষ্টত এর পরবর্তী এক সময় আফ্রিকা থেকে মানুষ অন্যান্য মহাদেশে গেছে।

ডি এন এ গবেষণায় ও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে মনে হচ্ছে আফ্রিকা থেকে এই অভিবাসন প্রথম ঘটেছে আজ থেকে ৭০/৮০ হাজার বছর আগে।

পিতৃ-ধারায়ও অতীত অনুসন্ধান সম্ভব

আমরা দেখেছি অতীত অনুসন্ধানের জন্য ক্রোমোজোমে অবস্থিত মূল ডি এন এ ব্যবহার না করে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ ব্যবহারের কারণ হলো যাতে করে যৌন প্রজননের ফলে বাবা মা উভয়ের ডি এন এ'র প্রভাবটি এড়ানো যায়। শুধু মাতৃ-ধারার বংশ পরম্পরায়ে যায় বলে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'তে সে সমস্যা নাই। পরে দেখা গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে পিতৃ-ধারায়ও এরকম সুযোগ রয়েছে। সন্তান তার লিঙ্গ নির্ধারণী Y ক্রোমোজোমটি পেতে পারে শুধু বাবা থেকে এবং পুত্র-সন্তান হওয়াটি এটি পাওয়ার উপরেই নির্ভর করে। কাজে Y ক্রোমোজোমটি বাবা থেকে ছেলে, তারপর তার ছেলে, এমনি ভাবেই সঞ্চারিত হয়। আজকের নানা মানুষের Y ক্রোমোজোমের ডি এন এ'র সিকোয়েন্সিং করেও আমরা অতীত অনুস-ন্ধান করতে পারি, কারণ এটি শুধু পিতৃ-ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। আজকের নানা মানুষের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র মিল-অমিল দেখে যেভাবে আমরা তাদের সবার সাধারণ পূর্বসূরিকে আফ্রিকান আদি মাতা হিসাবে পেয়েছি, Y ক্রোমোজোম বিশ্লেষণ করেও সে রকম গবেষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে সাধারণ পুরুষ পূর্বসূরির বসবাস আফ্রিকাকেই নির্দেশ করছে– এবং সেই 'আফ্রিকান আদি পিতার' সময় নির্ধারিত হচ্ছে ১৪৪ হাজার বছর যা ১০ হাজার বছর কমবেশি হতে পারে। আফ্রিকান আদি মাতার মতই এটি কোন সুনির্দিষ্ট প্রারম্ভ বুঝাচ্ছেনা– বরং বলা হচ্ছে যে সর্ব প্রাচীন ঐ মানুষ থেকেই প্রথম ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন মাতৃ-ধারা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন পিতৃ-ধারা এখন অবধি বজায় রয়েছে। এর কিছু আগেও নিশ্চয়ই কিছু কিছু মানুষ ছিল যাদের ধারা নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে আজকে পর্যন্ত আসেনি। আর একেবারে শুরুতে কোন মহিলার কন্যা সন্তান না হলে বা কোন পুরুষের পুত্র সন্তান না থাকলে তাদের মাতৃ বা পিতৃ ধারা তো আজ পর্যন্ত পৌঁছার কথা নয়। তা সত্ত্বেও এই গবেষণা আগে থেকে ফসিল গবেষণা ইত্যাদি থেকে আন্দাজ করা সেই তত্ত্বকেই জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে প্রজাতি হিসাবে মানুষের বয়স দেড় লক্ষ বছরের কোঠায়।

সদৃশ প্রাণিদের থেকে আমাদের পৃথক যাত্রার কাল

আণবিক ঘড়ির এই ব্যবহার কিন্তু শুধু আজকের মানুষের উন্মেষ কালে গিয়েই শেষ হয়ে যায়না। এমনকি আরো আগে মানব-সদৃশদের আফ্রিকান এইপ্ পূর্বসূরিরা তাদের পৃথক মানব-যাত্রা কখন শুরলো তার কাল নির্ণয়ে, কিংবা তারো আগে আফ্রিকান এইপ্রা যখন এশীয় এইপ্দের থেকে পৃথক যাত্রা শুরু করেছিলো (অর্থাৎ শিম্পাঞ্জি-গরিলাদের পূর্বসুরিরা ওরাংওটাং এর পূর্বসূরিদের থেকে আলাদা হয়েছিলো), এমনিতরো সব কালের হদিশ পেতে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ এই সব ক্ষেত্রে তাদের উত্তরসূরিরা এখনো বর্তমান এবং তাদের থেকে ডি এন এ সংগ্রহ করা যায়। এরকম গবেষণা থেকেই আমরা এখন যথেষ্ট নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে

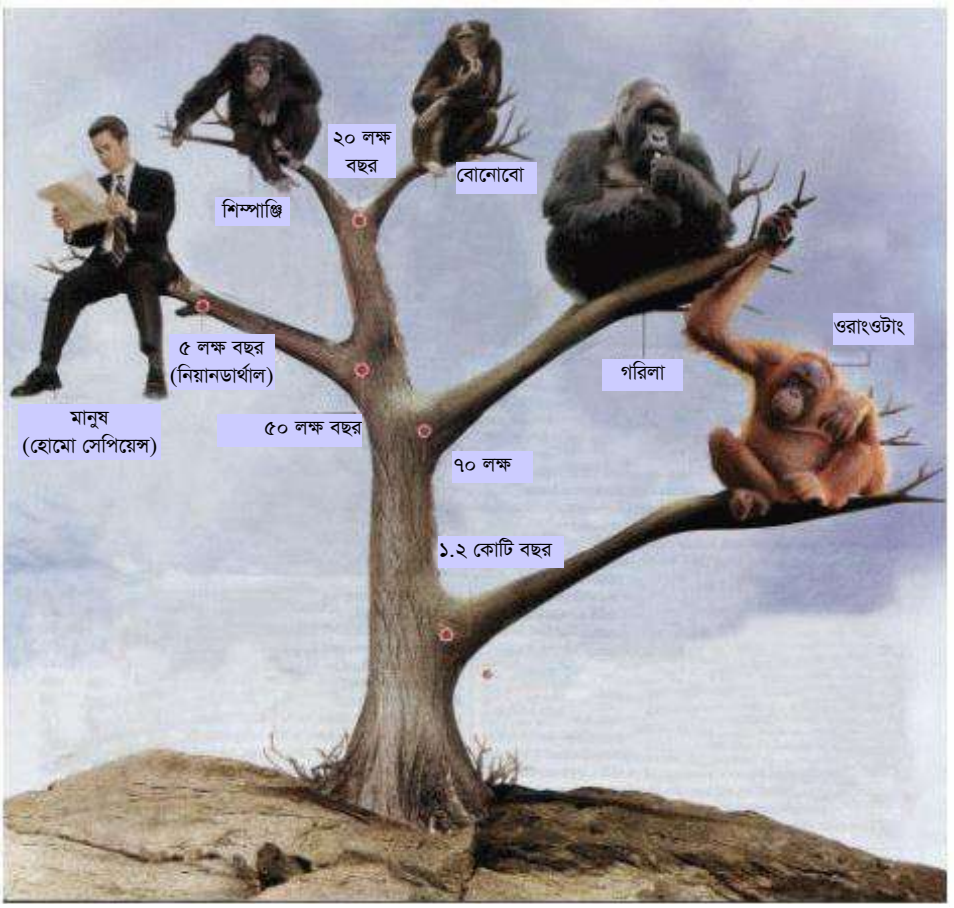

ডিএনএর আণবিক ঘড়ি দিয়ে মাপা বিচ্ছিন্নতার কাল

পারছি যে বিবর্তনের যাত্রায় আমাদের ধারাটি (যে ধারায় তখনো শিম্পাঞ্জি ও গরিলার পূর্বসূরিরা অন্তর্ভূক্ত) ওরাংওটাং এর ধারা থেকে পৃথক হয়েছে প্রায় ১.২ কোটি বছর আগে। আমাদের ধারাটি (যে ধারায় তখনো শিম্পাঞ্জির পূর্বসূরিরা অন্তর্ভূক্ত) গরিলার ধারা থেকে পৃথক হয়েছিল প্রায় ৭০ লক্ষ বছর আগে। আর আমাদের ধারাটি শিম্পাঞ্জির ধারার থেকে পৃথক হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে। তারপর আমাদের ধারাটি নিয়ানডার্থাল মানুষদের ধারার সঙ্গে পৃথক হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থালরা অবশ্য এখন আর নাই, কিন্তু ত্রিশ হাজার বছর আগেও তারা ছিল। সে সময়ের নিয়ানডার্থাল হাড় যথেষ্ট খুঁজে পাওয়া গেছে যার থেকে ব্যবহারযোগ্য ডি এন এ নিষ্কাশন সম্ভব হয়েছে। তাই আণবিক ঘড়ি এ ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। নিয়ানডার্থালরা পৃথক হবার পর আরো বিভিন্ন মানব ধারা থেকে আমাদের ধারা পৃথক হয়েছে, সে সব ধারার কেউও এখন আর অবশিষ্ট নাই। অবশেষে প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে আমাদের ধারায় হোমো সেপিয়েন্স মানুষ হিসেবে আমাদের প্রজাতিটি আত্মপ্রকাশ করেছে। যেই হোমো সেপিয়েন্স তখন দেখা দিয়েছিল, আজও আমরা তারাই আছি। আমাদের ঐ আত্মপ্রকাশের পরও বহুদিন অবশ্য অন্যান্য প্রজাতির কিছু মানব ধারা পাশাপাশি ছিল– পরে বিলুপ্ত হয়েছে।

মানুষের জেনেটিক বিস্তার ও ভাষাগত বিস্তার

বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির কিছু নিজস্ব জেনেটিক 'স্বাক্ষর' (মার্কার) থাকে তা আমরা দেখেছি। আজ যারা কয়েকটি ভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত তারা অতীতে একই গোষ্ঠিতে ছিল, পরে বিভিন্ন ধারায় বিস্তৃত হয়েছে। তার প্রত্যেকটিতে মূল গোষ্ঠির ডি এন এ স্বাক্ষর তো থাকেই নিজ নিজ নূতন স্বাক্ষরও সৃষ্টি হয়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে এদের মৌলিক জেনেটিক গুণে খুব বড় রকমের তফাৎ সৃষ্টি হয়েছে গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে। ডি এন এ'তে ঐ স্বাক্ষর বা মার্কারগুলো তাদের জীবতাত্ত্বিক আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন সাধারণত হয়না, বড় জোর কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট দিয়ে থাকে এক একটি গোষ্ঠিকে– যেমন চেহারা, চুল, গায়ের রঙ ইত্যাদি। বরং আভ্যন্ত-রীণ গুণাগুণ বা আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী বৈশিষ্টগুলোর যত রকম বৈচিত্র একই গোষ্ঠির ভেতরে দেখা যায়, গড়পড়তা এক গোষ্ঠির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠির পার্থক্য সে তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে নানা মানব গোষ্ঠিতে ভাষার বৈচিত্র সৃষ্টি যে ভাবে বিস্তৃত হয়েছে তার জেনেটিক বিস্তারের সঙ্গে তার একটি সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও ভাষার বৈচিত্রের জন্য জেনেটিক বৈশিষ্ট দায়ী নয় তবুও এই সাদৃশ্যটি

বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠিগুলোর সঙ্গে পারসিক ও উত্তর ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠিগুলোর বেশ মিল রয়েছে অন্তত শব্দ ভাণ্ডারের দিক থেকে। প্রথমগুলো প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে, আর

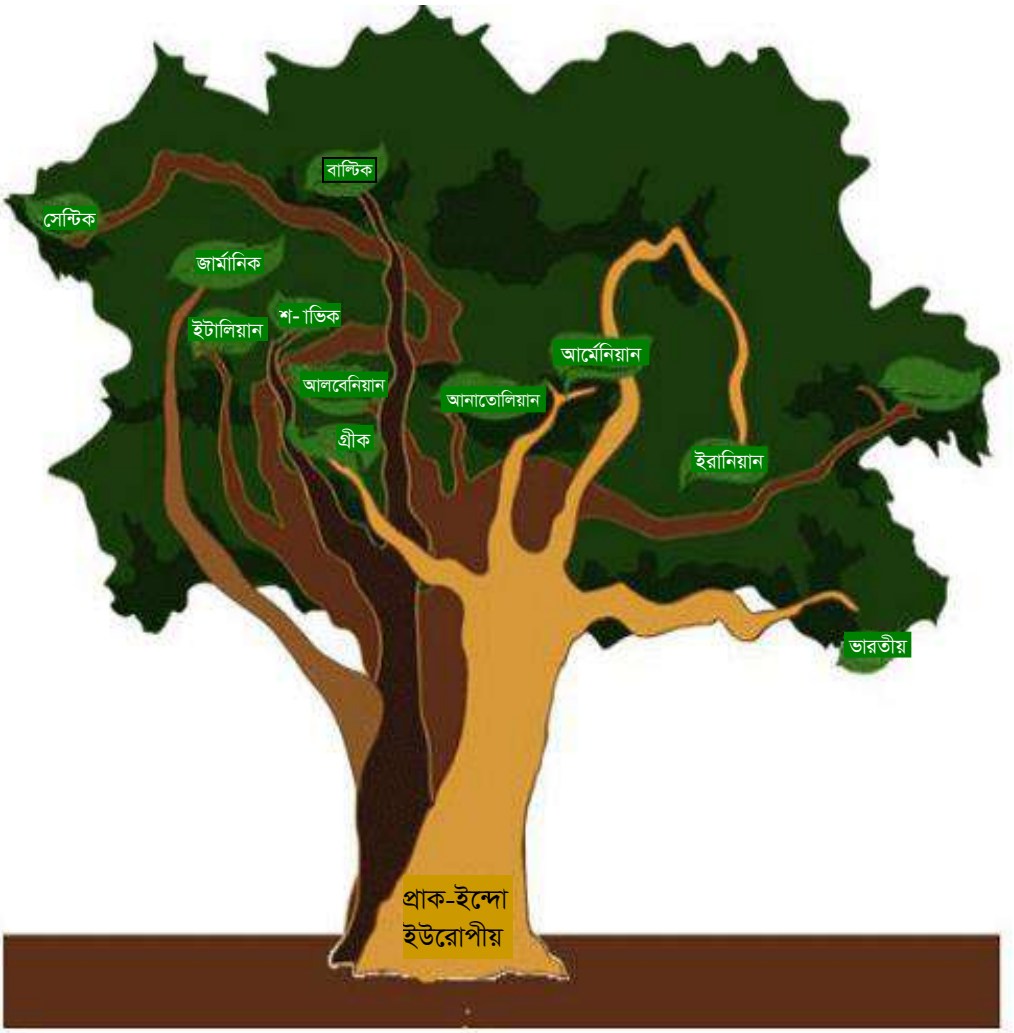

ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা বৃক্ষ

শেষেরগুলো এসেছে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বা তার পূর্ব সংস্করণ থেকে। উভয়েই আবার এসেছে আরো প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়ান শিকড় থেকে। এরা সবাই আসলে ইন্দো-ইউরোপীয়ান মূল ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। এর শাখাগুলোরও

আবার নানা শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ইউরোপীয় শাখা থেকে ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ এসব ল্যাটিন শাখার; জার্মান, ইংরাজী, সুইডিশ ইত্যাদি জার্মানিক শাখার; রাশিয়ান, সার্বোক্রোয়াট, বুলগেরিয়ান ইত্যাদি স্লাভোনিক শাখার। আবার ভারতীয় শাখা থেকে পশ্চিম ভারতীয় (মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দি ইত্যাদি) এবং পূর্ব ভারতীয় (বাংলা, মৈথিলী, অহোমিয়া ইত্যাদি)। প্রায় ৮ হাজার বছর আগে একই জায়গা থেকে (খুব সম্ভব ককেশাস অঞ্চলে) একটি জনগোষ্ঠি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের আদি রূপে কথা বলতো। ওদের এক শাখা ইউরোপে, এক শাখা স্য, আর এক শাখা ভারতে অভিবাসী হয়ে ভাষার নানা রূপ এসব জায়গায় সৃষ্টি করেছে।

ইন্দো-ইউরোপীয়ানের মত আরো অন্যান্য ভাষা পরিবারের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া খুঁজে পাওয়া যায়– যেমন চীন-বার্মা অঞ্চলে সিনোটিবেটান, দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়িয়ান, উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় নাইলো-সাহারান, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ায় আলতাইক ইত্যাদি। দুনিয়ার সব জাতিগোষ্ঠিকে যেমন শাখা প্রশাখা নিয়ে বৃক্ষের মত সাজানো যায়, ভাষাগোষ্ঠিগুলোকেও সাজালে প্রায় সে রকমই আরেকটি বৃক্ষ পাওয়া যায়। প্রথমটির নিয়ামক ডি এন এ, দ্বিতীয়টির ভাষা। প্রথমটি বিস্তৃত হয় সন্তানের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বহু হাজার বছর ধরে। ভাষার ক্ষেত্রে বিস্তৃত হবার হারটি আরো দ্রুত হলেও নানা অঞ্চলে বিস্তৃতির জন্য উভয়েই নির্ভর করে অভিবাসন উপর। একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি নানা ভৌগলিক ও অন্যান্য কারণে পরস্পর থেকে জেনেটিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। একই ভাবে বিচ্ছিন্নতা ভাষার দিক থেকেও দেখা দিতে পারে, যদিও সেটি অপেক্ষাকৃত দ্রুততর ভাবে সৃষ্টি হতে পারে। এরকম বিচ্ছিন্নতা পার্থক্য ও বৈচিত্র সৃষ্টি করে– জেনেটিক ক্ষেত্রেও, ভাষার ক্ষেত্রেও। এভাবেই মূলত একই অঞ্চল ও গোষ্ঠি থেকে এসেও পরে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে ইউরোপিয়রা, পারসিকরা ও উত্তর ভারতীয়রা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের মূল ইন্দো-ইউরোপীয় একই ভাষা এত রকম ভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে।

মিলগুলো যেমন বেশ স্পষ্ট, জেনেটিক ও ভাষা বৈচিত্রের মধ্যে বেশ কিছু অমিলও লক্ষ্যণীয়। জেনেটিক মিশ্রণের প্রবণতাটি খুব জোরালো। পরস্পরের ভাষা গ্রহণ না করেও দুটি গোষ্ঠির মধ্যে অতীতে প্রচুর যৌন মিশ্রণ ঘটেছে। তবে অন্যান্য কারণে খুবই স্বল্প সময়ে এক ভাষা অন্য ভাষার স্থান দখল করতে পারে, যেমন রাজনৈতিক কারণে, দখলদারিত্বের কারণে ইত্যাদি। কিন্তু জেনেটিক ক্ষেত্রে সেটি এত দ্রুত হতে পারেনা।

অভিবাসনের বিষয়টি ডি এন এ ও ভাষার মধ্যে দিয়ে যেমন বুঝা যায়, তেমনি প্রযুক্তি ও কালচারের মধ্যেও তা স্পষ্ট হয়। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়রা ৮ হাজার বছর আগে নূতন প্রযুক্তি কৃষিকে গ্রহণ করেছিলো– এবং সেটি তারা ইউরোপে, পারস্যে, ভারতে নিয়ে গেছে ভাষার সঙ্গে। মধ্য এশিয়ার ষ্টেপ ও মরু অঞ্চলেই আলতাইক ভাষা পরিবারের উৎপত্তি, সেখানকার মানুষ ঘোড়া চালনায় পারদর্শি হয়েছিল যেই বিদ্যা তারা তুরস্ক, তুর্কমেনিস্থান ও মধ্য এশীয় দেশগুলোতে নিয়ে গেছে। খুব সম্ভব উত্তর রাশিয়া আর একটি ভাষা পরিবার উরালিকের উৎসস্থল। সেখানকার মানুষ বল্গা হরিণ ধরনের জন্তুর পাল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। আজকের অন্যান্য উরালিক ভাষা গোষ্ঠির অঞ্চল ফিনল্যাণ্ড, এষ্টোনিয়া, রাশিয়ায় এই প্রযুক্তি ছড়িয়েছে। মনে করা হয় প্রায় ১৫ হাজার বছর আগে ইন্দো-ইউরোপীয়ান, আলতাইক, ও উরালিক এই তিন গোষ্ঠির মানুষও আসলে একই গোষ্ঠি ছিল একই জায়গায়। আর তারা ছিল মূলত শিকারি-সংগ্রাহক অন্য সব প্রাচীন মানুষের মত। তাদের ভাষা ছিল ঐ তিন ভাষা পরিবারের সব ক'টার একই আদি উৎস। এরাই পরে ভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভিন্ন প্রযুক্তি নিয়েছে, তিনটি ভিন্ন ভাষা পরিবার সৃষ্টি করেছে, যা কিনা একই মহা-ভাষা পরিবারের অংশ।

পরিবারে জিনের অনুসরণ

পরিবারের মধ্যে অনুসরণ কেন?

নানা মানুষের মধ্যে, অন্যান্য সব জীবের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে ডি এন এ'র যে ব্যতিক্রমী বৈচিত্রগুলো থাকে তা সন্তানের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয়। তাই কারো কোন বিশেষ বৈশিষ্ট যখন আমরা তার পরিবারে অন্য কোন কোন সদস্যের মধ্যেও দেখি তখন ডি এন এ'র কোন্ জিন সেটি বহন করছে তা জানার একটি সুবিধা হয়। এটি উদ্ঘাটন করা যায় পরিবারের ঐ সদস্যদের মধ্যে কোন্ ব্যতিক্রমী জিন (ডি এন এ'র অল্প কিছু অংশের সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স) একই রয়েছে তা জানার মাধ্য-মে। বিশেষ করে বিভিন্ন সন্তানদের যার যার মধ্যে বাবা বা মা'র ব্যতিক্রমী কোন বৈশিষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে জিনের অনুসন্ধানটি খুব ফলপ্রসূ। এটি খুব স্পষ্ট ও জরুরী হয়ে উঠে বংশগত রোগের জিন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে।

এ পর্যন্ত ডি এন এ'র যে ব্যবহারগুলো আমরা দেখেছি সেখানে কোন্ কোন্ ডি এন এ (জিন) কোন্ বৈশিষ্ট নির্ধারণ করে সেই প্রশ্ন আমাদেরকে তুলতে হয়নি। অর্থাৎ ডি এন এ'র ভাষার অর্থ বুঝার কোন দায় সেখানে আমাদের ছিলনা। ব্যক্তি সনাক্ত করা, পিতৃত্ব নির্ণয় করা, অতীতকে অনুসন্ধান করা এ সব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় আমরা ডি এন এ'র এমন সব অংশ ব্যবহার করেছি যার কোন অর্থই নাই– এরা বেকার ডি এন এ, কোন বৈশিষ্টের কোডিং বহন করেনা। সেগুলোর বেইসের সিকোয়েন্সিং করে তার বেইস পরম্পরায় আমরা পাঠ করলেও তা অর্থ বুঝার জন্য ছিলনা, ছিল মিল-অমিল নির্ধারণ করার জন্য।

কিন্তু ডি এন এ বিজ্ঞানের আসল বড় কাজ হলো এর জিনগুলোর অর্থ বুঝা, কোন্ জিন কোন্ বৈশিষ্টের জন্য দায়ী তা নির্ণয় করা। পরিবারের মধ্যে জিনের অনুসরণ এ কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যতিক্রমী বৈশিষ্টের উপস্থিতির সঙ্গে ব্যতিক্রমী জিনের উপস্থিতি একই সঙ্গে রয়েছে কিনা, পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হচ্ছে কিনা, এসব দেখেই একটি জিনের সঙ্গে একটি বৈশিষ্টের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারি, অর্থাৎ জিনটির অর্থ বের করতে পারি।

অনুসরণের সহজতর উপায়: ফিঙ্গার প্রিন্টিংএর জন্য মার্কার

ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং আমরা ব্যক্তি সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার হতে দেখেছি। সেক্ষেত্রে আমরা বার বার একই বেইসক্রম পুনরাবৃত্তি হয় ডি এন এ'র

ঐ ভি এন টি- আর অংশগুলো ব্যবহার করি। তা না করে আমরা যদি যেই জিনটির অনুসরণ করতে চাই, ডি এন এ'র সেরকম বেইসক্রমকে লক্ষ্য করেই ফিঙ্গার প্রিন্টিং করি তাহলে একই ধরনের পদ্ধতি তাকে খুঁজে নেবার কাজে লাগবে। ব্যতিক্রমী বৈশিষ্টটির জন্য দায়ী মূল জিনটিকে এখনো আমরা বিস্তারিত না জানতে পারি। কিন্তু ঐ জিনটি যেখানে আছে তার খুব কাছে ধারে সব সময় থাকে এমন কোন মার্কার (চিহ্ন) উদ্ঘাটন করতে পারলেই মূল জিনটিকেও অনুসরণের সুবিধা হয়ে যায়। এ যেন পণ্যের সঙ্গে লেবেলের মত। লেবেল দেখে বুঝি এখানে পণ্য আছে। মার্কার নিজেও ছোট একটি ডি এন এ অংশ, সাধারণত অর্থবিহীন বেকার জিন। মূল জিনটির খুব কাছাকাছি তার অবস্থান হতে হয়, ফলে সন্তানের কাছে যাবার আগে জনন কোষে ডি এন এ'র নানা ইতস্তত ভাঙ্গাভাঙ্গির সময়ও এই মার্কার মূল জিনটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। মার্কার সাধারণত সহজে সনাক্তকরণযোগ্য একটি মিউটেশন হয় বলে মার্কার এর উপস্থিতি নির্ণয় করে জিনটি চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। তা ছাড়া মার্কারের আর একটি গুণ থাকতে হয় সেটি হলো ডি এন এ'র এই অংশের অধিক বৈচিত্র। নানা বৈচিত্রে থাকা সম্ভব হলেই প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রূপের মার্কারটি স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ডি এন এ'র কী ধরনের মিউটেশন মার্কার হবার যোগ্যতা রাখে? ব্যক্তি সনাক্ত করার বা পিতৃত্ব নির্ণয়ের ফিঙ্গার প্রিন্টিং এ যে ভি এন টি আর এর ব্যবহার দেখেছি তাই হতে পারে এক রকম মার্কার, যদি অভীষ্ট জিনের সঙ্গে এটি বরাবর থাকে। ইলেকট্রোফোরোসিসএ এর বিশেষ প্যাটার্ন পেলেই আমরা বুঝবো এ মার্কার সেখানে আছে। আরো সহজ মার্কার হতে পারে একটি বেইসের পার্থক্যের কারণে যে মিউটেশন হয় যাকে বলা হয় এস এন পি। মূল জিনটি থাকলে তার সঙ্গে একরম একটি এস এন পি যদি সব সময় থাকে– তা হলে সেটিও হতে পারে একটি মার্কার। আবার ডি এন এ'র অন্য ধরনের অংশ যা ভি এন টি আর এর মতই নানা সাইজের টুকরায় ভেঙ্গে যেতে পারে। ভি এন টি আর যেমন মার্কার হতে পারে এরকম অন্য ধরনেরগুলোও তা হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে ঐ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর মতই ইলেকট্রোফোরোসিস করে প্যাটার্ন সৃষ্টি করা যায় এবং মার্কারটি আছে কি নাই তা প্যাটার্নের তুলনা করে বুঝা সম্ভব হয়।

জিন অনুসরণের একটি উদাহরণ

পরিবারে অভীষ্ট জিনকে অপেক্ষাকৃত সহজে অনুসন্ধান করা সম্ভব শুধু মার্কারকেই অনুসন্ধান করে। এজন্য পরিবারের যাদের মধ্যে জিনটিকে অনুসন্ধান

করার কথা তাদের ডি এন এ'র ঐ মার্কার সম্বলিত অংশের টুকরা- গুলো ইলেকট্রোফোরোসিস করে ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর কায়দায় প্যাটার্ন পেতে হয়। পরিবারের নানা জনের প্যাটার্নের তুলনা করেই বুঝা যায় অভীষ্ট জিন কার কার মধ্যে আছে।

তবে এর জন্য ডি এন এ'র সঠিক অংশটিকে আলাদা করার জন্য প্রথমে ডি এন এ'র মধ্যে মার্কারকে খুঁজে বের করতে হবে। এটি করা হয় মার্কারের সম্পূরক ডি এন এ সংশ্লেষণ করে তাকে প্রোব বা অনুসন্ধানী হিসাবে ব্যবহার করা। যেহেতু মার্কারের সহজ সরল সিকোয়েন্সটি জানা থাকে পলিমারেজ এনজাইম ব্যবহার করে তার সম্পূরক ডি এন এ সংশ্লেষণ করে নেয়া হয় অনেক কপি। মূল ডি এন এ'র সঙ্গে মেশালে এই সম্পূরকগুলো প্রোব হিসাবে ঠিক ঠিক ঐ মার্কারের সঙ্গে গিয়ে সংযুক্ত হয়। এ জন্য অবশ্য আগেই ডি এন এ'র দুই সূত্রকে আলাদা করে নিতে হয়। এক সূত্রের ডি এন এ সব সময় তার হুবহু বিপরীত বা সম্পূরক ডি এন এ'র সঙ্গে জোড় বাঁধে, প্রোবটিও সেকারণে অন্য কোথাও না গিয়ে ঠিক মার্কারের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তার সঙ্গেই জোড় বাঁধে। প্রোবটি সংশ্লেষণ করার আগে ওর কিছু ফসফরাস পরমাণুকে ফসফরাসের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে বদলে নেয়া হয়। এভাবে এর সঙ্গে তেজস্ক্রিয় লেবেল লাগিয়ে নেয়া হলো বলে প্রোবকে এবং সেই সঙ্গে তার সংলগ্ন মার্কারকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দ্বারা চিনে নিতে সুবিধা হয়। এবার ডি এন এ'র এই অঞ্চলটিরই কপি করে, টুকরা টুকরা করে ইলেকট্রোফোরোসিস প্যাটার্ন করলে তাদের তুলনা থেকেই বুঝা যাবে জিনটা সেখানে আছে কিনা। এরকম জিন অনুসরণের একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ধরা যাক একটি বিশেষ কর্তনকারী এনজাইম মার্কার ডি এন এ'কে স্বাভাবিক অবস্থায় তিনটি কাটার জায়গায় কাটতে পারলো তার সুনির্দিষ্ট বেইস সমন্বয় ওখানে খুঁজে পেয়েছে বলে। তা হলে কাটার ফলে ঐ মার্কার ডি এন এ চারটি টুকরায় ভেঙ্গে যাবে, বিভিন্ন দৈর্ঘের। কিন্তু ধরা যাক, কোন এক জনের ডি এন এ'তে বিশেষ ছোট্ট এমন মিউটেশন ঘটেছে যে তাতে আরো একটি অতিরিক্ত কাটার জায়গা দেখা দিয়েছে। এর ফলে এই ক্ষেত্রে যেখানে বাড়তি কর্তন ঘটেছে তার সংশ্লিষ্ট একটি টুকরা ভেঙ্গে ক্ষুদ্রতর দুটি টুকরায় পরিণত হবে– যা স্বাভাবিক ক্ষেত্রের থেকে ভিন্ন। এক্ষেত্রে মোট টুকরা চারটির বদলে পাঁচটি হবে। অনুরূপ ভাবে কোন মিউটেশন যদি স্বাভাবিক কাটার জায়গাগুলোর একটিকে কমিয়ে ফেলে তা হলে মোট টুকরা চারটি না হয়ে তিনটা হবে। ফলে কোন একটি টুকরার দৈর্ঘও বড় হবে এর ফলে। আবার যদি মিউটেশন ঐ মার্কার ডি এন এ'র কোন

জায়গায় অতিরিক্ত কিছু বেইস পরম্পরায় ঢুকিয়ে দেয় তা হলে স্বাভাবিক চার টুকরার মধ্যে ও একটির দৈর্ঘ অস্বাভাবিক রকম লম্বা হয়ে যাবে। এ ভাবে একটি মিউটেশন টুকরার দৈর্ঘ ও সংখ্যায় নানা বৈচিত্র সৃষ্টি করতে পারে। পরিবারে বিভিন্ন জনের ডি এন এ'র এই টুকরাগুলো ইলেকট্রোফোরোসিস করে যদি আমরা প্যাটার্ন নেবার ব্যবস্থা করি– তা হলে নির্দিষ্ট মিউটেশনটি থাকা না থাকা অনুযায়ী সেই প্যাটার্নে অমিল দেখা যাবে। কারণ ঐ প্যাটার্নতো টুকরার দৈর্ঘ অনুযায়ীই সৃষ্টি হয়। ঐ অমিল দেখে আমরা বুঝতে পারবো কার ডিএনএতে ঐ ব্যতিক্রমী বৈশিষ্টের জন্য দায়ী মিউটেশনটি গিয়েছে।

প্রক্রিয়াটি অনেকটা হুবহু ডি এন এ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর মতো। ধরা যাক ইতোমধ্যে আমরা প্রোব দিয়ে পুরো মার্কার ডি এন এ অংশকে চিহ্নিত করেছি, আর সেই প্রোবগুলোতে তেজস্ক্রিয় লেবেল লাগানো রয়েছে। এবার কর্তিত টুকরাগুলো ইলেকট্রোফোরোসিস করলে বেঁটে হালকা টুকরাগুলো দূরে এবং লম্বা ভারী টুকরাগুলো ক্রমান্বয়ে কাছে জমা হয়ে পরপর দাগের প্যাটার্ন সৃষ্টি হবে। যথারীতি ব্লটিং করে তা নাইলন ঝিল্লিতে তুলেও নেয়া হলো। এবার উপযুক্ত ফিল্মে ছবি নিলে তেজস্ক্রিয় রশ্মির কারণে শুধু প্রোব দিয়ে লেবেল করা টুকরাগুলোই প্যাটার্নের ছবিতে ফুটে উঠবে।

একটি বংশগত রোগ পরিবারে কোন কোন সদস্যদের মধ্যে ডি এন এ কীভাবে নিয়ে গেছে তার অনুসরণকেই আমরা উদাহরণ হিসাবে নিই। ধরা যাক বাবা ও মা উভয়ে এই রোগের বাহক। অর্থাৎ বাবার দুই সেট ডি এন এ'র মধ্যে একটি স্বাভাবিক এবং অন্যটি ঐ রোগের কারণে বিকৃত জিন বহন করছে– সেটির মার্কারে তাই মিউটেশনটি রয়েছে। যেহেতু রোগ প্রকাশ না হওয়াটাই প্রাধান্য পায়, তাই স্বাভাবিক সেটটিই প্রাধান্য পাচ্ছে বলে তিনি বাহক মাত্র। মায়ের অবস্থাও হুবহু একই রকম। তখন তাঁদের সন্তানদের মধ্যে তিন রকম অবস্থা হতে পারে। বাবা ও মা উভয়ের থেকে শুধু স্বাভাবিক ডি এন এ'টি যে পেয়েছে– সে বাহকও নয়, রোগাক্রান্তও নয়। একজন থেকে স্বাভাবিক ও অন্যজন থেকে বিকৃত জিন যে পেয়েছে সে বাহক। আবার দু'জন থেকেই বিকৃত জিন যে পেয়েছে– সে রোগাক্রান্ত অথবা ভবিষ্যতে রোগাক্রান্ত হবে।

বাবা, মা, আর ঐ তিন রকম সন্তানের মার্কার ডি এন এ নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর মত প্রক্রিয়া করা হলো, এবং তাদের প্যাটার্নগুলো পাশাপাশি রাখা হলো তুলনার জন্য। ধরা যাক বিকৃত মার্কারটিতে একটি অতিরিক্ত 'কাটার জায়গা' যোগ করে এবং তাতে স্বাভাবিক একটি টুকরা ভেঙ্গে

দুটি টুকরা হয়েছে যেগুলো তাই অপেক্ষাকৃত বেঁটে। বাবা ও মায়ের প্যাটার্নে অবিকৃত সেটের ডি এন- এ'র কারণে ঐ টুকরার অভঙ্গ অবস্থার দাগ (স্বাভাবিক) যেমন থাকবে, সেই সঙ্গে রোগের বিকৃত সেটের ডি এন এ'র কারণে মিউটেশনে ভেঙ্গে ছোট দুটি হয়ে যাওয়া টুকরার দাগও থাকবে। কারণ তাঁরা রোগের বাহক। যে সন্তান বাহকও নয় আক্রান্তও নয় তার প্যাটার্নে ঐ টুকরার শুধু স্বাভাবিক অভঙ্গগুলোর দাগ থাকবে। যে সন্তান বাহক তার প্যাটার্নে দাগগুলো হুবহু বাবা ও মায়ের মত হবে। আর যে আক্রান্ত তার প্যাটার্নে ঐ টুকরার ভেঙ্গে ছোট হওয়া টুকরার (মিউটেশন হওয়া) দাগই শুধু থাকবে। কাজেই তুলনামূলক ভাবে ওদের প্যাটার্নগুলোতে দাগগুলো দেখেই বুঝা যাবে কে বাহক হিসেবে রোগের ডি এন এ বহন করছে, কে আদৌ তো বহন করছেনা, কার ডিএনএ রোগাক্রান্ত হবার সঙ্কেত বহন করছে।

পরিবারে বাস্তব পরিস্থিতি ও ডি এন এ'র সংকেত এই উভয়ে মিলিয়ে কোন রোগ বা কোন বৈশিষ্টের জন্য দায়ী জিনকে সনাক্ত করতে এই অনুসরণগুলো খুবই সহায়ক হয়। তা ছাড়া রোগের ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্য এটি খুব কাজে আসে। ঐ রোগের আক্রান্ত হবার বা বাহক হবার 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' প্যাটার্নটি যদি একবার জেনে ফেলা হয়, তখন যে কোন পরিবারের যে কোন সদস্যের ডি এন এ নিয়ে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় প্যাটার্ন তৈরি করে তার ধরন থেকে তাদের বা তাদের নিকট বংশধরদের মধ্যে এ রোগের ঝুঁকিটি নির্ণয় সম্ভব।

আজকাল অবশ্য আরো অনেক সহজে জিন অনুসরণ সম্ভব হচ্ছে জেনোম সিকোয়েন্সিং খুব সহজ হয়ে যাওয়ার ফলে। এখন তাই উল্লিখিত ধরনের বদলে এস এন পি মার্কার বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এস এন পি হলো একটি নিউক্লিয়োটিড পরিবর্তনের ফলে বৈচিত্র সৃষ্টি হওয়া কথাটির আদ্যাক্ষর। ডি এন এ'এর সংশ্লিষ্ট অংশটি সিকোয়েন্সিং করে ফেল্‌লেই এতে বুঝা যায় যে কার ডি এন এ'তে ঐ পরিবর্তনটি আছে, আর কার ডি এন এ'তে তা নাই। এভাবে বিশেষ রোগের বা বৈশিষ্টের ডি এন এ সংকেত অনুসরণ করা যায়, ঝুঁকি নির্ণয় করা যায়, জিন ম্যাপিং করা যায়। এই জিন ম্যাপিং করার কথাতেই আমরা এরপর আসছি।

জেনোম মানচিত্র

জেনোম মানচিত্র কী ?

বেশ কিছু সময় ধরে নানা জীবের সমগ্র ডি এন এ উদ্ঘাটনের কাজ চলছে। কিছু সরল জীবের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুরূহ পদ্ধতিতে এটি আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন সবার ক্ষেত্রে উন্নততর এবং অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দ্রুত এ কাজ চলছে। এই সমগ্র ডি এন এ'কেই বলা হয় জেনোম– প্রত্যেক ক্রোমোজোমে ডি এন এ'র পুরো দৈর্ঘ নিয়ে এবং এভাবে সকল ক্রোমোজোম মিলেই জেনোম। ২০০০ সালে মানব জেনোমের প্রাথমিক উদ্ঘাটন শেষ হয়েছে অপেক্ষাকৃত দুরূহ প্রক্রিয়াতেই। এখন দ্রুত তৈরি হচ্ছে নানা জীবের জেনোম মানচিত্র– এক একটি ক্রোমোজোমে পূর্ণ ডি এন এ'র মধ্যে জিনগুলো নিয়ে। বিশেষ করে বিভিন্ন অভীষ্ট জিনের মার্কারগুলো এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অংশগুলো কোন্‌টির পর কোন্‌টি কীভাবে থাকে তার চিত্রণটিই হচ্ছে জেনোম ম্যাপিং। কোন বাড়ি বা অভীষ্ট ঠিকানা খুঁজে পেতে আমরা যেভাবে মানচিত্র ব্যবহার করি এই মানচিত্র একই ভাবে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টের জন্য দায়ী জিন (ডি এন এ'র অংশ) খুঁজে পেতে, অথবা তার সঙ্গে সব সময় জড়িত মার্কার (তাও ডি এন এ'র অংশ) খুঁজে পেতে কাজে আসে। মার্কার-গুলো বেশি স্পষ্ট বলে প্রথমে সেগুলো খুঁজে নিতে পারলে তারপর জিনের বিস্তারিত সিকোয়েন্সিং ইত্যাদি করার জন্য ডি এন এ'র শুধু তার কাছাকাছি অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে চলে।

জেনোমের মানচিত্র তৈরির চেষ্টাটি কিন্তু নূতন নয়। যখন ডি এন এ'র গঠন সম্পর্কে কিছুই জানা ছিলনা, এমনকি ডি এন এ'ই যে ক্রোমোজোমের মধ্যে সেই বার্তাবহ তাও যখন জানা ছিলনা, তখনো বংশানুক্রমে চলে এমন বৈশিষ্টের চিহ্ন ক্রোমোজোমের মধ্যে কী পরম্পরায়ে থাকে তার একটি ম্যাপিং করার চেষ্টা শুরু হয়েছিলো। কোন্ গুণের সঙ্গে অন্য কোন্ গুণ সব সময় বেশি বা কম সংযুক্ত থাকে বাস্তবে অনেকের মধ্যে তা লক্ষ্য করে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে নির্ণয় করা হচ্ছিল ক্রোমোজোমে কোন্ জিনের সঙ্গে কোন্ জিন কত কাছে বা কত দূরে অবস্থিত তা। যেমন লাল চোখ মাছি আর সাদা চোখ মাছিদের বংশানুক্রম লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছিল যে চোখের রঙের বৈশিষ্টটি লিঙ্গের বৈশিষ্টের সঙ্গে এতই সংযুক্ত যে তারা কাছাকাছি থাকতে বাধ্য। এভাবে নানা গুণের পরস্পর সংশ্লিষ্টতার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব থেকে তৈরি হয়েছে নানা জীব

ও মানুষের ক্ষেত্রে এক ধরনের জিন মানচিত্র– যাকে বলা হয় লিংকেজ ম্যাপ। এতে নানা জিনকে ক্রোমোজোমে নানা দূরত্বে স্থাপন করা থাকে।

বর্তমানে ডি এন এ বিজ্ঞানের ফলে জিন মানচিত্র তৈরির কাজ অনেক উন্নত হয়েছে। এই মানচিত্র তৈরি হয় দুটি পর্যায়ে। প্রথমটি হলো জেনেটিক লিংকেজ ম্যাপ– কিছুটা ঐ আগেকার লিংকেজ ম্যাপেরই অনুরূপ। বংশানুক্রমে কিছু গুণগুলো সব সময় এক সঙ্গে সঞ্চারিত হবার কম বা বেশি প্রবণতার হিসাব থেকেই ক্রোমোজোমে তাদের আপেক্ষিক নৈকট্য ঠিক করে এটি তৈরি হচ্ছে। যেগুলো যত কাছাকাছি হবে পরের প্রজন্মে যাবার আগে রিকম্বিনেশন প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গাভাঙ্গিতে গুণদুটির জিনগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তত কম হবে, তাই তারা একই সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মে যাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। বর্তমানে কম্পিউটার ভিত্তিক বায়োইনফরমেটিক্স বিদ্যার কল্যাণে এ কাজটি অনেক সহজ ও নিঁখুত হয়ে জেনেটিক লিংকেজ ম্যাপ তৈরি হচ্ছে নানা জীবের।

লিংকেজ ম্যাপ তৈরি হবার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের মানচিত্র তৈরি হতে পারে– যেটি হলো ফিজিক্যাল ম্যাপ। লিংকেজ ম্যাপ জেনোমে বিভিন্ন বৈশিষ্টের জিনের মোটামুটি অবস্থান ঠিক করে দিলে অভীষ্ট জিনটিকে তখন ঐ এলাকায় বিস্তারিত ভাবে উদ্ঘাটন করা যায়। এই বিস্তারিত ভাবে উদ্ঘাটন হলো নিঁখুতভাবে তার অবস্থানকে চিহ্নিত করা এবং তার সিকোয়েন্সিং করা। এটি করার মাধ্যমেই তৈরি হচ্ছে জেনোমের ফিজিক্যাল ম্যাপ। সিকোয়েন্সিং যত সহজ ও নিঁখুত হচ্ছে এ মানচিত্রও তত নিঁখুত হচ্ছে, বিস্তারিত ভাবে বিভিন্ন জিনগুলোকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত ও উদ্ঘাটিত করার জন্য।

ফিজিক্যাল ম্যাপ তৈরি

ফিজিক্যাল ম্যাপিং এর কাজগুলো ধাপে ধাপে হতে হয়। প্রথমে পুরো ক্রোমোজোম জুড়ে থাকা দীর্ঘ ডি এন এ'কে কর্তনের এনজাইম দিয়ে বড় বড় কিছু টুকরা করে নেয়া হয়। এগুলোর লক্ষ লক্ষ কপি তৈরি করে নেয়া হয় পি সি আর পদ্ধতিতে– যেগুলোকে বলা হয় মূল টুকরাগুলোর ক্লোন। এখন এর মধ্যে আপাতত যে সব অংশের ফিজিক্যাল ম্যাপ করা হবে সেগুলোকে আরো ছোট টুকরায় বিভক্ত করতে হবে যাতে করে সিকোয়েন্সিং করার উপযুক্ত দৈর্ঘে আনা যায়। এই টুকরাগুলোর সংরক্ষিত রূপকে বলা হয় ডি এন এ লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে এরা দুভাবে থাকে। এক দিকে টুকরাগুলো মূল ডি এন এ'তে যেভাবে সাজানো ছিল সেই ক্রমটিকে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। অন্য

দিকে নানা টুকরার সত্যিকার ক্লোনগুলো ফ্রিজারের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। প্রয়োজন মত দরকারী ডিএনএ অংশটি আমরা এই লাইব্রেরী থেকে খুঁজে নিতে পারি।

লিংকেজ ম্যাপ থেকে আমরা আগেই ইঙ্গিত পাব আমাদের অভীষ্ট জিনটি বা মার্কারটি ডি এন এ'র, কোন্ অংশে থাকতে পারে। সেই অংশটি ডি এন এ লাইব্রেরী থেকে (ফ্রিজার থেকে) খুঁজে নিয়ে তার সিকোয়েন্সিং করা হয় এবং তার মধ্যে জিনটিকে নিঁখুত ভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়– বুঝার চেষ্টা করা হয় সিকোয়েন্সের কোন্খান থেকে জিনের শুরু, কোনখানে তার শেষ।
এভাবে জিন খুঁজে নেবার একটি উপায় আছে যার মজার নাম দেয়া হয়েছে 'ফিশিং'। আসলেও ব্যাপারটি ফিশিং বা মাছ ধরার মত– যেই মাছ ধরতে চাই ঠিক তার উপযুক্ত টোপ। বড়শিতে গেঁথে পানিতে বিশেষ মাছের বিশেষ টোপ ফেললে ঠিক সেই মাছই যেমন বড়শিতে ধরা পড়ে, অনেকটা সেভাবে। এক্ষেত্রে অভীষ্ট জিনটি হচ্ছে 'মাছ' আর ঐ জিনের প্রোটিনের কোডের সম্পূরক ডিএনএ হচ্ছে সেই মাছের 'টোপ'। যেই বৈশিষ্ট দানকারী জিন আমরা খুঁজছি সেই বৈশিষ্টের সঙ্গে জড়িত একটি প্রোটিনের এমাইনো এসিড ক্রম থেকে তার কোডন ক্রম আমরা জানবো। পর পর সেই কোডনগুলোর সম্পূরক যদি আমরা সংশ্লেষিত করে নিতে পারি (ডি এন এ'র এর রকম রাসায়নিক সংশ্লেষণ সম্ভব) তবে সেটিই হতে পারে আমাদের টোপ। সংশ্লেষিত এই টোপটিতে ফ্লোরোসেন্ট লেবেল লাগিয়ে নেয়া হয় তার সঙ্গে ফ্লোরোসেন্ট বা স্বতপ্রভ রঙ-বস্তু যোগ করে– যা বিশেষ আলোতে নিজ থেকে জ্বল জ্বল করবে। দুই সূত্র আলাদা করা জীবন্ত কোষের ক্রোমোজোমের সঙ্গে এই 'টোপ' মেশালে টোপগুলো আর কোথাও না গিয়ে ঠিক অভীষ্ট জিনের ঐ প্রোটিনের কোডনগুলোর সঙ্গে (যা ডি এন এ'র প্রাসঙ্গিক অংশ) আবদ্ধ হবে। ইলে-কট্রোফোরেসিসের প্যাটার্নে তখন ঐ চিহ্নিত জিন সম্বলিত টুকরাগুলো এক জায়গায় জমে সেখানকার দাগটিই জ্বল্ জ্বল্ করবে, ও জিনটি এভাবে চিহ্নিত হবে। এই সব ধাপ এখন বেশ স্বয়ংক্রিয় ভাবেই করা যাচ্ছে।

বিস্তারিত সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে তৈরি ফিজিক্যাল ম্যাপিং থেকে আমরা কী জানতে পারছি? এর দ্বারা জেনোমের মধ্যে কোডিং জিনগুলো স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে পারছি। জেনোমে বিভিন্ন জিনের মধ্যে স্থানিক দূরত্ব থেকে তাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তাও এখান থেকে জানতে পারছি। কারণ যত কাছাকাছি অবস্থান হবে এদের দ্বারা সৃষ্ট বৈশিষ্টগুলোও একত্রে দেখা যাবার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। আগেকার সময়ে লিংকেজ ম্যাপে এটি যে

রকম নানা ধরনের রিকম্বিনেশনের হার থেকে কষ্টসাধ্য উপায়ে করতে হতো, এখন সিকোয়েন্সিং করতে পারার ফলে এ কাজে তার আর দরকার হচ্ছে না। দেখা যাক দীর্ঘ ডি এন এ সিকোয়েন্সের মধ্যে বিভিন্ন জিনগুলোকে আলাদা করতে পারবো কী ভাবে। এক্ষেত্রে ষ্টপ কোডনটি অর্থাৎ যে কোডন একটি প্রোটিন তৈরির সমাপ্তি সূচিত করে, সেটি লক্ষ্যণীয়। একটি জিনের মাঝখানে কোন 'ষ্টপ কোডন' থাকবে না, বরং ষ্টপ কোডন থাকলে বুঝতে হবে এখানে জিনটি শেষ। তেমনি জিনের শুরুটিও হবে একটি 'প্রারম্ভ কোডন' দিয়ে। এসব কোডনগুলো অবশ্য ঠিক ভাবে পেতে হলে পুরো ডি এন এ'র কোন্ জায়গা থেকে পড়া শুরু করলাম তা ঠিক থাকতে হবে– মাত্র একটি বেইস এদিক ওদিক হলেই কিন্তু কোডনগুলোর চিনে নেওয়াটি গুবলেট হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে তিন বেইস দিয়ে এক একটি এমাইনো এসিড ধরে আনার কোডন, ATG বা GTG এই দু'রকমের বেইস ত্রয়ী দিয়ে 'ষ্টপ কোডন' তৈরি হওয়া, AUG বা GUG এই দুই বেইস ত্রয়ী দিয়ে 'প্রারম্ভিক কোডন' সৃষ্টি হওয়া– ইত্যাদি বিষয়গুলো স্মরণ করতে হবে। তিন বেইসে গড়া কোডনগুলোর মাঝে কোন ফাঁক না থাকার কারণে সঠিক জায়গা থেকে বেইস ক্রম 'পড়া' শুরু করা চাই।

ফিজিক্যাল ম্যাপিং এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো এর সিকোয়েন্সিং থেকে নানা জিনের কোডিং করা এমাইনো এসিড ক্রম অর্থাৎ প্রোটিনগুলোও উদ্ঘাটন হয়। এর থেকে ঐ প্রোটিনের কাজ অর্থাৎ ঐ জিন-সৃষ্ট বৈশিষ্টগুলোও আন্দাজ করা যায়। এভাবে জিন থেকে আমরা তার বৈশিষ্ট জানার দিকে যেতে পারি। আর উল্টোটিও এই ম্যাপিং থেকে করা যায়, তাহলো এক একটি প্রোটিনের বা বৈশিষ্টের জিন খুঁজে পাওয়া– যেটি আমরা 'ফিশিং' আলোচনা করার সময় দেখেছি। আসলে বৈশিষ্টের সঙ্গে এক একটি জিনের সম্পর্ক শুধু সেই জীবের ডি এন এ সম্পর্কে জ্ঞান থেকে আসবে তা নয়। বরং এক্ষেত্রে আরো সরল অন্য জীবে সদৃশ জিনের বৈশিষ্ট যদি জানা থাকে, তা হলে অভীষ্ট জীবটিতেও ঐ বৈশিষ্ট থেকে জিনটি খুঁজে নেবার চেষ্টা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ রুটি তৈরিতে যে ঈষ্ট ব্যবহার করা হয় সেই অতি সরল জীবটিতে ২০০ এর মত প্রোটিনের ক্ষেত্রে তার বেইস-ক্রমের 'টোপ' ব্যবহার করে মানুষের জিনের 'ফিশিং' করা সম্ভব হয়েছে, কারণ ঈষ্টের ঐ জিনের সৃষ্ট বৈশিষ্টের সঙ্গে মানুষের ওরকম জিনের বৈশিষ্টে অদ্ভুত মিল রয়েছে। এই সব কাজ– বৈশিষ্ট থেকে জিন, অথবা জিন থেকে বৈশিষ্ট– ফিজিক্যাল ম্যাপ থেকে পাওয়ার বিষয়গুলো তখন একান্তই কম্পিউটার ভিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছে। এর জন্য

সফ্‌টওয়্যারগুলো এতই দক্ষ যে সাধারণ একটি ডেস্ক কম্পিউটার দিয়েও এরকম কাজ করা সম্ভব।

বায়োইনফরমেটিক্স

আমরা দেখছি ডিএনএ গবেষণা, বিশেষ করে জেনোম ম্যাপিং করার কাজের সঙ্গে এখন ওতোপ্রোতে ভাবে জড়িত হয়ে আছে কম্পিউটার বিজ্ঞান। আসলে তথ্য প্রযুক্তির (ইফরমেশন টেকনোলজি) একটি অত্যন্ত অগ্রসরমান শাখাই হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স বা জীব-তথ্যপ্রযুক্তি। এটি না এগুলে আধুনিক ডি এন এ বিজ্ঞান বর্তমান অবস্থায় আসতে পারতোনা– এত দ্রুত এতগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণির সম্পূর্ণ জেনোম উদ্ঘাটন কিছুতেই সম্ভব হতো না, মানব জেনোম সহ। ডি এন এ লাইব্রেরী থেকে জেনোম মানচিত্র তৈরির সময় সিকোয়েন্সিং করার উপযুক্ত আকারে টুকরা করে সেখানে রাখতে হয়– মাত্র ৩৫ বেইস থেকে শুরু করে ৯০০০ বেইস জোড়া দীর্ঘ টুকরা। এদের একটি টুকরার সিকোয়েন্সিং করার পর তার ঠিক পরে কোন্ টুকরার সিকোয়েন্সটি আসবে সেটি জানাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য টুকরাগুলো করার সময় প্রত্যেকটির প্রান্তে তার পরের টুকরার কিছু বেইসও তার সঙ্গে উপরিপাতিত ভাবে রেখে দেয়া হয়, যাতে করে এই প্রান্তের বেইস ক্রমের সঙ্গে পরের সঠিক টুকরাটির শুরুর বেইস ক্রমের মিল দেখে চিনে নেয়া যায় কোন্‌টির পর কোন্‌টি আসবে। এভাবে চিনে নিয়ে সঠিক টুকরা সাজিয়ে পুরো জেনোমকে উদ্ঘাটনের কাজটিও একমাত্র বায়োইনফরমেটিক্সের মাধ্যমেই দ্রুত করা সম্ভব।

সরলতর জীবগুলো দিয়ে শুরু করে ক্রমেই জটিলতর নানা জীবের জন্য সম্পূর্ণ জেনোম উদ্ঘাটন করা হয়েছে। এর সকল তথ্য এ জন্য উদ্ভাবিত বিশেষ সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে বিশেষ ডাটা বেইস রাখা হয়। আজকাল এরকম সুবিস্তৃত পাবলিক ডাটা বেইস রয়েছে যার থেকে পরীক্ষমান জীবের একটি জিনের কিছু তথ্য দিয়ে সার্চ করে অন্যান্য জীবের কোনটির কোথায় তার সদৃশ জিন রয়েছে তা তড়িৎ গতিতে বের করে ফেলা যায়। এসব ছাড়াও বায়োইনফরমেটিক্সের আরো কাজ হলো জেনোমে কোডিং জিনগুলোকে নন-কোডিং বেকার অংশ থেকে আলাদা করা, এবং একই প্রজাতির নানা জাতের মধ্যে ও সদস্যের মধ্যে, বিভিন্ন জিনের তুলনা করে জিনের মিল-অমিল বের করা ইত্যাদি। এজন্য শুধু একেবারে সদৃশ জিন চিনে নেয়া নয়, বরং এটি উভয়ের মধ্যে একটু আধটু জায়গায় যে নানা মিউটেশন নানা সদস্যের মধ্যে

থাকে, তাও চিহ্নিত করতে পারে। এ সব কাজের জন্য 'জিন মার্ক', 'জিন স্ক্যান', জিন বিল্ডার' ইত্যাদি নামের নানা রকম সফ্‌টওয়্যার এখন রয়েছে।

অনুকরণীয় জীব মডেল

আমরা দেখেছি যে সব জীবের জেনোম মানচিত্র ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে, যাদের বিভিন্ন জিনের সৃষ্ট বৈশিষ্টগুলো জানা রয়েছে, সেই জ্ঞান অন্য জীবের জিন উদ্ঘাটনে কাজে লাগে। উদ্ঘাটনের কাজে এই সুযোগটি এখন ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে কারণ মানুষ সহ যে কোন প্রাণিতে

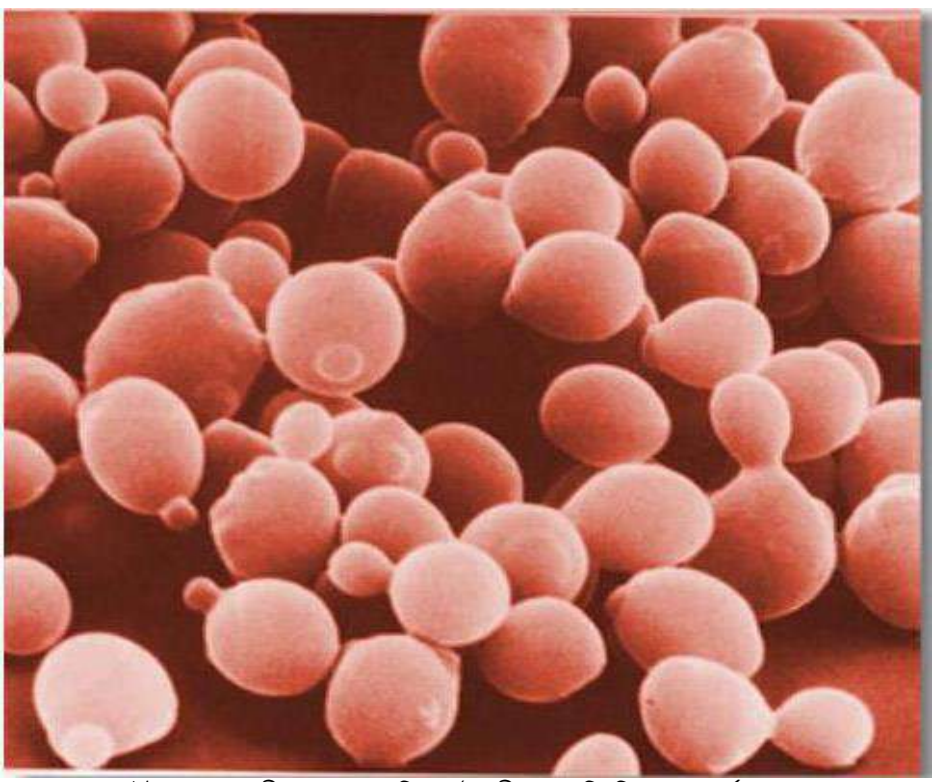

ঈষ্ট কোষ (অণুবীক্ষণে দেখা): জিন লাইব্রেরীর জন্য নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ মডেল

জেনেটিক বার্তাগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। এদের অনেকগুলো জীবের নিজের প্রজাতির ইতিহাসকে ছাড়িয়ে তারও বহু প্রজাতি আগের পূর্বসূরি এমনকি পুরো জীব ইতিহাসের শুরুতে নিহিত থাকতে পারে। কাজেই আজকে মানুষের ডিএন এ'তে যে জিন তার খুবই সদৃশ জিন হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে কোন পোকা কিংবা ব্যাকটেরিয়া কিংবা ফাঙ্গাসের মধ্যে। অথচ এই শেষের জীবগুলোর

জেনোম মানুষের থেকে অনেক অনেক সরল, তাদের জেনোম উদ্ঘাটন অনেক সহজ, অনেকগুলোর উদ্ঘাটন হয়েও গেছে আগে। কাজেই তাদের ঐ

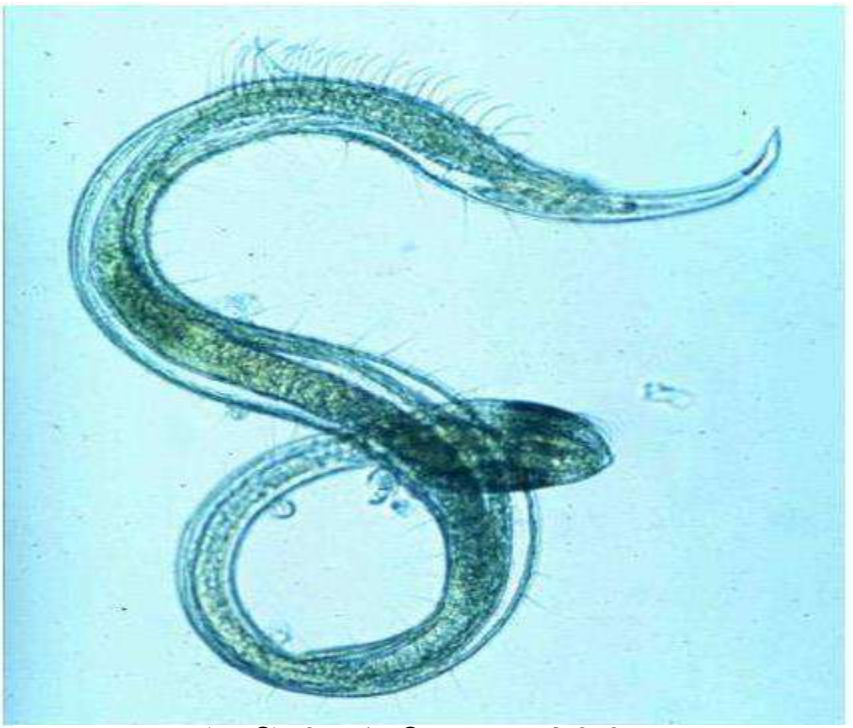

নেমাটোড কীট: জিন লাইব্রেরীর জন্য আরেকটি নিয়মিত মডেল

তথ্যগুলো মানুষ বা অন্যদের জেনোম উদ্ঘাটনে কাজে লাগে বৈকি। ওরকম যেই জীবের জানা ডি এন এ তথ্যগুলো কাজে লাগানো হচ্ছে সেগুলোকে বলা যায় জীব-মডেল– তাদেরকে 'মডেল' হিসাবে অনুকরণ করা হচ্ছে বলে।

এরকম কিছু কিছু সরলতর জীবের উপর বহু দিন ধরে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, এদের নানা জিন সম্পর্কে যথেষ্ট জানা গেছে। উচ্চতর জীবের এবং মানুষের জেনোমের সঙ্গে এদের গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ঈষ্ট, নেমাটোড কীট, ড্রসোফিলিয়া বা ফলের মাছি, জেব্রাফিশ, মুরগি ইত্যাদি। এরা খুবই বহুল ব্যবহৃত জীব মডেল, এদের বলা হয় সুপার মডেল।

মডেল হিসাবে এদের সুবিধা হলো সহজে এদের বংশবৃদ্ধি করা যায় দ্রুত, পর পর বংশ পরম্পরায় জিন অনুসরণ সহজে অল্প সময়ে করা যায়, জিন অনুসন্ধানের অন্যান্য কৌশলগুলোও অপেক্ষাকৃত সহজে এদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এদের সঙ্গে অন্যদের জিনের মিলের কিছু উদাহরণ নেয়া যাক। ভ্রূণ

থেকে একটি প্রাণি কীভাবে পূর্ণ বয়স্ক হয় সেই প্রক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করে যেই জিন সেটি ফলের মাছি আর মানুষে একই। মানুষের ক্ষেত্রে যে জিনের কারণে

ড্রসোফিলিয়া মাছিঃ জিন লাইব্রেরীর বহুল ব্যবহৃত মডেল

স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয়ের রোগ হয় ঈষ্টের ঠিক অনুরূপ একটি জিন রয়েছে যদিও সেখানে এর কাজ ভিন্ন– ঈষ্টের তো আর স্নায়ুতন্ত্র নাই। তবে ঐ কাজ থেকে এই কাজের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনেক রকম জিনের উদ্ঘাটনে এ সব সুপার মডেল ব্যবহার করা যায় বটে, তবে আরো বিশেষ বিশেষ জিন খুঁজে পাওয়ার জন্য কিছু বিশেষ বিশেষ জীব-মডেল খুব কাজে লেগে যায়। সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত এরকম কিছু বিশেষ মডেল দেখা যাক যাদের উপর গবেষণা সদ্য শুরু হয়েছে।

আইস ফিশ থেকে রক্ত শূন্যতা ও ঝাঁঝরা হাড়ের জিনঃ

এরা আন্টার্কটিকের শীতল পানির গভীর তলে থাকা স্বচ্ছ মাছ। ওখানে শীতল পানিতে অধিক অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে বলে ঐ মাছের রক্তে লোহিত কণিকার প্রয়োজন কম, তাই এর রক্ত স্বচ্ছ। অতীতেই পটকা হারিয়ে ফেলাতে পানিতে ভাসার জন্য একে অন্য ব্যবস্থা হিসাবে হাড়গুলো ঝাঁঝরা করে নিতে হয়েছে এর থেকে ক্যালশিয়াম ইত্যাদি খনিজ বাদ দিয়ে। এই উভয় কাজের জিন– লোহিত কণিকা কমানো বা চরম 'রক্ত শূন্যতার' জিন, আর হাড়ের ক্যালশিয়াম কমিয়ে তা ঝাঁঝরা হবার জিন, কিন্তু মানুষের দুটি অসুখের জিন খুঁজতে খুব

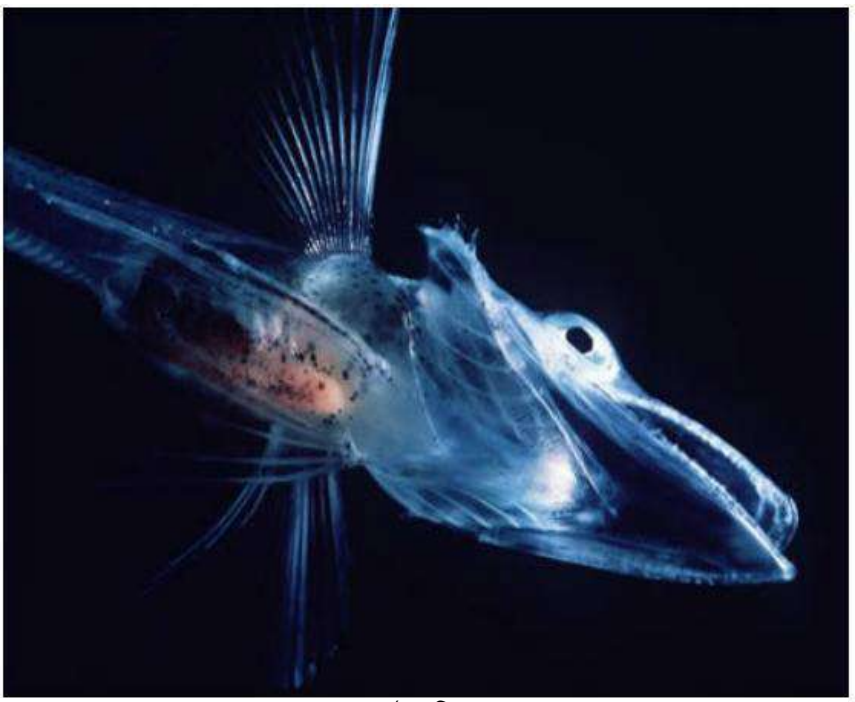

আইস ফিশ

সহায়ক হচ্ছে। রক্তশূন্যতার অসুখে মানুষের লোহিত কণিকা কমে গিয়ে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

আর বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে হাড় ঝাঁঝরা হয়ে খুব ভঙ্গুর হয়ে প্রায়শ মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়। কোন্ কোন্ জিনের প্রভাবে এটি ঘটে জানতে পারলে এদের চিকিৎসার একটি ভাল সুরাহা হবে। তাই আইস ফিশকে মডেল করে জিনের অনুসন্ধান চলছে। প্রাসঙ্গিক জিনগুলোতে ঠিক কী ধরনের মিউটেশনের ফলে আইস ফিশের রক্ত ও হাড়ের এই অবস্থা হয়েছে জানতে পারলে মানুষের ক্ষেত্রে অসুখ দুটির অনুরূপ মিউটেশনকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ২০০৪ সালে শুরু হয়ে এ গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে।

গুহার মাছ থেকে চোখের ছানি, রেটিনার রোগ, ও স্থূলত্বের জিনঃ

অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীতে কয়েক রকম মাছ রয়েছে যেগুলো একযোগে ম্যাক্সিকান কেইভ ফিশ নামে পরিচিত। আলোতে না থাকার ফলে এরা ফ্যাকাশে, চক্ষুহীন, প্রখর ঘ্রাণ শক্তি সম্পন্ন, এবং এদের শারীরিক

প্রক্রিয়াগুলো ধীর গতির। এদের নিয়ে কাজ করার একটি সুবিধা হলো এদের অনেকেই বাইরে আলোতে থাকা জ্ঞাতি চক্ষুষ্মান মাছের সঙ্গে প্রজনন করতে পারে। কাজেই এরকম চক্ষুহীন ও চক্ষুষ্মান মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে মাছের ঐ পরিবারের মধ্যে ওদের অন্ধত্বের জন্য দায়ী জিন মিউটেশনগুলো

মেক্সিকান কেইভ ফিশ: অন্ধত্ব গবেষণায় বিশেষ জিন মডেল

বংশানুক্রমে অনুসরণ করা সম্ভব। যেমন একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে উভয়ের মধ্যে প্রজননে জন্মনেয়া বাচ্চাদের ৪০% চক্ষুষ্মান, আর বাকি ৬০% চক্ষুহীন। ইতোমধ্যে দেখা গেছে যে অন্ধকারের কেইভ ফিশের ভ্রূণ অবস্থাতেই আলফা এ ক্রিষ্টালিন নামক বিশেষ জিনের প্রকাশ ঘটা বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে চোখের লেন্সের অবক্ষয় ঘটে। এর জ্ঞাতি একটি মাছ জেব্রা ফিশে এই জিনের একটি মিউটেশনের ফলে চোখে ছানি পড়তে দেখা গেছে। এর অনুকরণে মানুষের ক্ষেত্রে এই জিন উদ্ঘাটিত হলে ছানি পড়া ও রেটিনার সঙ্গে স্নায়ুর অবক্ষয় জনিত যে অন্ধত্ব তার প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। তাছাড়া ধীর জৈব-প্রক্রিয়ার কারণে কেইভ ফিশ মোটা হয়ে পড়ে। স্বল্প পুষ্টি সমৃদ্ধ পরিবেশে থাকতে হয় বলে দীর্ঘকাল একে উপোসে থাকতে হয়। এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্যই শক্তিক্ষয় রোধ করে মোটা থাকতে হয় তাকে। কেইভ ফিশের

কোন্ জিনের কোন্ মিউটেশনে এটি ঘটছে জানতে পারলে তা মানুষের স্থূলত্বের গবেষণায় সহায়ক হতে পারে।

চড়ুই ও মুরগি থেকে কাটা ঠোঁট কাটা তালুর জিনঃ

চড়ুই এর কাছাকাছি অনেক প্রজাতির মধ্যে ঠোঁটের বহু বৈচিত্র রয়েছে এদের মধ্যে ঠোঁট গঠন নিয়ন্ত্রণকারী জিনের ভূমিকাটি সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাতে দেখা গেছে যে একটি বিশেষ প্রোটিন ক্যালমডুলিনের সঙ্গে লম্বা ঠোঁটের সম্পর্ক। লম্বা ঠোঁটের চড়ুই এবং লম্বা ঠোঁটের মুরগির ক্ষেত্রে ভ্রূণ অবস্থায় ক্যালমডুলিনের জিনের অধিক প্রকাশিত হবার সম্পর্ক পাওয়া গেছে। ভ্রূণে ঠোঁট গঠনের এই জিনের মিউটেশনের ফলে কাজটি সম্পূর্ণ হতে ব্যত্যয় ঘটে। বিভিন্ন চড়ুই বা মুরগির ক্ষেত্রে এ জিনের তুলনা করে ও তাদের ঠোঁট গঠন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে মানব শিশুর ভ্রূণ অবস্থায় অনুরূপ অংশের গঠনে ব্যত্যয়ের বিষয়টি গবেষণা করা হচ্ছে। অনুরূপ জিনে এমন মিউটেশনের ফলে এরকম ব্যত্যয় কাটা ঠোঁট ও কাটা তালু নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুর সৃষ্টি করতে পারে।

আমরা যখন মানুষের বা অন্য কোন জীবের ডি এন এ'তে একটি জিন খুঁজি তখন তাকে খুঁজে নেবার জন্য প্রোব বা অনুসন্ধানী ডি এন এ ব্যবহারের বিষয়টি আমরা দেখেছি– যেমন ফিশিং প্রক্রিয়ায় প্রোবকে 'টোপ' হিসাবে ব্যবহার করে। এই প্রোব নানা উৎস থেকে আসতে পারে যেমন জিনটি খুব সক্রিয় হলে তার প্রোটিনটি তৈরি করার এম আর এন এ যথেষ্ট পাওয়া যাবে, সেখান থেকে প্রোব আসতে পারে। আবার ঐ জীবে জিনটি যথেষ্ট সক্রিয় না হলে এম আর এন এ যোগান না থাকলে, সেক্ষেত্রে কোন মডেল জীবে যেখানে ওটি বেশি সক্রিয় তার থেকেই প্রোবটি তৈরি করা যায়। আমরা যদি মানুষের ডি এন এ'তে ইনসুলিন তৈরির জিনটি চিহ্নিত করতে চাই, আর ইঁদুরের ইনসুলিন তৈরির জিন ইতোমধ্যে সনাক্ত করে তার বহু ক্লোন জিন লাইব্রেরীতে মজুদ থাকে, তা হলে সেটি দিয়েই প্রোব তৈরি হতে পারে। মানুষ ও ইঁদুরে এই জিনের খানিকটা তফাৎ থাকলেও প্রোব হিসাবে সংলগ্ন হতে ঐ টুকু তফাৎ বাধা নাও হতে পারে।

জিনের কাজ উদ্ঘাটন

এখন ডি এন এ'র সিকোয়েন্সিং করা সহজতর হয়েছে। তাই বড় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এক একটি জিনের কাজকে উদ্ঘাটিত করা। জীব মডেলের ক্ষেত্রে

অনুরূপ জিনের কাজ জানা থাকলে এক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হয়। তবে শুধু কম্পিউটারে জিন লাইব্রেরী ঘেঁটে এর সুরাহা হয়না, সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবোরেটরিতে সত্যিকার জীব নিয়েও পরীক্ষণ চালাতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ বা উচ্চতর প্রাণির যার ক্ষেত্রে জিনটির কাজ জানতে চাচ্ছি তাকে নিয়ে এরকম পরীক্ষা করার সুযোগ কম– কারণ তাতে জিনটিকে বিকৃত করে দেবার প্রয়োজন হতে পারে, ইচ্ছে করে মিউটেশন সৃষ্টি করে এতে পরীক্ষণের খাতিরে। তাই বরং জীব-মডেলের উপরেই এই পরীক্ষণ করা সমীচিন। জিনের কাজ জানার প্রক্রিয়াটি খুবই মোটা দাগে বলার চেষ্টা করা যাক। প্রথমে জিনটির অনেক কপি করে নিতে হবে। তারপর ল্যাবোরেটরিতে টেষ্ট টিউবেই ঐ জিনে পরীক্ষামূলক মিউটেশনটি সৃষ্টি করা হয়। এবার মিউটেশনযুক্ত জিনটি জীবের দেহকোষে ফেরৎ দেয়া হয়। এ কাজ মূল জীবেও করা যায়, আবার জীব-মডেল হিসাবে ব্যবহৃত অন্য জীবেও করা যায়। এরকম মিউটেশন হওয়া জিনটি দেহে ধারণের ফলে জীবটির কোন্ বৈশিষ্টে কী পরিবর্তন ঘটে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এ ভাবেই ধরা পড়তে পারে জিনটির আসল কাজ এবং তাতে মিউটেশনের ফল।

জিনের কাজ বলতে বুঝায় এই জিন জীবের মধ্যে কোন্ বৈশিষ্ট দিচ্ছে তা। সেটি জিন কয়েক ভাবে করতে পারে, যার মধ্যে বিশেষ প্রোটিন তৈরির মাধ্যমেই কাজ করা সব চেয়ে মুখ্য। এই প্রোটিন সরাসরি একটি গুণ বা বৈশিষ্টের জন্য দায়ী হয়। তাছাড়া জিনটি অন্য কোন জিনের প্রকাশ হওয়া না হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, অথবা পুরো ক্রোমোজোম সন্তানের কাছে যাওয়া না যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেও জীবের মধ্যে বৈশিষ্টটি সৃষ্টি করতে পারে। এসব সবচেয়ে আগে সব চেয়ে ভাল জানা গেছে ঈষ্টের ক্ষেত্রে, কারণ সেখানে জেনোমটি আঁটসাট ও সরল। বিভিন্ন জিনকে নিয়ে মিউটেশন ইত্যাদি সৃষ্টি করার যে সব কৌশল ঈষ্টের ক্ষেত্রে তারও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সরল ও পুরানো জীব-মডেলগুলো নিয়ে কাজ করার এগুলোই সুবিধা।

জিনের সুনির্দিষ্ট কাজ উদ্ঘাটনে মূল প্রক্রিয়াটি হলো জিনের নানা ধরনের মিউটেশন সৃষ্টি করা– ওরমধ্যে বাড়তি বেইস ঢুকিয়ে, বেইস অবলুপ্ত করে, একটি বেইস দিয়ে আরেকটি বদলে দিয়ে, একে বিকল করে তুলে। অধিক ব্যবহৃত জীব- মডেলগুলোর জন্য এরকম সব জিনের সম্ভাব্য সব রকম মিউটেশন তৈরি করে তার জন্য মিউট্যান্ট লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। ওখান থেকে প্রয়োজনীয় মিউটেশন খুঁজে নিলেই হলো। তারপর কোন্ মিউটেশনযুক্ত জিনটি ব্যবহার করলে তার প্রভাবে জীবটিতে কী পরিবর্তন হয়

সেটির পর্যবেক্ষণ থেকেই জিনটির এবং মিউটেশনগুলোর কাজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। জীব-মডেলে এই কাজ জানতে পারলে তার সঙ্গে তুলনা করে অভীষ্ট জীবে, যেমন মানুষে, ঐ জিনের কাজটি উদ্ঘাটন করার সুবিধা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠছে তার সকল জিনের অবস্থান, গঠন ও কাজ নিয়ে একটি রীতিমত বিশ্বকোষ– 'এনকোড' (এনসাইক্লোপিডিয়া অব ডি এন এ ইলেমেণ্টস)। ২০০০ সালে শুরু হয়ে এর মধ্যে মানব জেনোমের নানা জিনের ব্যাখ্যা মডেল থেকে মানুষে যে ভাবে পাওয়া গেছে তা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে, এবং ক্রমে আরো সম্পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে।

ব্যতিক্রমী কিছু বংশগত রোগের জিন

জিন সনাক্তকরণ এবং জিনের কাজ উদ্ঘাটনে যে গবেষণা হচ্ছে তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বিভিন্ন বংশগত রোগের জিনের ক্ষেত্রে। এর মধ্যে অতীতের কতগুলো ব্যতিক্রমী রোগের বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়, যার উপর দীর্ঘ গবেষণা থেকে আমাদের জেনোম মানচিত্র সমৃদ্ধ হয়েছে।

আলকাপটোনুরিয়াঃ

বহুদিন ধরে লক্ষ্য করা এই বংশগত অসুখে সাধারণ কয়েকটি খাদ্য খাওয়ার পর মুত্র কালো ও দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। পরে বুঝা গেছে বিশেষ কিছু এনজাইমের অভাবে ঐ খাদ্য ঠিক মত পরিপাক হয়না বলেই এমনটি ঘটে। ১৯৯৫ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে যে অ্যাসপারজিনাস নামক এক ধরনের ফাঙ্গাসে বিশেষ মিউট্যান্ট জিনের উপাস্থিতি থাকলে বিশেষ ক্যামিকালের সংস্পর্শে ফাঙ্গাসটিতে ঘন বেগুণি রং বস্তু জমে। এমন মিউট্যান্ট ফাঙ্গাসের জেনোমে যে অংশ স্বাভাবিকের থেকে আলাদা তা খুঁজে বের করা হলো। দেখা গেলা ত্রুটি সৃষ্টির প্রোটিনটির কোড এখানেই রয়েছে। সন্দেহ হলো যে মানুষের আলকাপটোনুরিয়া রোগের ক্ষেত্রেও হয়তো অনুরূপ জিনেরই ভূমিকা রয়েছে– রঙ সৃষ্টির ভঙ্গিটি যখন এক। এই জিনকে প্রোব হিসাবে ব্যবহার করে মানব জেনোম থেকে 'ফিশিং' করে মানুষের ক্রোমোজোম-৩ এ এমন জিন পাওয়া গেল যা ফাঙ্গাসেরটির সঙ্গে ৫২% অনুরূপ। আর রোগহীন এবং রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে এ জিনের তুলনা করে দেখা গেল রোগাক্রান্ত মানুষে এই জিনের একটি মাত্র বেইস জোড়া ভিন্নতর থাকে– যার ফলেই এই অনর্থ।

সিষ্টিক ফাইব্রোসিস (সি এফ):

এ রোগ ইউরোপে যথেষ্ট দেখা যায়– প্রতি ২৫ হাজার জনে এক জনে এটি হবার সম্ভাবনা। চিকিৎসা ঠিক মত না হলে এতে রোগী অল্প বয়সে মারা যায়– কারণ ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমা আর খাদ্য হজম না হওয়া। গবেষণায় দেখা গেছে যে কোষের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে নানা দরকারী লবণ কোষে আসা যাওয়া করানোর জন্য যে প্রোটিন-পাম্প থাকে তাতে সমস্যা দেখা দিয়েই এই রোগ হয়। আক্রান্ত পারিবারগুলোতে অনুসরণ করে বুঝা গেছে যে রোগটির বৈশিষ্ট গৌণ ধরনের, অর্থাৎ এর বিকৃত জিনের এক কপি থাকলে এটি হয়না, বাবা ও মা উভয়ের কাছ থেকেই বিকৃত জিন পেলেই রোগ দেখা দেয়। শুধু এক কপি পেলে বাহকের কাজ করে মাত্র। তা ছাড়া এটি স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ করেনা– তার মানে জিনটি সেক্স-ক্রোমোজোমে নাই, বরং অন্যান্যে ইঙ্গিত থেকে জানা গেছে এই জিন ক্রোমোজোম-৭ এ রয়েছে। সিকোয়েন্সিং করে দেখা গেল এতে এমন একটি প্রোটিনের কোডিং হয় যা কোন কোন প্রাণির কোষ-ঝিল্লির পাম্প অংশে পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে সিএফ রোগ পরিবারে যেই প্যাটার্নে বিস্তার লাভ করে ঐ প্রাণিগুলোতে ঐ জিন ওভাবেই বংশগত বিস্তার লাভ করে। ১৯৯০ সালে মানুষের জেনোমে অনুরূপ জিন খুঁজে পাওয়া গেল। দেখা গেল এতে একটি কোডনের অর্থাৎ তিনটি মাত্র বেইসের ঘাটতি থাকায় যে মিউটেশন হয় তাই সি এফ রোগের কারণ ঘটায়। অর্থাৎ ব্যাপারটি ঐ প্রোটিনটিতে একটি মাত্র এমাইনো এসিড ঘাটতির ফলেই ঘটে। এতে প্রোটিনটির আকৃতি এমন ভাবে বদলে যার যে এটি কোষের ঝিল্লি পাম্পে নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে না পেরে অনর্থটি ঘটায়।

ডি এন এ পরীক্ষা করে জিনে এই মিউটেশনটি, অর্থাৎ তাতে তিনটি বেইসের কমতি নির্ণয় করে, রোগ দেখা দেবার আগেই এর ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। ডি এন এ'র যথাযথ অংশের টুকরাগুলোর অসংখ্য কপি তৈরি করে তাদের ইলেকট্রোফোরেসিস করা হলে অনাক্রান্ত স্বাভাবিক ক্ষেত্রে টুকরা অপেক্ষাকৃত ভারি থাকে বলে প্যাটার্নে তা বেশি দূরে যায়না, কাছেই একটি দাগে জমে। রোগাক্রান্তের ক্ষেত্রে মিউট্যান্ট জিন অপেক্ষাকৃত হালকা বলে (তিন বেইস ঘাটতি থাকাতে) এবং তার দুই কপিই মিউট্যান্ট হওয়াতে প্যাটার্নে দূরে একটি দাগে জমে। আর বাহকের ক্ষেত্রে এক কপি স্বাভাবিক এবং এক কপি মিউট্যান্ট বলে তা একটি কাছে ও একটি দূরে এই দুটি দাগে জমে। অর্থাৎ শুধু প্যাটার্নটি দেখেই বুঝা যায় কার রোগ হবেনা, কার হবে, এবং কে এটি বহন করছে।

হান্টিংটন রোগ:

এটি একটি স্নায়ুতন্ত্রের বংশগত রোগ যা মাঝ বয়সে প্রকাশ পায়। স্নায়ু গোলযোগের ফলে রোগীর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে নড়াচড়া হতে থাকে এলোমেলো নাচের মত। শেষ অবধি স্নায়ু বিশৃঙ্খলায় রোগীর মৃত্যু হয়। রোগীর পরিবারে অনুসরণ করে দেখা গেছে রোগটি একটি মুখ্য বৈশিষ্ট হিসাবে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ বাবা বা মা যে কারো কাছ থেকেই এক কপি পেলেই সন্তানের এটি হবেই, দুই কপি পেলে তো কথাই নাই। তাই এই রোগ কারো থাকলে পরিবারের মধ্য দিয়ে ভীষণ ছড়ায় এটি– কোন একজন পূর্বপুরুষের কারণেই পুরো বংশের মধ্যে চলে যায়। এর সাম্প্রতিক গবেষণায় আক্রান্ত এলাকায় এ রোগহীন ও আক্রান্ত অনেকের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেকের ডি এন এ টুকরা টুকরা করা হয়েছে। ইতস্তত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টুকরা নিয়ে রোগহীন ও আক্রান্তের কোন টুকরার কোথাও বড় ধরনের কোন পার্থক্য রয়েছে কিনা লক্ষ্য করা হলো। এতে ক্রোমোজোম-৪ এর প্রান্তে এমন একটি মার্কার খুঁজে পাওয়া গেল যা শুধু আক্রান্তের মধ্যে পাওয়া যায়। এতে জিনের অবস্থানটি নিশ্চিত হলো বটে, তবে জিনের বিস্তারিত উদ্ঘাটিত হলোনা।

১৯৯৩ সালে সিকোয়েন্সিং এর ফলে অবশেষে আসল জিনটিও উদ্ঘাটিত হলো। দেখা গেল আক্রান্ত জিনের মাঝখানে CAG অর্থাৎ এমাইনো এসিড গ্লুটামাইনের কোডনটি বার বার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। যার ক্ষেত্রে যত বেশি বার পুনরাবৃত্তি হয় অসুখটি তত কম বয়সে প্রকাশ পায়। এর বিকৃত প্রোটিন হান্টিংটিনের মাঝখানে গ্লুটামাইন বার বার পুনরাবৃত্ত থাকে। এ প্রোটিন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে জমতে থাকে। দেখা গেছে এরকম গ্লুটামাইন সমৃদ্ধ প্রোটিনের ফলে আরো কয়েক রকমের বংশগত স্নায়বিক রোগ হয়ে থাকে। এ ভাবে মানব জেনোমের নানা অংশের উদ্ঘাটন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তার জেনোম মানচিত্র সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এতে নানা বৈশিষ্টের জিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে ইতস্তত কয়েকটি উল্লেখ করা যায়। হাঁপানির কারণ ঘটায় বেশ কয়েকটি জিন। ক্রোমোজোম-৫ এ রয়েছে এর আটটি, ক্রোমোজোম-৬ ও ১২তে দুটি করে, আর ক্রোমোজোম-১১, ১৩ ও ১৪ তে রয়েছে একটি করে। কৈশোরে বয়োসন্ধির পরিবর্তনগুলো ঘটার জন্য দায়ী জিন রয়েছে ক্রোমোজোম-১০এ। প্রেরণা, উদ্দীপনা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার প্রোটিন ডোপামাইন নিয়ন্ত্রণের জিন আছে

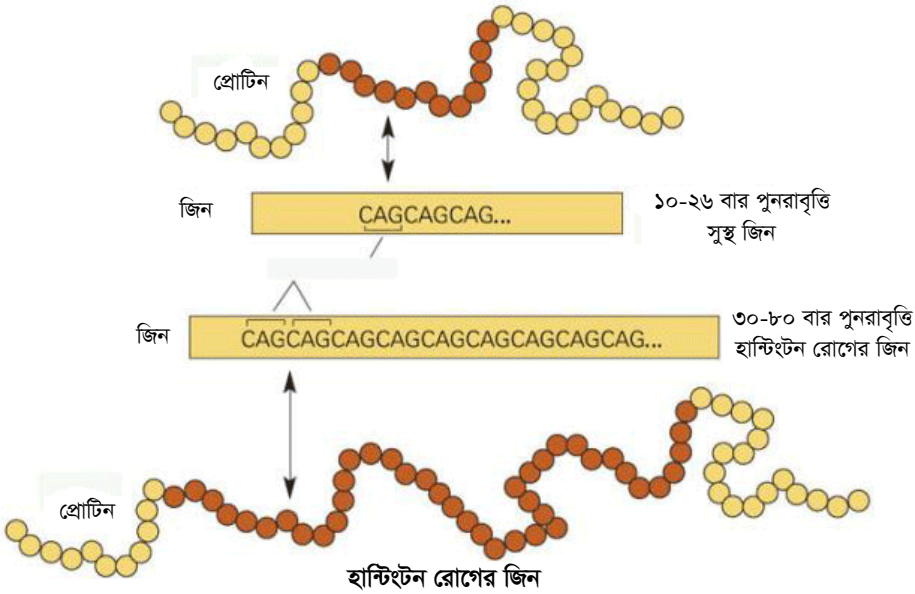

হান্টিংটন রোগের জিন

ক্রোমোজোম- ১১ এ। বার্ধ্যক্যজনিত লক্ষণগুলোর একটি নিয়ন্ত্রক জিন রয়েছে ক্রোমোজোম-১৪ এ। রক্ত নালিতে কোলেষ্টোরোল জমা কমাতে সাহায্য করে ক্রোমোজোম-১৯ এর একটি জিন। এরকম সব ক্ষেত্রে শুধু ক্রোমোজোম চিহ্নিত হয়নি, বরং ক্রোমোজোমের ঠিক কোন্ অংশে জিনটি তাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে জেনোম মানচিত্রের মধ্যে। সম্পূর্ণ মানব জেনোম উদ্ঘাটনে মোট জিন পাওয়া গেছে ২৯,২৯০টি। এটি অনেক সরলতর জীবের তুলনায় যথেষ্ট বেশি হলেও, আবার অতি সাধারণ কিছু জীবের কোষে এর থেকে বেশি জিন রয়েছে। মানব জেনোম মানচিত্রের অনেকগুলো জিনের কাজ এখন সুপ্রমাণিত, অনেকগুলোর কাজ এখনো জানা যায়নি।

জিন নিয়ে কারিগরি

ডিএনএ কাটা আর জোড়া দেয়া

ডিএনএ সম্পর্কে গবেষণার একেবারে প্রথম দিকে প্রধান কাজ ছিল এটি যেমন আছে তেমন অবস্থায় এর গঠন ও কাজকর্ম বুঝতে পারা। সেটি কিছুটা করার পরই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই ডিএনএ'কে কাটা, জোড়া দেয়া ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। শুধু তাই নয় ডিএনএ'কে বদলাবার, একের ডিএনএ অন্যের দেহে নিয়ে গিয়ে তাদের জৈব বৈশিষ্ট বদলে দেবার, মত অসম্ভব কাজের কৌশলও তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। এভাবে ডি এন এ নিয়ে কারিগরি করাটাই জিন কারিগরি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং), যা আজকের দিনের প্রযুক্তির মধ্যে অত্যন্ত সক্ষম ও দুঃসাহসী প্রযুক্তি হিসাবে বিবেচিত।

ব্যাকটেরিয়া থেকে নেয়া বিশেষ বিশেষ এনজাইম যে ডি এন এ'কে বিশেষ বিশেষ জায়গায় কেটে ফেলতে পারে তা আমরা দেখেছি। এরকম প্রত্যেকটি কর্তনকারী এনজাইমের জন্য সুনির্দিষ্ট বেইস ক্রম দিয়ে কাটার জায়গা নির্ধারিত হয়। ডি এন এ'র যেখানেই পর পর বেইসগুলো একের পর এক এই ক্রমে থাকবে সেখানেই ঠিক নির্দিষ্ট দুই বেইসের মাঝখানে এটি কেটে দেবে– ডাবল হেলিক্সের দুটি সূত্রেই ওভাবেই কাটবে। ডিএনএ'তে যত ঘন ঘন এই কাটার জায়গাটি থাকবে টুকরার সংখ্যা এত বেশি হবে। মজার ব্যাপার হলো এরকম কাটার জায়গায় ডিএনএ'র বিপরীত দুটি সূত্রে বেইসক্রম একটি অপরটির ঠিক উল্টো ক্রমে হয়– একটি সূত্রের এ প্রান্ত থেকে পড়লে যে ক্রমে বেইসগুলো আসবে অন্য সূত্রে অপর প্রান্ত থেকে পড়লে সেই ক্রমেই আসবে। এতে যে ব্যাপারটি হয় দুই সূত্রে একই দুই বেইসের মাঝে কাটতে গিয়ে কাটা জায়গার দুদিকে দুটি ধাপ সৃষ্টি হয়। যেমন BamHI নামের কর্তনকারী এনজাইমের কাটার জায়গাটি একটি সূত্রে হয় GGATCC, অন্য সূত্রে হয় তার বিপরীতে থাকা উল্টো ক্রমে CCTAGG। উভয় সূত্রে G আর G এর মাঝখানেই থাকে কাটার নির্দিষ্ট স্থান। তাই প্রথম সূত্রটি দ্বিতীয় সূত্রের কয়েক বেইস বামে কাটবে, এবং তার ফলে এখানে উভয় পরের পরস্পর বিপরীত ধাপ বা খাঁজের সৃষ্টি হবে (পরের চিত্রের মত)। যদি কখনো ঐ টুকরা দুটি বা অনুরূপ দুটি টুকরা একে অপরের কাছাকাছি আসে তা হলে ঐ দুই ধাপ একের সঙ্গে এক খাপে খাপে লেগে আবার আগের মত হয়ে যাবে। ধাপের মধ্যে পরস্পর

বিপরীত বেইসগুলো সম্পূরক হওয়াতে এভাবে জোড় নিতে সুবিধাই হয়। কাটা জায়গায় প্রান্তগুলো এভাবে জোড় নিতে চায় বলে এদেরকে 'আঠালো প্রান্ত' বলা হয়। অবশ্য সব সময় যে এরকম ধাপে ডি এন এ কাটবে এমন কোন কথা নাই।

নির্দিষ্ট এনজাইম দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় কর্তন।
এর ফলে দুই টুকরায় খাঁজ সৃষ্টি।

ধাপের সঙ্গে যথাযথ ধাপ মিলে জোড় নেয়া ডি এন এ'কে জোড়ার ওখানে পরস্পর নিঁখুত ভাবে লাগিয়ে দেয়ার জন্য রয়েছে আর এক ধরনের এনজাইম যাদের বলা হয় লাইগেজ বা জোড়া দেবার এনজাইম। ধাপ সৃষ্টি না হওয়া কাটা টুকরাগুলোকেও বিশেষ ক্ষেত্রে এরা জোড়া দিতে পারে। কর্তনকারী এনজাইমকে যদি ডি এন এ'র জন্য 'কাঁচি' বলি তা হলে এই এনজাইমকে বলতে হবে তার 'আঠা'। এভাবে কাঁচি আর আঠা দুই-ই হাতে চলে আসার পর বিজ্ঞানীদের পক্ষে ঠিক ঠিক জায়গাতে ডি এন এ'কে কাটতে আর জোড়া দিতে আর কোন অসুবিধা থাকলোনা। জিন কারিগরির দুটি প্রাথমিক কৌশল তাঁদের হাতে চলে এলো। মনে রাখতে হবে এসব কাঁচি আর আঠা নেহাতই জৈবরাসায়নিক দ্রব্য মাত্র– ডি এন এ'র সঙ্গে মেশালে আণবিক আয়তনের ক্ষুদ্র

আকারের মধ্যেই তার কাজ করে টেষ্ট টিউবের মধ্যে, একই সঙ্গে অসংখ্য ডি এনএ'র মধ্যে।

এক খান থেকে কেটে নিয়ে অন্য খানে জোড়া

জিন কারিগরির একটি বড় কাজ হলো এক জীব থেকে ডি এন এ'র কোন অংশ কেটে নিয়ে (যেমন একটি জিন) অন্য জীবের ডি এন এ'তে নিয়ে সেটি জুড়ে দেয়া। এভাবে জিন স্থানান্তরিত করে এক জীবের বৈশিষ্ট অন্য জীবে সৃষ্টি করাটাই জিন কারিগরির বড় বাহাদুরী। কাটা ও জোড়া দেবার কাজগুলো মূলত ল্যাবোরেটরিতে টেষ্ট টিউবের ভেতর করলেও শেষ অবধি স্থানান্তরিত অংশ সহ ডি এন এ একটি 'ধারক' (হোষ্ট) জীবের দেহকোষে প্রতিস্থাপন করতে হয়। সেখানে কোষগুলোর বিভাজনের প্রক্রিয়ায় সাধারণ ডি এন এ'র সঙ্গে জিন-স্থানান্তরিত ডি এন এ'রও অনেক কপি বা ক্লোন তৈরি হতে থাকবে।

স্থানান্তরিত করার জিনটি কোন উপযুক্ত 'দাতা' জীব থেকে আসতে হবে। তাই প্রথম কাজ হলো দাতার কিছু জীবকোষ নিয়ে তার ডি এন এ থেকে কাম্য জিনটি কেটে নেয়া। এবার কোন রকম 'বাহকের' (ভেক্টর) ডি এন এ পেতে হবে যার সঙ্গে এই কাম্য জিনটি জুড়তে হবে স্থানান্তরের সুবিধার জন্য। বিভিন্ন রকম 'বাহক' ব্যবহার করা যায়। বাহক হিসাবে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড এবং কোন কোন ভাইরাস। প্লাজমিড হলো এক ধরনের খুব স্বল্পদৈর্ঘ ডি এন এ রিং যা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় থাকে। আর ভাইরাস তো মোটামুটি একটি প্রোটিন আবরণে ঢাকা ডিএনএ বৈ আর কিছু নয়। ভাল বাহক হতে হলে কতগুলো শর্ত পূরণ করা চাই। এদের বেশ কিছু কাটার জায়গা থাকতে হবে যেখানে এক বা একাধিক কর্তনকারী এনজাইম দিয়ে ডি এন এ'কে কেটে ফেলা যায়। এটিকে একটি ধারক জীবে গিয়ে নিজের অনেক প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারতে হবে। তাছাড়া এতে এমন কোন সহজাত গুণ থাকতে হবে যার ফলে এটি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে তা সহজে ধরা পড়ে। ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড এবং বিভিন্ন ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডি এন এ স্থানান্তরের বাহক হবার এসব শর্ত ভালভাবেই পূরণ হয়। উপযুক্ত প্লাজমিড অবশ্য শুধু ব্যাকটেরিয়া থেকে নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ঈষ্ট থেকেও পাওয়া যায়।

ধরা যাক মানুষের একটি জিন এভাবে অনেক ক্লোন বা প্রতিলিপি তৈরির মাধ্যমে অন্য কোন জীবে স্থানান্তর করতে হবে। ল্যাবোরেটরিতে টেষ্টটিউবে মানব জেনোম থেকে কাম্য জিনটি চিহ্নিত করা হলো। কর্তনকারী এনজাইম

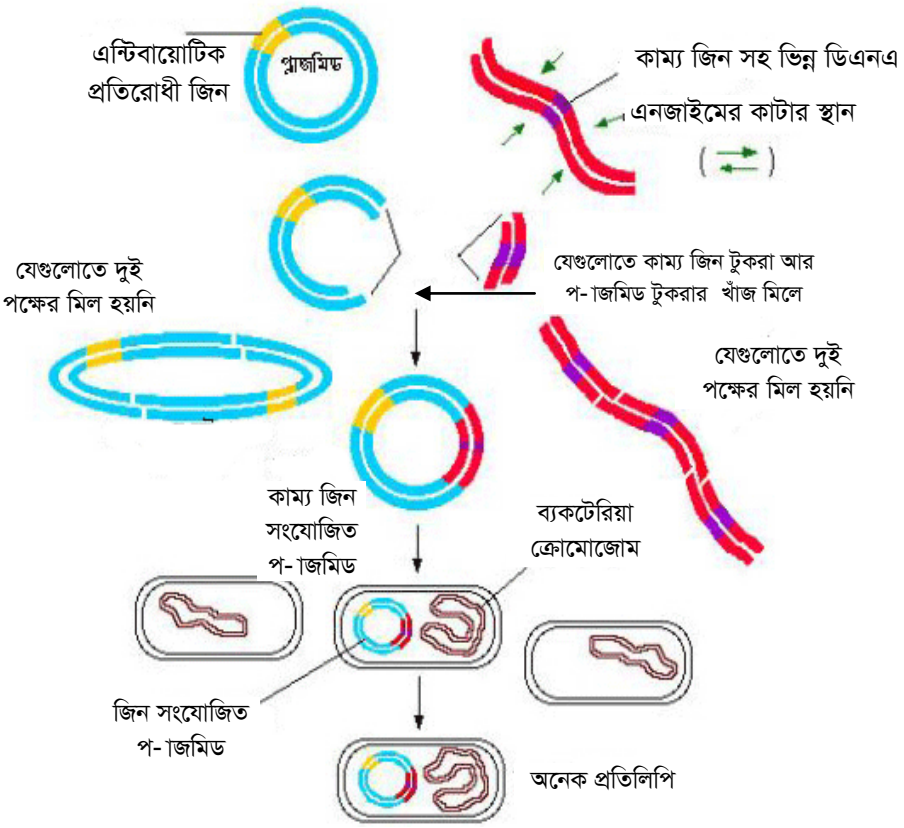

দিয়ে তা অনেক সংখ্যায় মূল ডি এন এ থেকে কেটে নেয়া হয়। বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হবে কোন ব্যাকটেরিয়া থেকে নেয়া প্লাজমিড। এজন্য যথাযথ ব্যাকটেরিয়া থেকে উপযুক্ত প্লাজমিড পৃথক করে নিতে হবে– যেন টেষ্টটিউবে এরকম অনেক প্লাজমিড থাকে। যেই কর্তনকারী এনজাইম মিশিয়ে মানব জেনোম থেকে কাম্য জিনটি কেটে নেয়া হয়েছিল সেই একই এনজাইম মিশিয়ে প্লাজমিডগুলোর ডি এন এ রিং কাটতে হবে– একই রকম নির্দিষ্ট কাটার জায়গায় প্লাজমিড রিংগুলো কেটে টুকরা টুকরা হবে। একই রকম কাটার জায়গা হওয়ার ফলে মানব ডি এন এ থেকে কাটার সময় কাম্য জিনের টুকরার প্রান্তে যে রকম ধাপ সৃষ্টি হয়েছিল– প্লাজমিডের কোন কোন টুকরায় তার সঙ্গে খাপ খাওয়া বিপরীত ধাপ সৃষ্টি হবে। তাই কেটে নেয়া মানব কাম্য জিনের অসংখ্য টুকরার সঙ্গে কাটা অসংখ্য প্লাজমিড টুকরা একত্র করে মিশালে কাম্য মানব জিনের

টুকরার প্রান্ত বিপরীত ধাপের সেই 'আঠালো প্রান্তের' কারণে তা কোন কোন কাটা প্লাজমিডের সঙ্গে জোড় নেয়। ঐ মিশ্রণের সঙ্গে ডি এন এ জোড়া দেয়ার এনজাইম লাইগেজও মিশালে জোড়াগুলো স্থায়ী হয়। এভাবে তৈরি হয় আবার রিং আকৃতি নেয়া পুনর্গঠিত (রিকম্বিনেন্ট) প্লাজমিড, যার মধ্যে এখন কাম্য জিনটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে দাতার ডি এন এ টুকরার প্রান্ত আর প্লাজমিডের টুকরার প্রান্ত খাঁজে মিলবেনা সেগুলো পুনর্গঠিত প্লাজমিডে অংশ নেবেনা, আলাদা থেকে যাবে, ঐ মিশ্রণের মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লাজমিডের মধ্যে এমন একটি অংশ থাকে যা বিশেষ এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী– যেমন টেট্রাসাইক্লিন প্রতিরোধী। এটি পুনর্গঠিত প্লাজমিডে থাকে এবং এর সঙ্গে গ্রাহক কোষে যায়। আসলে ব্যাকটেরিয়া প্লাজমিডকে ব্যবহারই করে তার এন্টিবায়োটিক নিরোধী গুণটিকে অন্য ব্যাকটেরিয়াকে দেয়ার জন্য। আমরা দেখবো কীভাবে এই গুণটি এখন বেশ কাজে লেগে যায়।

একটি ডিশের মধ্যে উপযুক্ত মাধ্যমে ধারক হিসাবে নির্ধারিত একটি ব্যাকটেরিয়ার কালচার (চাষ) করা হয়। এর সঙ্গে পুনর্গঠিত প্লাজমিড সহ সেই ডিএনএ মিশ্রণটিও মিশিয়ে দেয়া হয়। কালচার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির সময় অনেক ব্যাকটেরিয়া ওখান থেকে পুনর্গঠিত প্লাজমিডগুলো নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং নিজেরা বিভাজিত হবার মাধ্যমে ঐ পুনর্গঠিত প্লাজমিডগুলোর অনেক ক্লোন (প্রতিলিপি) তৈরি করে। ওখানে টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক দিয়ে বিশোধন করলে যে সব ব্যাকটেরিয়া কোষ ঐ পুনর্গঠিত প্লাজমিড গ্রহণ করেছে প্লাজমিডের টেট্রাসাইক্লিন প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে ওগুলো বেঁচে থাকবে। যেগুলো এই প্লাজমিড গ্রহণ করেনি তা এই বিশেষ এন্টিবায়োটিক নিরোধী নয় বলে মরে যাবে। এভাবে আমরা কাম্য জিন সহ পুনর্গঠিত প্লাজমিডের ক্লোনগুলোকে আলাদা করে নিয়ে অনুসরণ করতে পারছি।

পি সি আর পদ্ধতি সহজ হবার পর জিন-কারিগরিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখন কাম্য জিন সহ পুনর্গঠিত প্লাজমিডের ক্লোন করার জন্য তাকে ধারক ব্যাকটেরিয়ায় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থাকছেনা, পি সি আর এর মাধ্যমেই তার অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করে নেয়া যাচ্ছে। তারপর এগুলো গ্রহীতা কোষে বা গ্রহীতা জীবের কাছে স্থানান্তরিত করা যাচ্ছে।

কাম্য জিনের ব্যবহার

যেভাবেই প্রতিলিপি তৈরি হোক না কেন জিন-কারিগরিতে পুনর্গঠিত ডি এন এ'র নানা রকম ব্যবহার হতে পারে– উচ্চতর নানা রকম জীবের ক্ষেত্রেও।

একটি প্রধান ব্যবহার হলো কোন উদ্ভিদ ও প্রাণির টিশ্যু কালচারে পুনর্গঠিত ঐ প্লাজমিডের মাধ্যমে কাম্য জিন ঢুকিয়ে জিনের প্রকাশ সম্পর্কে গবেষণা করা। কী পরিস্থিতিতে একটি জিন প্রকাশিত হতে পারে, কী পরিস্থিতিতে পারেনা এর মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব। প্রকাশিত হলে ঐ কাম্য জিনের প্রভাবে ঐ উদ্ভিদ বা প্রাণির কোন বৈশিষ্ট পরিবর্তিত হবে বা নূতন বৈশিষ্ট দেখা দেবে। জিনটি প্রকাশিত না হলে এমনটি হবেনা। বাস্তব প্রয়োগে ওরকম পুনর্গঠিত ডিএনএ'র একটি বড় ব্যবহার হলো ঐ কাম্য জিনের দ্বারা কাম্য নূতন প্রোটিন তৈরির ব্যবস্থা করা– যে প্রোটিন চিকিৎসায়, পুষ্টিতে, বা শিল্প ক্ষেত্রে কাজে লাগে। জিনের বার্তা অনুযায়ীই প্রোটিন তৈরি হয়। তাই এই নূতন জিনের বার্তা অনুযায়ী নূতন কাম্য প্রোটিন তৈরি হতে পারে হয় ব্যাকটেরিয়ায়, নয় উদ্ভিদ বা প্রাণির কোষ-কালচারের মধ্যে তার কোষে, অথবা সামগ্রিকভাবে ঐ উদ্ভিদ বা প্রাণির মধ্যে, যা ঐ কাম্য জিন গ্রহণ করার মাধ্যমে জিন-স্থানান্তরিত উদ্ভিদ বা প্রাণিতে পরিণত হয়। ভ্রূণ অবস্থার প্রথম দিকে কাম্য জিন স্থানান্তর করলে ভ্রূণকোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঐ জীবের নানা কোষে ঐ জিন গিয়ে তার সামগ্রিক জেনেটিক গঠন পরিবর্তিত হবে। তা ছাড়া তার জননকোষেও গিয়ে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও এই কাম্য জিন নিয়ে যাবে। প্রোটিন তৈরি ছাড়াও জিন স্থানান্তরিত উদ্ভিদ বা প্রাণির আরো বহুতরো প্রয়োজন রয়েছে, যেমন একে বিশেষ বিশেষ নূতন বৈশিষ্ট দিয়ে আমাদের কাজে লাগানোর জন্য। 'জিন স্থানান্তরিত' এরকম জীবের বিস্তারিত আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো। তবে সাধারণ ভাবে কাম্য জিন স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি।

সচরাচর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জিন স্থানান্তরের জন্য এগ্রোব্যাকটেরিয়াম টুমেফেসিন নামক ব্যাকটেরিয়ার এমন প্লাজমিড বাছাই করা হয় যার একটি কাজ হচ্ছে উদ্ভিদে টিউমার সৃষ্টি করা। এজন্য এদের বলা হয় টিউমার ইনডিউসিং অর্থাৎ টিউমার সৃষ্টিকারী প্লাজমিড, সংক্ষেপে– Ti প্লাজমিড। Ti বহনকারী এগ্রোব্যাকটেরিয়াম এভাবে উদ্ভিদকে আক্রান্ত করার মাধ্যমে তার জীবকোষে কাম্য জিনকে নিয়ে যেতে পারে। উদ্ভিদের কোষ কালচার বা টিশ্যু কালচারেও ভ্রূণের মধ্যে প্লাজমিড বাহিত কাম্য জিন সংযোজন সম্ভব। তা ছাড়া নির্দোষ ভাইরাসকে কাম্য জিনের বাহক হিসাবে ব্যবহার করলে এবং উদ্ভিদকে ঐ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করলেও একই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাইরাসের একটি উদাহরণ হলো সচরাচর পরিচিত কলিফ্লাওয়ার মোজেক ভাইরাস। প্লাজমিড ও ভাইরাসের মাধ্যমে প্রাণির ক্ষেত্রেও জীবকোষে

কাম্য জিনের সংযুক্তি ঘটানো যায়। এসব ক্ষেত্রে ভাইরাস দিয়ে ইচ্ছাপূর্বক আক্রান্ত করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, কারণ আক্রান্ত জীবকোষকে কাবু করে নিজের বংশবৃদ্ধি করার যে বার্তা ভাইরাসের নিজের ডি এন এ'তে থাকে তা আগেই কেটে বাদ দেয়া হয়। ঐ অনিয়ন্ত্রিত বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটিই ভাইরাস আক্রান্ত জীবে রোগের সৃষ্টি করে। ডি এন এ'র বদলে আর এন এ বহনকারী রিট্রোভাইরাসও একই ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কাম্য জিনের বাহক হিসাবে। উল্লেখযোগ্য যে ভাইরাস ডি এন এ দিয়ে যা করে, রিট্রোভাইরাস আর এন এ দিয়ে সেই একই প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ ঘটায়।

তবে জিন স্থানান্তরের আরো আধুনিক ও চমকপ্রদ পদ্ধতি হলো কাম্য জিনকে সূক্ষ্ম যান্ত্রিক উপায়ে সরাসরি উদ্ভিদ বা প্রাণির জীবকোষে ঢুকিয়ে দেয়া। এটি কয়েক ভাবে করা যায়। মাইক্রো-ইনজেকশন পদ্ধতিতে খুবই সরু সূঁচের মাধ্যমে ডি এন এ জীবকোষে ঢুকানো হয়। কাজটি অণুবীক্ষণে দেখে দেখে করা হয়। এ সময় একটি ক্ষুদ্র কাঁচ নল থেকে বায়ু শুষে নিয়ে শোষনের শক্তিতে জীবকোষটিকে কাঁচ নলের মুখে স্থির রাখা হয়, এবং সে অবস্থায় খুবই দক্ষ অকম্পিত হাতে মাইক্রো-ইনজেকশনের অতি সরু সূঁচ এ কোষে ঢুকানো হয়।

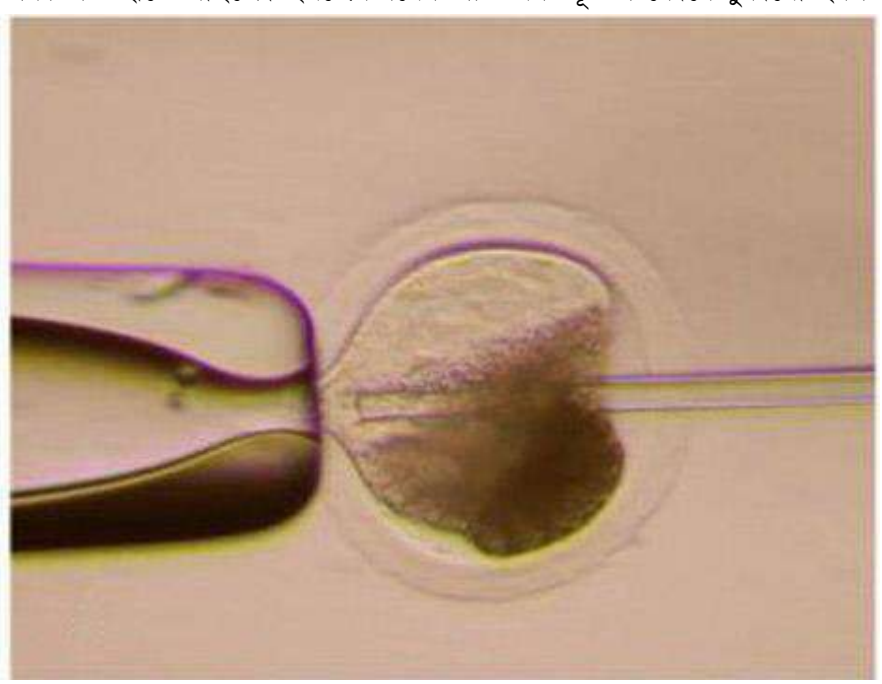

মাইক্রো-ইনজেকশনের মাধ্যমে কোষের ডিএনএতে জিন সংযোজন (অণুবীক্ষণে দেখা)

মাইক্রো-প্রজেক্টাইল নামের আর একটি পদ্ধতিতে বন্দুকের বুলেট ছুঁড়ে দেয়ার মত অতি ক্ষুদ্র একটি টাংষ্টেন অথবা স্বর্ণের গোলক জীবকোষ তাক করে ছুঁড়ে দেয়া হয়। ঐ গোলকের গায়ে কাম্য ডি এন এ' টি মাখা থাকে। উদ্ভিদের কোষদেয়াল অপেক্ষাকৃত পুরু হওয়াতে প্রাণির জীবকোষেই সাধারণত এসব যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলো বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে উদ্ভিদকোষের পুরু দেয়াল বিশেষ এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে ফেলে তাতে কাম্য জিন ঢুকানোর ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে কোষের থেকে যাওয়া পাতলা ঝিল্লির মধ্যে বৈদ্যুতিক কারেন্টের সাহায্যে সূক্ষ্ম ছিদ্র সৃষ্টি করে এই ঢুকার সুবিধা করে দেয়া হয়।

কাম্য জিন সংগ্রহের কৌশল

এ পর্যন্ত কাম্য জিনটি আমরা দাতা জীবের ডি এন এ থেকে কেটে নেবার বিষয়টি দেখেছি। কিন্তু প্রায়ই এটি ডি এন এ হিসাবে না নিয়ে আর এন এ হিসাবে নেয়াই সুবিধা জনক। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এমন জিনে আগ্রহী হবো যা দাতার মধ্যে ভাল ভাবে 'প্রকাশিত' হয়– অর্থাৎ যার বার্তা থেকে প্রোটিন তৈরির প্রবণতা যথেষ্ট থাকে। প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় ডি এন এ'র বার্তা নকল করার জন্য এম আর এন এ বা ম্যাসেঞ্জার আর এন এ'র কাজের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে প্রোটিন তৈরির প্রথম ধাপ হিসাবে এই জিনের প্রচুর এম আর এন এ ও দাতার জীব কোষে পাওয়া যাবে, যা সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। তাছাড়া ডি এন এ'তে ইনট্রন ইত্যাদি যে প্রচুর বেকার অংশ থাকে তা এম আর এন এ'তে আসেনা। ফলে বেকার অংশের ঝামেলামুক্ত থাকার কারণে পরে পুনর্গঠিত ডি এন এ তৈরি সহজতর হয়। দাতার ঐ এম আর এন এ অবশ্য স্থানান্তরের আগে পুনরায় তার সম্পূরক করার মাধ্যমে ডি এন এ'তে পরিণত করতে হয়। তবে সব সময় দাতা থেকে এম আর এন এ নিলেও হয়না। কারণ অনেক সময় মূল জিনটির সঙ্গে ডি এন এ'র এমন অংশও স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় যা এম আর এন এ'তে যায়না। যেমন জিনটি প্রকাশিত হবার সম্ভাবনার নিয়ন্ত্রণকারী অংশ প্রায়শ এর সঙ্গে থাকাটি জরুরী হয়। কখনো ইনট্রনেরও প্রয়োজন হতে পারে। এগুলো এম আর এন এ'তে যায়না বলে সেক্ষেত্রে মূল ডি এন এ'টিরই দরকার হতে পারে।

দাতা থেকে কাম্য ডি এন এ'ই নিই কিংবা এম আর এন এ'ই নিই, তার জীব কোষের জেনেটিক অংশ থেকে যথাযথ প্রোবের সাহায্যে এগুলো আগে চিনে নিতে হয়। আজকাল জিন লাইব্রেরিতেই সংরক্ষিত পাওয়া যায় অসংখ্য জিন– যার থেকেও প্রোব দিয়ে কাম্য জিন চিহ্নিত করে বেছে নেয়া যায়। যে জিনটি

চাই তার অংশ বিশেষ আমাদের হাতে থাকলে তাকেই প্রোব হিসাবে ব্যবহার করা যায়, অথবা তার এম আর এন এ'কে। তা ছাড়া প্রোবটি কৃত্রিম ভাবে সংশ্লেষিত করে নেয়া আজকাল সম্ভব। যেমন যদি কাম্য জিনটি যে প্রোটিন তৈরি করে তার এমাইনো এসিড পরম্পরায় কিছুটাও জানা থাকে তা হলে সেই অনুযায়ী বেইস পরম্পরায় জেনে ডি এন এ'র ঐ অংশ সংশ্লেষিত করে নেয়া সম্ভব। সেটিই প্রোব হিসাবে ব্যবহার করা চলে। আর একটি চমকপ্রদ প্রোব হচ্ছে ডি এন এ বা আর এন এ'কে নয়, বরং প্রোটিন এন্টিবডিকে ব্যবহার করা। বিজাতীয় বিশেষ কোন কিছু শরীরে ঢুকলে তার মধ্যে থাকা বিশেষ বিশেষ প্রোটিনের (এন্টিজেন) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে একে ধ্বংস করার জন্য জীব যে বস্তু যে তৈরি করে তা হলো এন্টিবডি। কাম্য জিনের তৈরি যে প্রোটিন তা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক প্রোটিনের সঙ্গে মেশা থাকলে এর সুনির্দিষ্ট এন্টিবডি শুধু একেই খুঁজে নিয়ে ধ্বংস করবে। যে কাচপাত্র পেট্রি ডিশের উপর এসব হয়, কাম্য ক্লোন ব্যাকটেরিয়াসহ সেই ডিশের ছাপ নেয়ার ফলে তার উপর কোথায় কোথায় এরকম এন্টিবডি দিয়ে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট প্রোটিনের জায়গাগুলোতে ছোপ ছোপ দাগ দেখা দিয়েছে তা লক্ষ্য করা হয়। এখন এসব ছোপের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে, কাম্য জিন সহ কোষের ক্লোন ও অন্যান্য ক্লোনগুলোর যে মূল পেট্রি ডিশ তাতে কোথায় কোথায় কাম্য ক্লোন ছিল (যেখানে প্রাসঙ্গিক এন্টিবডিটি তৈরি হয়েছে) তা বের করা সম্ভব। সব রকম প্রোবে অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার জন্য যথাযথ তেজস্ক্রিয় লেবেল করে নেয়া হয় যাতে প্রোবের নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছবিতে দাগ ফেলতে পারে।

জিন কারিগরির কিছু প্রয়োগ

জিনের কাজ ও প্রকাশের অনুসন্ধান:

এক একটি জিন ক্লোনিং করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আলাদা ভাবে সুনির্দিষ্ট গবেষণা করার পথ খুলে গিয়েছে। এখন তার অসংখ্য প্রতিলিপির সুযোগ নিয়ে প্রথমে এর সিকোয়েন্সিং করে ফেলা যাচ্ছে। তারপর ঐ জিনের বা তার কোন বিশেষ মিউটেশনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতে জীবের জৈব বৈশিষ্টের কী পরিবর্তন হচ্ছে তা সযত্নে লক্ষ্য করে জিনটির কাজ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য বিশেষ ভাবে দেখতে হয় জিনটি কখন কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বা হচ্ছে না তা। এজন্য ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে আমরা যদি ঐ ডি এন এ'র এক একটি বেইস বিলুপ্ত করতে থাকি– এবং দেখি যে ঠিক কোন অঞ্চলে বেইস বিলুপ্তি ঘটালে জিনটি দিয়ে প্রোটিন তৈরির সক্ষমতা

(অর্থাৎ এর ট্রান্সক্রিপশন হবার সম্ভাবনা) যথেষ্ট বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, তাহলে ঐ জিনের প্রকাশের চিত্রটি আমাদের কাছে ধরা পড়বে। প্রোব ব্যবহার করে ওখানে প্রোটিনটির যথাযথ এম আর এন এ তৈরির পরি-মাণ লক্ষ্য করেও জিন প্রকাশ হবার বাড়া কমা ধরা পড়ে। প্রোবগুলো তেজস্ক্রিয় লেবেল করা থাকলে এম আর এন এ'র সংখ্যা যত বেশি হবে ইলেকট্রোফোরেসিস করা প্যাটার্নে ঐ এম আর এন এ'র জায়গাটিতে তত ঘন-কালো হয়ে দাগ পড়বে। আর বেশি এমআরএনএ মানেই তো জিনটির অধিক প্রকাশ।

নিয়ন্ত্রক প্রোটিন কোন্ অংশে কাজ করে তা জানা:

এখন আমরা জানি জিন মাত্রই প্রকাশিত হয়না, অন্তত সব সময় প্রকাশিত হয়না। কখন কী ভাবে প্রকাশিত হবে তা আবার নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণকারী জিনের উপর। নিয়ন্ত্রণকারী জিন সে কাজ সম্পন্ন করে বিশেষ প্রকাশ-বান্ধব বা প্রকাশ-নিরোধী প্রোটিনের মাধ্যমে। প্রকাশ-বান্ধব প্রোটিন তৈরির জিনকে বলা হয় প্রমোটার। প্লাজমিডে পুনর্গঠিত জিন তৈরির সময় তার সঙ্গে উপযুক্ত প্রমোটার জিনও যোগ করে দিতে হয়। এসব এমনভাবে বাছাই করতে হয় যাতে তা গ্রাহক জীবের সেই অংশের মধ্যে শুধু প্রকাশিত হবে যেখানে আমরা চাই। যেমন উদ্ভিদের পাতায় চাইলে শুধু পাতায় এটি প্রকাশিত হবে, অন্য অংশে প্রকাশিত হবেনা। যদি প্রাণির দুধ তৈরির কোষে চাই তা হলে শুধু ওখানেই প্রকাশিত হবে, অন্য কোথাও নয়। এই প্রকাশ বান্ধব-প্রোটিন জিনের কোন্ জায়গায় আবদ্ধ হয়ে কাজ করে এটি জানা জিন-গবেষণায় খুব জরুরী। এ কাজের জন্য জিনের ক্লোনটিকে নানা টুকরায় ভাগ করে তার সঙ্গে ঐ নিয়ন্ত্রক প্রোটিনগুলো মেশানো হয়। যে টুকরার সঙ্গে এ প্রোটিন আবদ্ধ হবে তা অপেক্ষাকৃত ভারী হয়ে যাবে বলে তা ইলেকট্রোফোরেসিস প্যাটার্নে তখন অপেক্ষাকৃত কাছের জায়গায় দাগ ফেলবে। এভাবে উদ্ঘাটন করা যায় নিয়ন্ত্রক প্রোটিনটি জিনের কোন্ জায়গায় কাজ করে।

প্রোটিন তৈরি, প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং:

বিশেষ বিশেষ মূল্যবান প্রোটিন তৈরি করার জিন স্থানান্তরিত করে ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ বা প্রাণির কোষকে দিয়ে সেই প্রোটিন বিপুল পরিমাণে তৈরি করিয়ে নেবার বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। এজন্য একটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে তা হলো যার মধ্যে জিনটি স্থানান্তরিত করা হলো সেখানে একে ভাল মতো প্রকাশিত হতে হবে, অর্থাৎ তার দ্বারা প্রোটিন ভাল মতো তৈরি হতে

হবে। এজন্য সাধারণত কাম্য জিনের সঙ্গে প্রমোটার জিনও দিয়ে দেয়া হয়। প্রমোটার সম্পর্কে পরে আমরা আরো বিস্তারিত দেখবো। কাম্য জিনটির সাহায্যে প্রোটিন প্রস্তুতকারী জীবকোষের আরো কিছু গুণ থাকা চাই– যেমন, যে প্রোটিনটি এটি তৈরি করবে তা যেন আমাদের পাওয়ার জন্য সহজে সে নিঃসরণ করে দিতে পারে, আর তা যেন এমন ভাবে সে দিতে পারে যাতে প্রোটিনটি ব্যবহারযোগ্য থাকে, ইত্যাদি। এদিক থেকে চমৎকার একটি প্রোটিন প্রস্তুতকারী জীবকোষ হলো ই-কলাই নামক ব্যাকটেরিয়া। ইতোমধ্যে যথাযথ জিন স্থানান্তরিত করে এই ই-কলাই ব্যাকটেরিয়াকে দিয়ে আমরা লাভজনক ভাবে তৈরি করিয়ে নিতে পেরেছি– ইনসুলিন, মানব গ্রোথ হরমোন, ইন্টারফেরন, বীটা এনডরফিলের মতো মহামূল্যবান চিকিৎসার ওষুধ। ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও ঈষ্ট এই ক্ষেত্রে খুবই কাজ দিয়েছে।

এরকম নিম্ন বর্গের সরল জীবকোষ ছাড়াও উচ্চতর উদ্ভিদ বা প্রাণি কোষের কালচারকে দিয়েও এভাবে প্রোটিন তৈরি করানো যায়। তাছাড়া জিন স্থানান্তরিত সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা প্রাণিকে দিয়েও তা করা যায়– যা পরে দেখবো। ব্যাকটেরিয়াকে দিয়ে উচ্চতর জীবের প্রোটিন তৈরি করাতে গিয়ে কিছু সমস্যা হয়। এর জিন যদি ক্রমাগত প্রোটিন তৈরিতে সক্রিয় থাকে তা হলে ঐ ব্যাকটেরিয়ার জন্য কিছুটা বিষময় অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তাই শুধু নেহাৎ প্রয়োজনের সময় ছাড়া অন্য সময় একে প্রোটিন উৎপাদন নিষ্ক্রিয় করে রাখার ব্যবস্থাটাই ব্যাকটেরিয়াতে সাধারণ অবস্থায় বজায় থাকে। তবে প্রয়োজন মত সক্রিয় করে তোলার জন্য এর মধ্যেই ইন্‌ডিউসার নামক বস্তু থাকে।

জিন কারিগরিতে শুধু নূতন প্রোটিন উৎপাদনের ব্যবস্থাই হয়না, বরং জিনের সিকোয়েন্সে অর্থাৎ বেইস-ক্রমে পরিবর্তন এনে প্রোটিনে পরিবর্তনও আনা যায়। একেই বলা হয় প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রোটিনে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নানা কারণে দেখা দিতে পারে। যেমন এক একটি এনজাইম জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে যে কাজ করে সেই কাজে পরিবর্তন আনার দরকার হতে পারে। এনজাইমের প্রোটিন অণু-গঠনে যেখানে যেখানে অনুঘটক হবার জন্য যে সক্রিয় জায়গাগুলো রয়েছে তার আশে-পাশে পরিবর্তন এনে এই পরিবর্তন আসে। কোন কোন প্রোটিনের একটি কাজ হলো পুষ্টি জমা রাখা। যেমন প্রোটিন গঠনে পরিবর্তন এনে এই গুণটি রদবদল করা যায়। চিকিৎসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত প্রোটিনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দরকারী সময়টি ধরে প্রোটিন তার গঠনে বা কাজে স্থায়ী হতে না পারলে সমস্যা হয়। স্থায়ীত্ব বাড়াতেও প্রোটিনের সীমিত পরিবর্তন সহায়ক হতে পারে। নানা কাজের কাজী

প্রোটিনে এরকম নানা পরিবর্তন কাম্য হতেই পারে। সরাসরি প্রোটিনে এরকম পরিবর্তন ঘটানো কঠিন। তাই পরিবর্তনটি আসলে আনা হয় ঐ প্রোটিন সৃষ্টির জিনের মধ্যে। নানা রকম মিউটেশন সৃষ্টি করে পরীক্ষা-নিরিক্ষার উন্নয়ন এখন জিনে নানা জায়গায় বেইস পরিবর্তন করে প্রোটিনের কোন্ এমাইনো এসিড এদিক ওদিক করলে তার কাজে কী পরিবর্তন আসবে তা জানার সুযোগ করে দিয়েছে। এভাবেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পথ খুলে দিয়েছে প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর।

সিনথেটিক জীবন সৃষ্টির দ্বার প্রান্তে?

জিন কারিগরির ক্ষেত্রে ২০১০ সালে সাম্প্রতিকতম চাঞ্চল্যকর খবর হলো বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম ভাবে ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি কতখানি কৃত্রিম, কতখানি নয় তা অবশ্য বুঝা যাবে বিষয়টির কিছুটা বিস্তারিত জানলে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে অন্য যে কোন অণুর মত বিজ্ঞানীরা এখন ডি এন এ সংশ্লেষণ করতে পারছেন তার বিভিন্ন পরমাণুগুলো রাসায়নিকভাবে জুড়ে জুড়ে। উদাহরণ স্বরূপ উপযুক্ত প্রোব তৈরির সময় কখনো কখনো এরকম সংশ্লেষিত ডি এন এ ব্যবহার করা হয়। একে বলা যায় সিনথেটিক অথবা মানব-সৃষ্ট ডিএনএ, কারণ এটি কোন জীব থেকে আসেনা। এরকম ডিএনএ'র নানা টুকরা অংশের সংশ্লেষণ সম্ভব হলেও এতদিন একটি জীবের পুরো জেনোমকে এভাবে সংশ্লেষিত করা যায়নি। সাম্প্রতিকতম এই সাফল্যে বিজ্ঞানীরা সেটিই করতে পেরেছেন। একটি সত্যিকার ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ'র অনুকরণে তাঁরা এর পুরো জেনোম কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষণ করেছেন। এটি ছিল খুবই কঠিন ও অনিশ্চিত একটি কাজ– কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা এতে সফল হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এরপর তাঁরা যা করেছেন সেটি আরো চাঞ্চল্যকর। অন্য একটি ব্যাকটেরিয়ার কোষ থেকে তার নিজস্ব ডি এন এ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তাতে এই সংশ্লেষিত ডি এন এ'টি প্রতিস্থাপিত করেছেন তাঁরা। ইতোপূর্বে কখনো সংশ্লেষিত ডি এন এ কোন জীবের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেনি তার আপন ডি এন এ'র মত। তবুও বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন যে এটি সম্ভব হবে, এবং তা সম্ভব হয়েছে। সম্পূর্ণ সিনথেটিক ডি এন এ নিয়েই ঐ ব্যাকটেরিয়া তার পূর্বকার সব গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রেখেছে, এবং সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার মতই আচরণ করছে। এটি এক যুগান্তকারী সাফল্য এবং এর আবিষ্কারক বিজ্ঞানীরা একে কৃত্রিম জীব বলেই আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই ক্ষেত্রে 'কৃত্রিম জীব' কথাটি সর্বাংশে যথাযথ নয়। ব্যাকটেরিয়াটির নিয়ন্ত্রক জিনগুলো কৃত্রিম হলেও এর কোষের বাকি অংশ কিন্তু তা নয়। একটি কোষ শুধু তার ডি এন এ নিয়ে কাজ করেনা– বাকি অংশ বিশেষ করে তার প্রোটিন এনজাইমগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডি এন এ'র বার্তা এগুলোর কাজকে পরিচালিত করে– সেই অর্থে বলা যায় এটি কোষের 'সফ্টওয়্যার'। কিন্তু বাকিটা অর্থাৎ 'হার্ড-ওয়্যারটুকু' এক্ষেত্রে মূল ব্যাকটেরিয়া থেকেই এসেছে ও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাংশে কৃত্রিম হবার জন্য কোষের সেই বাকি অংশকেও সংশ্লেষণ করতে পারতে হবে। বিজ্ঞানীরা যে ভবিষ্যতে সে চেষ্টা করবেন তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া তার আগেই হয়তো তাঁরা হুবহু জানা ব্যাকটেরিয়ার জেনোম সংশ্লেষণ না করে নিজেদের প্রয়োজন মত নূতন ডিজাইন করে নূতন জেনোম তৈরি করবেন এবং নূতন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, এমন কি হয়তো উচ্চতর নূতন জীবও সৃষ্টি করবেন। জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে নূতনত্ব আনার চেয়েও সেই আকাঙ্খা হবে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী।

জিন-স্থানান্তরিত জীব

জিন-স্থানান্তরিত জীব কী উদ্দেশ্যে?

জি এম (জেনেটিকালি মডিফাইড) শস্য, ট্রান্সজেনিক প্রাণি– ইত্যাদি শব্দাবলী আজকাল অহরহ শুনা যায়। এগুলো এখন জন্ম দিচ্ছে অনেক কৌতুহলের, অনেক আশার এবং অনেক বিতর্কেরও। ১৯৮৩ সালে দুনিয়ার প্রথম জিন-স্থানান্তরিত উচ্চতর প্রাণি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল– যেটি ছিল একটি জিন স্থানান্তরিত ইঁদুর। দেহাবয়ব বৃদ্ধির যে হরমোন মানুষের রয়েছে সেই হিউম্যান গ্রোথ হরমোনের জিন ভ্রূণাবস্থায় ইঁদুরের জীবকোষে ঢুকিয়ে এই সফল জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি সম্ভব হয়েছে। ঐ জিনের প্রভাবে এ ইঁদুর বয়স্ক অবস্থায় সাধারণ ইঁদুরের দ্বিগুণ দেহধারী হয়ে রীতিমত একটি 'সুপার ইঁদুরে' পরিণত হয়েছিল। এর পর পর আরো বেশ কয়েকটি প্রাণিকে এরকম সুপার প্রাণিতে পরিণত গেলেও এদের অধিকাংশের গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা পরে দেখা গেছে। ঐ অবস্থা থেকে সমস্যাগুলো সমাধানের পথে আমরা এখন অনেকদূর এগিয়েছি। এখন উদ্ভিদ ও প্রাণি উভয় ক্ষেত্রে জিন স্থানান্তরিত করে সেগুলোকে আমরা নানা বিশেষ কাজে লাগাতে পারছি।

এ কাজগুলো যে কী তার কিছু আমরা দেখেছি– জিন গবেষণার প্রয়োজনে, অথবা মূল্যবান নূতন প্রোটিন তৈরির প্রয়োজনে এদের ব্যবহার দেখেছি। এই শেষের কাজটি কোন কোন ক্ষেত্রে এত সফলভাবে করা হচ্ছে যে জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে আমরা কোন কোন জীবকে আমাদের জন্য দুষ্প্রাপ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের যেন একরকম কারখানায় পরিণত করতে পেরেছি। এই দিকটি যদিও প্রাণির ক্ষেত্রে বেশি হয়েছে, বিশেষ করে চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য প্রোটিন তৈরিতে কোন কোন উদ্ভিদকেও চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহার হয়েছে মানব শরীরে বিশেষ বিশেষ ক্ষতিকর আগন্তুকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সেগুলোর এন্টিবডি তৈরির জন্য। জিন স্থানান্তরিত উদ্ভিদের চাষ করে এরকম বিচিত্র এন্টিবডি বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব।

উদ্ভিদে জীবের জিন স্থানান্তর আরো বহু কারণে করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে এক রকমের কারণ হলো উন্নততর শস্য উদ্ভাবন। ইতোমধ্যেই এভাবে এমন শস্য সৃষ্টি করা গিয়েছে যার চারা আগাছা নাশকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেনা– আগাছা মরবে, কিন্তু এই উদ্ভিদটি অক্ষত থাকবে। একই ভাবে রোগ,

কীটপতঙ্গ, ভাইরাস ইত্যাদি এক একটি বালাইয়ের প্রতিরোধী উদ্ভিদও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আবহাওয়ার নানা বিপত্তি– শৈত্য, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি সহনশীল উদ্ভিদও এই প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আর এসব দিক থেকে সম্ভাবনার শুরু মাত্র হয়েছে। এসব নানা গুণ সৃষ্টি করার মত জিন পুরো জীব জগতে খোঁজা অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে তার আরো দক্ষ আরো বিচিত্র ধরন অবশ্যই পাওয়া যাবে। স্থানান্তরেরও নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হবে। আরো মৌলিক ভাবে ভিন্ন গুণ সৃষ্টির পথেও অগ্রগতি হচ্ছে। যেমন উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ফিক্সিং এর বিষয়টি উল্লেখ করা যাক। প্রকৃতিতে এটি শুধু লেগ্যুম বা শিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের গুটিতে থাকা রাইজোবিয়াম জীবাণু থাকার কারণেই সম্ভব হয়; এরা বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের জন্য সংগ্রহ করতে পারে সার হিসাবে। প্রাকৃতিকভাবে এই ক্ষমতা নাই সে রকম উদ্ভিদও এখন জিন-স্থানান্তরের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শস্য, ফল, শাক সব্জী ইত্যাদির বাজারজাত করণের সুবিধা সৃষ্টি করাটাও এর একটি লক্ষ্য। যেমন একটি টম্যাটো দোকানে কতদিন তাজা ও পুষ্ট থাকবে, উজ্জ্বল রং ও চকচকে ভাব বজায় রাখবে, সেই গুণের উপর তার বাজার মূল্য ও অর্থনীতি অনেকখানি নির্ভর করছে। এখন টম্যাটোসহ অন্য অনেক রকম খাদ্যের ক্ষেত্রে জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে এ সব গুণ উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে, এমনকি এদের আকৃতি, আকার ইত্যাদিতেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রোটিন তৈরির বিষয়টি ছাড়াও জিন স্থানান্তরিত প্রাণির ক্ষেত্রেও আরো নানা রকম উপকার পাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। হাজার বছরের সনাতন পদ্ধতিতেও ভাল ও অধিক মাংস দেয়া গরু, অধিক দুগ্ধবতী গাভী, বা বড় ও বেশি ডিম দেয়া মুরগি ইত্যাদির উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়ে আসছে। তাদের মধ্য থেকে বিশেষ গুণের জন্য ক্রমাগত নির্বাচিত নানা সদস্যের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে উন্নত জাত সৃষ্টির মাধ্যমে এটি করা হয়ে আসছে। কিন্তু এভাবে নূতন জাত উন্নয়ন অতি ধীর প্রক্রিয়া। এই উন্নয়ন এখন অনেক দ্রুততর গতিতে সম্ভব হচ্ছে জিন-স্থানান্তরিত পশু-পাখি সৃষ্টির মাধ্যমে। যেমন ইতোমধ্যেই জিন-স্থানান্তরিত গাভী অনেক বেশি দুধ দিচ্ছে। শুধু তাই নয় সেই দুধও যেন আমাদের চাহিদা মাফিক হয় তার জন্যও বিশেষ বিশেষ জিন খুঁজে নিয়ে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। যেমন এই প্রক্রিয়ায় এখন কম ল্যাকটোজ সম্পন্ন দুধ,কম কোলেস্টোরোল যুক্ত দুধ ইত্যাদিও পাওয়া যাচ্ছে গাভী থেকে। পশু-পালনের ক্ষেত্রে নানা রোগ বালাই থেকে তাদের মুক্ত রাখতে গিয়েও জিন-স্থানান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যেমন সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদির প্রকোপ যখন

সারা দুনিয়ায় ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করছে, ফ্ল্যু-প্রতিরোধী শূকর সৃষ্টি একটি বড় আশার কথা বৈকি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধ, মূল্যবান প্রোটিন ইত্যাদি তৈরি করানো ছাড়াও জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে পশুর বিভিন্ন অঙ্গ মানুষের জীবন রক্ষায় ব্যবহারের নব দিগন্ত সৃষ্টি হচ্ছে– যে ক্ষেত্রে মানুষের দেহ সে বিজাতীয় অঙ্গকে প্রতিরোধ না করে বরং সহজে গ্রহণ করবে।

এই সব রকমের প্রয়োগে সাম্প্রতিক কিছু অর্জন, সমস্যা, ও ঝুঁকির বিষয়ে আমরা একটু পরে আসছি। বিভিন্ন কিছু বাস্তব উদাহরণের ক্ষেত্রে জিন স্থানান্তর কী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে তার কিছুটা বিস্তারিত দেখার সঙ্গেই এ আলোচনা আমরা করবো।

আগাছা নাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ

কৃষির উদ্ভিদে জিন স্থানান্তর করে সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে রয়েছে আগাছানাশক-প্রতিরোধী হবার গুণটি। রাসায়নিক আগাছা-নাশকের মূলে প্রধানত রয়েছে গ্লাইফোসেট নামক দ্রব্য যা কয়েকটি প্রয়োজনীয় এনজাইমকে অকার্যকর করার মাধ্যমে উদ্ভিদে কিছু জরুরী এমাইনো এসিড তৈরিতে বাধ সাধে। তার ফলে আগাছা মরে যায় বটে, তবে দ্রব্যটি মূল শস্যের সংস্পর্শে এলে তাও মরে যায়। কাজেই নূতন সমস্যা সৃষ্টি হয়। গ্লাইফোসেটের উপস্থিতিতে স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া কালচার করে দেখা গেছে যে তার কিছু প্রতিরোধী সদস্য এর মধ্যে বেঁচে রয়েছে। এই প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়াগুলোতে এমন মিউট্যান্ট জিন খুঁজে পাওয়া গেল যা প্রাসঙ্গিক এনজাইমটিতে মাত্র একটি এমাইনো এসিড পরিবর্তন করে তাকে গ্লাইফোসেট প্রতিরোধী করে তোলে। ঐ জিনটিকে স্যালমোনেলা থেকে ক্লোন করে নিয়ে তাকে তামাক গাছে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হলো। পরে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য উদ্ভিদেও হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো শুরুতে উদ্ভিদ জিন স্থানান্তরের অনেক কাজ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এই তামাক গাছের উপর। তামাক ও সমধর্মী উদ্ভিদের কিছু সুবিধার জন্য এটি হয়েছে। এসব উদ্ভিদ দ্বীবীজপত্রী, যার মধ্যে কাম্য জিন বাহক এগ্রোব্যাকটেরিয়াম সহজে আক্রমণ করতে পারে। আমাদের অধিক প্রাসঙ্গিক খাদ্য শস্যগুলো অধিকাংশ একবীজপত্রী হওয়াতে তাদের এ সুযোগ নাই, ওতে জিন স্থানান্তর অপেক্ষাকৃত কঠিন, তাই শস্যের উদ্ভিদে জিন স্থানান্তর অপেক্ষাকৃত পরে হয়েছে। তাছাড়া তামাক গাছের আর একটি সুবিধা হলো এতে একটি কোষ থেকে সহজে টিশ্যু কালচার করে একটি পুরো চারা সৃষ্টি করা যায় অপেক্ষাকৃত সহজে। তাই জিন-স্থানান্তরের পরীক্ষা নিরীক্ষা তামাক

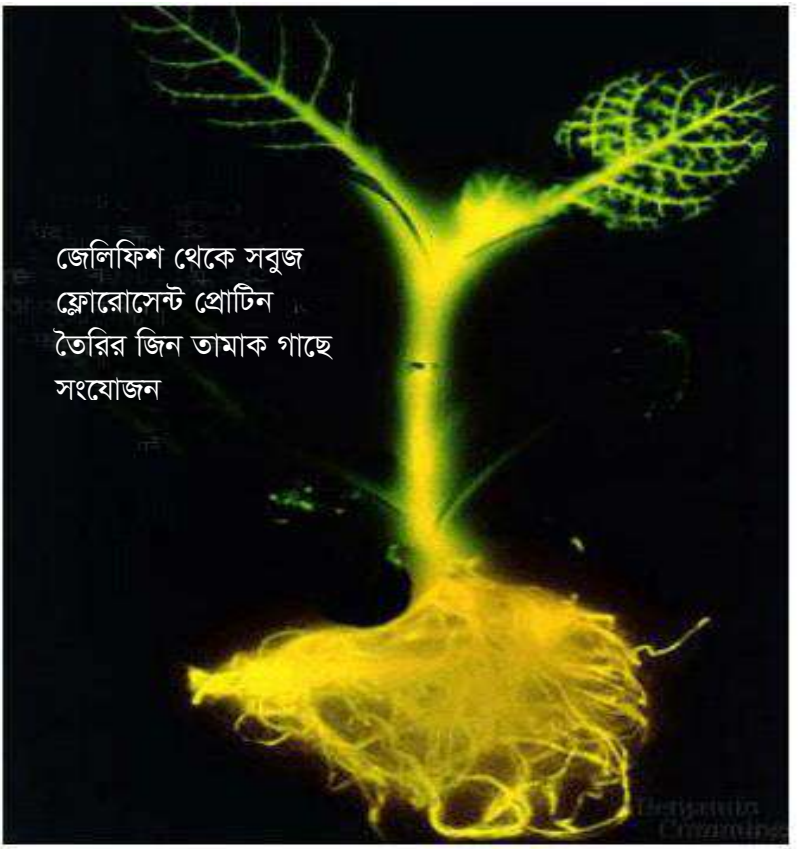

জিন সংযোজিত তামাক গাছ অন্ধকারে জ্বলে

গাছে এত বেশি হয়েছে যে এর নাটকীয় উদাহরণগুলোও তাতে বেশি দেখা গেছে। যেমন এর একটিতে জোনাকির আলো সৃষ্টিকারী লুসিফেরেজ এনজাইমের জিন ঢুকিয়ে পুরো তামাক গাছকে অন্ধকারে সবুজ আলোতে মৃদু প্রভাশীল করে তোলা সম্ভব হয়েছে। জেলিফিশ থেকেও এরকম জিন সংগ্রহ করে একই কাজ করা হয়েছে। এই আলো শিকড়ে বেশি দেখা যায়– যা প্রমাণ করে যে স্থানান্তরিত জিনটি শিকড়েই প্রকাশিত হয়েছে বেশি।

দাতা জীব স্যালমোনেলা থেকে নিয়ে আগাছা-নাশক গ্লাইফোসেট প্রতিরোধী মিউট্যান্ট জিনটি গ্রহীতা তামাক কোষে স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় বাহকের কাজ করেছে সেই এগ্রোব্যাকটেরিয়ামের Ti প্লাজমিড। কাম্য জিন সংযোজিত পুনর্গঠিত ডি এন এ নিয়ে এগ্রোব্যাকটেরিয়াম দিয়ে তামাক গাছকে আক্রমণ করালে সেখানে টিউমারের মত একটি ফোলা জায়গা সৃষ্টি হয়– শিকড় আর

কাণ্ডের সংযোগ স্থলে। একই ভাবে তামাক গাছের অন্যান্য অংশে এটি আক্রমণ করতে পারে– খুব ছোট ছোট করে কেটে নেয়া পাতার টুকরাকেও (নিচের চিত্রে b)। পাতার এরকম টুকরা করে তা প্যাট্রি ডিশে পুষ্টি মাধ্যমে রাখলে তার আশে-পাশে তামাকের টিশ্যু বাড়তে থাকে (c)। ওখানেই এগ্রোব্যাকটেরিয়াম দিয়ে টিশ্যুকে আক্রমণ করালে তার কোষগুলোতে ঐ কাম্য জিন সহ পুনর্গঠিত ডি এন এ চলে যায় (d)। তারপর এদেরকে অন্য পাত্রে নিয়ে গিয়ে টিশ্যু কালচারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র তামাক চারা পাওয়া যায় (e) যা বড় হলে ঐ আগাছানাশক- প্রতিরোধী গুণ তার মধ্যে দেখা দেয়।

এখন একই রকম পদ্ধতিতে অনেক ধরনের উদ্ভিদে এরকম প্রতিরোধী ক্ষমতা জন্মানো যাচ্ছে– যে কারণে তার চাষে নির্বিঘ্নে আগাছানাশক ব্যবহার করা

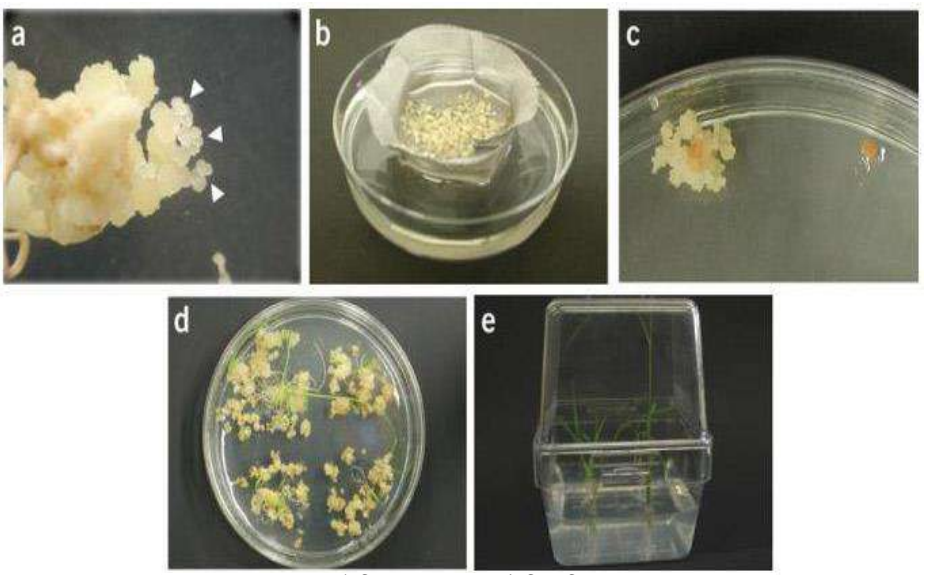

এগ্রোব্যাকটেরিয়ামের মাধ্যমে উদ্ভিদ জিন স্থানান্তর

যাচ্ছে। বিশেষ করে তুলার চাষে এটি একটি বড় পরিবর্তন আনতে পেরেছে ইতোমধ্যেই। এটি চাষের ক্ষেতে আগাছানাশক ব্যবহার করলেও তুলার গাছ অক্ষত থাকছে।

কীট পতঙ্গ নিরোধী উদ্ভিদ

কৃষিতে ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ দূর করার জন্য বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়– যার আর্থিক ব্যয় ও পারিবেশিক ক্ষতি বিশাল।

যদি উদ্ভিদ নিজেকেই তার ক্ষতিকর কীট পতঙ্গের প্রতিরোধী করে গড়ে তোলা যায় তা হলে কীটনাশকের আর প্রয়োজন থাকেনা। উপযুক্ত জিন উদ্ভিদে স্থানান্তর করে এটি সম্ভব হয়েছে। মূলত এরকম জিন হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যেই বিশেষ কীটপতঙ্গের দমনে কার্যকর বিশেষ টক্সিন (বিষ) সৃষ্টির জিন। এর মধ্যে অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাসিলাস থুরেনজিনসিস বা সংক্ষেপে বিটি নামে পরিচিত মাটির ব্যাকটেরিয়ার একটি জিন। এর প্রভাবে সৃষ্ট টক্সিন ক্ষতিকর পতঙ্গের কোষঝিল্লি নষ্ট করে একে কাবু করে ফেলে।

কার্যত ব্যবহারযোগ্য হতে হলে এক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো শর্ত পূরণ করা চাই। স্থানান্তরিত জিনের প্রকাশ গ্রহীতা উদ্ভিদে ততখানি হতে হবে যেন নিজের অভীষ্ট অংশকে এটি কীটপতঙ্গ আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। অথচ এই প্রকাশ এমন অংশে এত বেশি হতে পারবেনা যা খেলে বা ব্যবহার করলে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হবে। অন্যদিকে এমন নিরোধী করতে গিয়ে যেন এর ফলন কমে না যায় তাও দেখতে হবে।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কাম্য জিনটি বিটি ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডেই পাওয়া যায়। তাই যথারীতি প্লাজমিড থেকে নিয়ে ক্লোন করে একে ই-কলাই ব্যাকটেরিয়াতে প্রতিস্থাপন করে তার মধ্যে প্রকাশিত হবার ব্যবস্থা করা যায়। এভাবে কোন্ কোন্ ই-কলাইতে এটি প্রকাশিত হয়েছে তা সনাক্ত করার সহজ উপায়ও রয়েছে। বিটি টক্সিনের সুনির্দিষ্ট এন্টিটক্সিন এন্টিবডি দিয়েই এভাবে সনাক্ত করা যায়।

এখন উদ্ভিদটির টিশ্যু কালচারকে ঐ ই-কলাই দিয়ে আক্রান্ত করালেই তাতে কাম্য জিন স্থানান্তরিত হয়। তাছাড়া কোষ দেয়াল গলিয়ে ফেলে এবং কোষের ঝিল্লিতে বৈদ্যুতিক কারেন্টে ছিদ্র করে সরাসরিও এ জিন ঢুকানো যায়। বিটি টক্সিন ব্যবহারের একটি সুবিধা হলো তাতে জিনটির প্রকাশিত হবার ক্ষমতা প্রয়োজন অনুযায়ী কম বেশি করা যায়। আর এর কার্যকারিতা নির্দিষ্ট কীটের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ সঠিক বিটি টক্সিন জিন ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট একটি উদ্ভিদভোজী প্রাণিরই দমন করা হয়, অন্য কীট পতঙ্গ বা পশু পাখি এর প্রভাবমুক্ত থাকে যেটি রাসায়নিক কীট নাশকের ক্ষেত্রে হয়না। কিন্তু কখনো কখনো ক্ষতিকর ঐ বিশেষ পতঙ্গের খুবই অনুরূপ বা একেবারে সমগোষ্ঠির আর একটি নির্দোষ পতঙ্গও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

১৯৮০'র দশকে আলুতে বিটি জিন স্থানান্তরিত করা হয় যার ফলে আলুর পাতায় এই টক্সিন দেখা দিয়ে একে কীটমুক্ত রেখেছে। তারপর থেকে বেশ

কিছু শস্য ও সব্জীতে এই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে সুফল পাওয়া গেছে। যেমন ২০০৬ নাগাদ এসে, দুনিয়ার ১১% ভুট্টা এরকম 'জি এম ভুট্টা' হিসাবে উৎপাদিত হয়েছে। অধিক প্রচলিত এই জি এম বিশেষণটি হলো জেনেটিকালি মডিফাইড অর্থাৎ 'জেনেটিক দিক থেকে পরিবর্তিত' কথাটির আদ্যাক্ষর। একটি সমস্যা এক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে তা হলো কোন কোন ক্ষেত্রে জিনটিকে বাছাই করার জন্য এন্টিবায়োটিক নিরোধী মার্কার ব্যবহার করতে হয়েছে। গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হলে এই ভুট্টা গরুর পেটের ব্যাকটেরিয়াগুলোকেও এন্টিবায়োটিক নিরোধী করে তুলতে পারে। এজন্য বিকল্প বাছাই প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বিটি টক্সিনে সব চেয়ে বড় সাফল্য এসেছে তুলা চাষে– এটি তুলার প্রধান শত্রু বলওয়ার্ম কীট থেকে একে সুরক্ষা দিতে যুগান্তর এনেছে। এক্ষেত্রে তুলা উদ্ভিদের ক্যালাস কোষকে বিটি জিন সংযুক্ত এগ্রোব্যাকটিরিয়াম দিয়ে আক্রান্ত করানো হয়। উদ্ভিদের গায়ে ক্ষত করলে তাকে সুরক্ষা দেবার জন্য সেখানে যে কোষগুলো ঘন হয়ে সৃষ্টি হয়, সেগুলোই হলো ক্যালাস কোষ। কালচার মাধ্যমে এই কোষকে এগ্রোব্যাকটিরিয়ামের সঙ্গে রেখে কোষ কালচার করা হয়। বার বার এরকম করে ও বিটি জিনের জন্য বাছাই করে শেষ পর্যন্ত এমন ১০-১২% কোষ ভ্রূণের টিশ্যু হিসেবে পাওয়া যায় যাতে বিটি জিন গেছে। এগুলো থেকে পূর্ণাঙ্গ জিন-স্থানান্তরিত আলু চারা পাওয়া সম্ভব।

এখন ভাইরাস-প্রতিরোধী উদ্ভিদও জিন স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় তৈরি করা যাচ্ছে। ভাইরাস মূল ক্ষতিটি করে উদ্ভিদের কোষের কিছু বস্তুকে তার নিজের প্রতিলিপি তৈরি ও বংশ বিস্তারের কাজে ব্যবহার করার মাধ্যমে। এই বস্তুগুলোকে তৈরি হতে না দিয়ে, অথবা এগুলোকে তার ঐ ধরনের ভাইরাস-সহায়ক কাজগুলো করতে না দিয়ে, ভাইরাস-নিরোধী উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। এজন্য দরকারী জিন পাওয়া যায় উদ্ভিদটির অনুরূপ কোন জ্ঞাতি উদ্ভিদে অথবা তারই কোন বন্য জাতে। যেমন আলুর Y ভাইরাস প্রতিরোধী জিন পাওয়া গেছে আলুর একটি বন্য জাতের মধ্যে। পরে এটি সাধারণ আলুতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে।

সোণালী চাউল

বিশেষ বিশেষ খাদ্যে যেই বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন-এ সৃষ্টি করে তার অভাবে দুনিয়ার অসংখ্য শিশু অন্ধত্ব ও অন্যান্য অসুখে ভোগে, এবং প্রচুর শিশু মারাও যায়। তাদের অনেকেই আমাদের দেশের মত চাউল-নির্ভর খাদ্য অঞ্চলে বাস

করে। তাই ডেফোডিল ফুল থেকে বিটা কেরোটিন তৈরির জিন ধানের কোষে ঢুকিয়ে বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ চাউল সৃষ্টি করা হয়েছে। হলুদ রঙের জন্য একে বলা হয় সোণালী চাউল। গাঢ় রঙের অনেক খাদ্যে বিটা কেরোটিন থাকলেও তার ঘনত্ব সেখানে বেশি নয়। সে তুলনায় হলুদ ড্যাফোডিল ফুলে এর ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। অথচ ড্যাফোডিলের কোন অংশই খাওয়ার উপযুক্ত নয়। একারণেই এই গুণের জিনটি এর থেকে নিয়ে তা ধানে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই স্থানান্তরের কাজটি সহজ নয়, যার প্রধান কারণ বিটা ক্যারোটিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় একটি নয় তিনটি পৃথক জিন, যাদেরকে একত্রে স্থানান্তর করা কঠিন। শেষ পর্যন্ত পুনর্গঠিত যে ডি এন এ এর জন্য গড়ে তোলা হয়েছে তাতে ড্যাফোডিল থেকে দুটি এবং বিশেষ ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি– মোট তিনটি জিন সংযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া এতে জিনগুলো প্রকাশের সহায়ক এমন প্রমোটার ডি এন এ'ও সঙ্গে দেয়া হয়েছে যা ধানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর শুধু চাউলের মাঝখানে শস্যল এন্ডোস্পার্ম অংশে প্রকাশিত হবে। এক্ষেত্রেও এগ্রোব্যাকটেরিয়ামের Ti প্লাজিমডকে বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ধানের অপরিপক্ক ভ্রূণের মধ্যে এই এগ্রোব্যাকটেরিয়ামকে দিয়ে আক্রান্ত করিয়ে ঐ তিন জিন সমেত পুনর্গঠিত ডি এন এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সকল স্থানান্তরিত ভ্রূণগুলো মার্কার দেখে সনাক্ত করে গ্রীন হাউসে এদেরকে অঙ্কুরিত করা হয়েছে। এদের থেকে গজিয়ে উঠা ধানের চারা পরে বংশ পরম্পরায় তার ফলনও বজায় রেখেছে, আর চাউলের মধ্যে স্পষ্ট হলুদ বিটা ক্যারোটিনও নির্দেশ করেছে।

শুরুতে সোণালী চাউলের কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়েছে এতে বিটা কেরোটিনের ঘনত্ব আশানুরূপ না হওয়াতে, যার ফলে ভরপেটে দু'বেলা ভাত খেলেও প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ এর থেকে পাওয়া যাবে না বলে। ড্যাফোডিল ফুল নিজে খাবার যোগ্য না হবার কারণ হচ্ছে এর খানিকটা বিষময় (টক্সিক) প্রকৃতি। অনেকে চাউলের মধ্যে এই বিষময়তা চলে আসার সুদূর সম্ভাবনার কথা মনে করেও ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের মতে এসব যথেষ্ট পরীক্ষিত হয়নি। তবে ইতোমধ্যে এসব সন্দেহ নিরসণে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বিভিন্ন দেশে স্থানীয় জাতের সঙ্গে সংকর করে সোণালী চাউলকেও উচ্চ ফলনশীল ধানে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে এতে বিটা কেরোটিনের ঘনত্ব অনেক বেড়েছে। ২০০৫ এ এসে এর ঘনত্ব শুরুর দিকের চেয়ে ২৩ গুণ বেশি হয়েছে, যার ফলে প্রতিদিন ১৪৪ গ্রাম চাউলের ভাত খেলেই প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন-এ পাওয়া যাচ্ছে। ড্যাফোডিল ফুল থেকে না নিয়ে ভুট্টার থেকেও বিটা

ক্যারোটিন তৈরির জিন নেয়া সম্ভব হয়েছে। যার কার্যকারিতা আরো অনেক বেশি বলে প্রমাণিত হয়েছে। সব শেষে বাংলাদেশে এরকম সোণালি চাউলই প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জি এম শস্যে অনেকের আপত্তি কেন ?

জিন স্থানান্তরিত করে যে সব উদ্ভিদ খাদ্য বা অন্যান্য শস্য হিসাবে কৃষিতে আসছে সেগুলো সর্ব সাধারণের কাছে সাধারণত জি এম খাদ্য, জিএম শস্য এসব নামেই পরিচিত। এই জি এম শস্য উন্নত দেশগুলো সহ অনেক দেশেই বাজারে আসার অনুমতি পেতে অনেকদিন লেগেছে। এখনো বহু দেশে এই অনুমতি সবক্ষেত্রে মিলেনি। বিশেষ করে পরিবেশবাদী, ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে আন্দোলনকারী, এরকম অনেকের কাছে এখনো এগুলো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি। তবে এ আপত্তি এতদিনের গবেষণা, টেষ্টিং, এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনেকখানি কমে এসেছে। তাছাড়া শস্যগুলোর উপকারিতা ও অর্থনৈতিক সুবিধার দিকটি ক্রমে স্পষ্টতর হওয়ার ফলে উপকারের বিপরীতে আপত্তির কিছু কিছু দিক, যেগুলো প্রধানত সন্দেহ বা সুদূর ঝুঁকির ভিত্তিতে সৃষ্ট, সেগুলো কমে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু আপত্তি মোটেই ফেলে দেবার বিষয় নয়।

আপত্তির অনেক খানি আসে ভোক্তাদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উদ্বেগ থেকে। স্থানান্তরিত জিন উপকারী কাজে যেভাবে আসছে তা জানা গেলেও ঐ জিনের অজানা প্রভাব আর কী কী রয়েছে বা দেখা দিতে পারে সে নিয়ে ভীতি থেকেই যায়। এগুলো মানুষের শরীরে কোন অজানা এলার্জি, বিষময়তা, বা প্রদাহ সৃষ্টি করবে কিনা তার জন্য যথেষ্ট টেষ্টিং হয়নি বলেই বিরোধীদের ধারণা। সাধারণভাবে যে সব সংকর ব্রিডিং ইত্যাদি প্রক্রিয়া বহু বছর ধরে অনুসৃত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও যে এরকম সম্ভাবনা নাই তা নয়, তারও যে সব টেষ্ট হয়েছে তাও নয়। কিন্তু জিন স্থানান্তরের পুরো ব্যাপারটি নূতন বলে এখানে ভয় বেশি। তাছাড়া স্যালমোনেলা, বিটি ইত্যাদি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বলে পরিচিত জীব থেকে জিন নেয়া, টক্সিনের জিন ঢুকানো, এন্টিবায়োটিক-নিরোধী মার্কারও এতে জুড়ে দেয়া ইত্যাদি আমাদের শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাবেনা এমন নিশ্চয়তা প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানীরা দিলেও অনেকের মন মানেনা। যথেষ্ট টেষ্টে নির্দোষ প্রমাণিত হবার পরও কোন দিক অজানা থেকে যায় না, তাওতো নয়। তবে সঙ্গত যে পরিমাণ ঝুঁকি বিজ্ঞানের অন্যান্য সব অবদানের ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয়, এখানেও তা মেনে নিতে হবে বৈকি- যদি এর গুরুত্বপূর্ণ উপকারগুলো আমরা ভোগ করতে চাই ।

আপত্তির আর একটি বড় দিক হচ্ছে জি এম শস্যগুলো সার্বিক পরিবেশের মধ্যে বিপত্তি ঘটাবে এমন আশঙ্কা থেকে। সাধারণ জীববৈচিত্রের ক্ষতি এটি করতে পারে এমন ভয় রয়েছে– যেমন পতঙ্গ-নিরোধী উদ্ভিদের সংস্পর্শে এসে অন্যান্য উপকারী কীট পতঙ্গের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষণের মাধ্যমে এ ভয় অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে– যেমন জিন দিয়ে পরিবর্তিত জি এম ভুট্টার ক্ষেত্রে। সব কিছুর ক্ষেত্রে এই দিকটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আর একটি বড় ভয় হলো জি এম উদ্ভিদের সঙ্গে তার নিকট-জ্ঞাতি পরিবেশের অন্যান্য কিছু উদ্ভিদের পরাগায়নের সম্ভাবনা থেকে যাওয়া; যেমন ঐ উদ্ভিদের বন্য জাতগুলোর সঙ্গে পরাগায়ন– যেগুলো সর্বত্র এমনিতেই ছড়িয়ে রয়েছে। এভাবে জি এম উদ্ভিদের বিজাতীয় জিন সাধারণ উদ্ভিদের মাধ্যমে পুরো পরিবেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে সেখানে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আগাছানাশক-নিরোধী জি এম উদ্ভিদের সঙ্গে এটি ঘটলে পরিবেশের অনেক উদ্ভিদে এই গুণ গিয়ে এগুলো কার্যত 'সুপার-আগাছায়' পরিণত হতে পারে, যাকে আগাছানাশক দিয়ে কাবু করা যাবেনা। এভাবে অন্যান্য এমন সব গুণও জি এম উদ্ভিদ থেকে ওখানে যেতে পারে যা ওখানে অবাঞ্ছিত। এ পর্যন্ত এমন কোন অঘটন না ঘটলেও ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে মনে রাখতে হবে জি এম উদ্ভিদের ফলে অন্যান্য দিক থেকে পরিবেশের অনেক উপকারও হচ্ছে– রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে, ওসব দ্রব্য তৈরি করতে সৃষ্টি হতো এমন গ্রীন হাউস গ্যাস কমিয়ে, খাদ্যাভাব অপুষ্টি ইত্যাদির সম্ভাবনা কমিয়ে।

কেউ কেউ অবশ্য জি এম শস্য সম্পর্কে আপত্তি করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হওয়া জেনেটিক গঠনে আমাদের হস্তক্ষেপ করাটিই অনৈতিক ও বিপজ্জনক কাজ। অবশ্য তাঁরা ভুলে যান যে ঠিক এভাবে ভিন্ন প্রজাতি থেকে জিন স্থানান্তর না করেও আরো অন্যান্য ভাবে আমরা জেনেটিক গঠনে হস্তক্ষেপ করছি বহু দিন ধরে– যেমন কৃত্রিম নির্বাচনে প্রজনন করিয়ে, বিভিন্ন জাতের সংকর সৃষ্টি করে ইত্যাদি। আবার অন্য কেউ কেউ মনে করেন যে এভাবে ব্যয়বহুল ল্যাবোরেটরি-নির্ভর উদ্ভাবিত জি এম শস্যগুলো নিজেদের কৃষি ইত্যাদিতে কাজে লাগিয়ে আমরা আসলে বড় বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর কবলে চলে যাচ্ছি– এতে আমাদের স্বার্থ, স্বাধীনতা, স্বকীয়তা নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যে কৃষক বা যে ভোক্তা জি এম শস্য থেকে উপকার পাচ্ছেন, তাঁরা এ কথার সারবত্তা মানবেন কিনা সন্দেহ আছে। তাছাড়া ব্যবহারকারী দেশের পক্ষ থেকে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তিগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার

চেষ্টাও চলছে। এভাবেই চীন জি এম শস্য গবেষণায় অনেক দূর এগিয়েছে। আর এভাবেই 'হাইব্রিড' ধানের বীজ এখন বাংলাদেশেই প্রচুর উৎপন্ন হচ্ছে।

জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি

প্রাণি দেহে কাম্য জিন ঢুকিয়ে তাকে জিন স্থানান্তরিত প্রাণিতে পরিণত করার মূল পদ্ধতি অনেকটা উদ্ভিদের মতই, যা আমরা আগেই দেখেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহক হিসাবে ভাইরাস ব্যবহার করা হয়, অথবা সরাসরি মাইক্রো-ইনজেকশনের সূঁচ দিয়ে প্রাণিকোষে কাম্য জিনটি ঢুকিয়ে দেয়া হয়। প্রাণি দেহের সব কোষে জিনটি যেন যায়, বংশানুক্রমিক হবার জন্য তার জননকোষেও যেন যায়, এমন নিশ্চয়তা পেতে হলে জিনটি ভ্রূণ অবস্থার একেবারে শুরুর দিকে ঐ প্রাণিতে স্থানান্তর করতে হবে। স্থানান্তরের একটি প্রক্রিয়া হলো শুরুতে প্রাণিটির একটি এমব্রায়োনিক ষ্টেম সেলে জিনটি ঢুকিয়ে

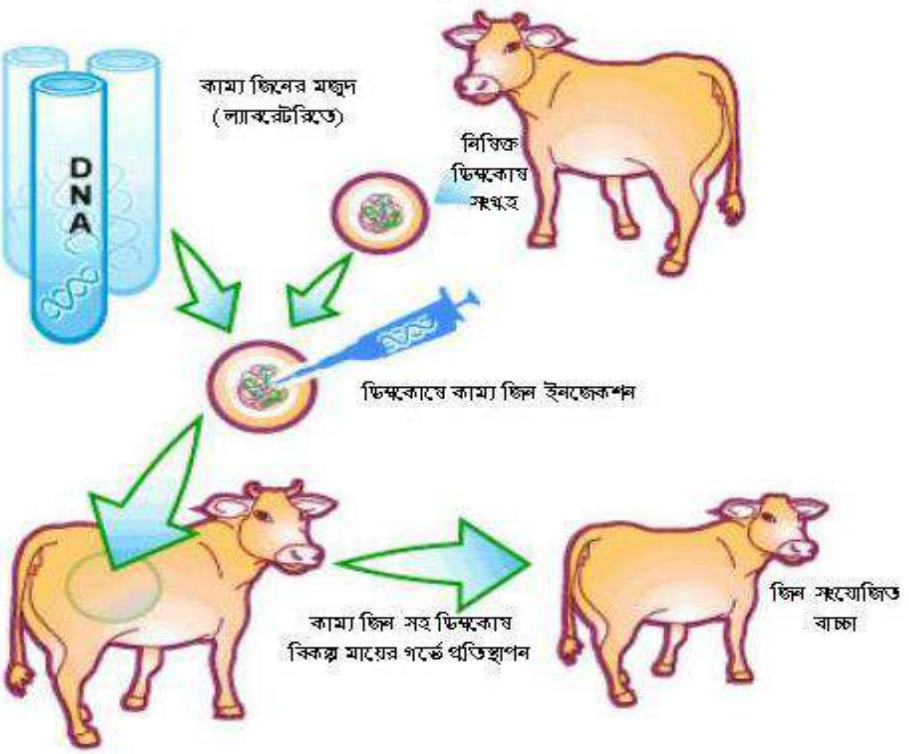

জিন সংযোজিত পশুর সৃষ্টি

তারপর সেটি প্রাথমিক ভ্রূণে সংযুক্ত করা। এমব্রায়োনিক ষ্টেম সেল বা সংক্ষেপে 'ইএস' নামে পরিচিত এরকম কোষ যে কোন প্রাণির ভ্রূণে একেবারে প্রথম দিকে থাকে, যখন এই কোষগুলো তখনো কোন বিশেষ কোষে পরিণত হয়নি– যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কোষে বিকশিত হবার ক্ষমতা এর তখনো রয়েছে। অভীষ্ট জিনের বাহক ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত করিয়ে ই এস কোষে জিনটি ঢুকানো যায়, অথবা মাইক্রো-ইনজেকশন করে। এরপর সেই ইএস'কে প্রাথমিক ভ্রূণে স্থানান্তর করলেই যে জিনটি ওখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেকগুলোতে এটি করলে একটিতে হয়তো সাফল্য আসতে পারে। সফল হওয়া প্রাথমিক ভ্রূণকে সনাক্ত করা গেলে সেটি এবার একটি স্ত্রী-প্রাণির গর্ভে স্থাপন করতে হবে তাকে বিকল্প মা হিসাবে নিয়ে। অবশ্য প্রক্রিয়াটি শুরুর জন্য এটি কয়েকটি পদ্ধতির একটি মাত্র।

জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি পাওয়ার পর্যায়গুলোর কোনটির ফলাফল খুব নিশ্চিত নয়। ধরা যাক গ্রহীতা প্রাণিটি ইঁদুর। তা হলে একটি স্ত্রী ইঁদুরে হরমোনের সাহায্যে গর্ভকালীন অবস্থার মতো দেহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তার জরায়ুতে ঐ ভ্রূণটি স্থাপন করতে হবে। সেখানে ভ্রূণটি বেড়ে উঠবে। আশা করা হবে যে ঐ ই এস কোষের বিভাজন হয়ে জিনটি ভ্রূণের পরবর্তী সব কোষে যাবে এবং সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেও যাবে। কিন্তু ইঁদুর শিশু জন্ম নেয়ার পর তার দেহে যে সত্যি সত্যি জিনটি খুঁজে পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা বড় জোর ১০-২০% এর বেশি নয়। বাচ্চাটির লেজ থেকে সামান্য টিশ্যু নিয়ে সেখানকার ডি এন এ'তে স্থানান্তরিত জিনের মার্কার-টি খুঁজে পেলেই শুধু বুঝতে হবে যে কাজটি সফল হয়েছে। এক্ষেত্রে জিনটি কোষের প্রাসঙ্গিক ক্রোমোজোমের এক কপিতেই শুধু থাকবে, দুই কপিতে নয়। পুরাদস্তুর জিন-স্থানান্তরিত ইঁদুর পাওয়ার জন্য এরকম জিন পেয়েছে এমন দুটি ইঁদুরের মধ্যে প্রজনন ঘটাতে হবে। তাদের গড়পড়তা প্রতি চারটি বাচ্চার মধ্যে শুধু একটির দুই কপি জিন সম্পন্ন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর হবার সম্ভাবনা থাকবে।

১৯৮৮ সালে সেই সুপার-ইঁদুরের পর থেকে জিন স্থানান্তরিত প্রাণির উন্নয়ন অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু বহু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। ২০০০ সালে প্রথম জিন স্থানান্তরিত ভেড়া জন্মানো হয় তার দুধে মানুষের কাছে মূল্যবান একটি প্রোটিন উৎপাদনের জন্য। এজন্য মানুষ থেকে কাম্য জিনটি নিয়ে এমনভাবে তা ভেড়ায় স্থানান্তর করা হয় যাতে জিনটির প্রকাশ ভেড়ার দুধের একটি প্রোটিনের জিন প্রমোটারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। মূল্যবান প্রোটিনটি হলো হিউম্যান ব্লাড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর যা রক্ত জমাট বাঁধাটি নিয়ন্ত্রণ করে।

এখানে একটি সমস্যা ছিল ব্যবহারের জন্য ভেড়ার দুধ থেকে ঐ প্রোটিনটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। এই বিশোধনে যদি সামান্য ঘাটতিও থাকে তাতে চলবেনা, এমনকি ৯৯.৯% বিশুদ্ধ হলেও চলবেনা– কারণ মানুষের প্রোটিনের সঙ্গে অতি সামান্য ভেড়ার প্রোটিন থাকলেও মানুষের কোষে তার বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হবে। পরে এ ধরনের বিশুদ্ধ করার সমস্যা সমাধান হলে মানুষের রোগ চিকিৎসার ব্যবহৃত এরকম প্রোটিনের জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি থেকে নিয়ে ব্যাপকভাবে বাজারজাত করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনও এভাবে সৃষ্টির কাজ এগিয়ে গেছে– বিশেষ করে জিন-স্থানান্তরিত ভেড়া ও ছাগলের দুধের মধ্যে।

সুপার-ইঁদুরের পর অনেক আশা করে সুপার-শূকর জন্মানো হয়েছিল মানুষের গ্রোথ হরমোনের জিন শূকরের ভ্রূণে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু এ ধরনের চেষ্টার বড় কিছু সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে। এর মাধ্যম দ্রুত স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠা শূকর ঠিকই সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু শিগ্‌গির এটি আর্থাইটিস, পঙ্গুত্ব, পুরুষ শূকরের দুগ্ধগ্রন্থি দেখা দেয়া ইত্যাদি নানা অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্পষ্টত এসব ক্ষেত্রে কাম্য জিনটি শরীরের কোষে কিছুটা এলোমেলোভাবে গিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল কোষকলায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী গবেষণায় এসব বিষয়ে অনেক সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে। ভ্রূণের মধ্যে জিন স্থানান্তর না করে সাধারণ একটি কোষে তা করার চেষ্টা করে, ও এতে নিশ্চিতভাবে সফল হওয়া কোষটি থেকে পরে প্রাণি ক্লোন করা হলে, এলোমেলো ভাবে জিন প্রতিস্থাপিত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। প্রাণি ক্লোনিংএ যুগান্তকারী সাফল্যের মাধ্যমে এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণি ক্লোনিং হলো স্ত্রী-পুরুষ দুয়ের সহযোগে যৌন প্রজননের বদলে শুধু ওদের একটির কোষ থেকে হুবহু তার মত আর একটি প্রাণি সৃষ্টি। একটু পর আমরা প্রাণি ক্লোনিং এর পদ্ধতিটি দেখবো।

আজকাল বিশেষ বিশেষ জিনকে সংযোজিত করে বা নিষ্ক্রিয় করে দ্রুত মাংসল হয়ে উঠা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি ম্যাড কাউ ডিজিজ অথবা দুধের ওলানের প্রদাহ মাষ্টাইটিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ রোগ প্রতিরোধী গরু সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। গরুর মধ্যে মানুষের দুধের আলফা-ল্যাকটোলবুমিন জিন সংযোজন করে গরুর দুধে মানব শিশুর জন্য আদর্শ উপাদান-অনুপাত সৃষ্টি করা গেছে। আশা করা হচ্ছে শিগ্‌গিরই মানুষকে জীবন রক্ষাকারী অঙ্গ দিতে পারবে এমন শূকর জন্মানো সম্ভব হবে, যে অঙ্গে মানুষের জিন স্থানান্তরিত হয়েছে বলে, মানুষের দেহ তা প্রত্যাখ্যান করবেনা।

আরো সাম্প্রতিক কালে কিছু চমকপ্রদ ঘটনা সম্ভব হয়েছে এভাবে। ২০০১ সালে যথাযথ জিন স্থানান্তর করে ছাগলের দুধ থেকে মাকড়সার জালের আঁশের মত রেশম-সদৃশ আঁশ পাওয়া গেছে। তার থেকে কাপড় বুনার মত বুনে ব্যতিক্রমী রকম শক্ত কাপড়ের সামরিক পোষাক, অস্ত্রোপচার শেষে সেলাই করার সূতা, টেনিস র‍্যাকেটের স্ট্রিং ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য মাকড়সার জালের সূতার এরকমই শক্ত হবার গুণ রয়েছে। জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে এই গুণটিরই ব্যাপক প্রাপ্তির চেষ্টা করা হয়েছে ছাগলের দুধে নিঃসরিত প্রোটিনে। ২০০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার এমন ভেড়া উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে যাদের ঢেকুরে ১৬% কম মিথেন উদ্গীরণ হবে। ঐ দেশের বিপুল সংখ্যক ভেড়া ঢেকুর তুলে যে প্রচুর মিথেন উদ্গীরণ করে তা গ্রীন হাউজ গ্যাস হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখে। এভাবে অস্ট্রেলিয়া মেষ পালনকারী দেশ হিসাবে নিজের দোষ কিছুটা ক্ষালন করতে পেরেছে। অর্থনৈতিকভাবে খুবই উপকারী হতে পারে এমন একটি অগ্রগতি হলো জিন-স্থানান্তরের মাধ্যমে দ্রুত বর্ধনশীল স্যামন মাছ উদ্ভাবন। এক্ষেত্রে স্যামনের আকার স্বাভাবিক থাকছে বটে কিন্তু তাদের বংশ বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে। কাজেই এই পদ্ধতিতে স্যামনের মত দামী ও উপকারী মাছের প্রাপ্যতা অনেক বেড়ে যেতে পারছে। উন্নত প্রোটিন খাদ্যের যোগান দিতে এরকম জিন-স্থানান্তরের প্রযুক্তি যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে।

যৌন প্রজননের বদলে ক্লোনিং এ জন্ম নেয়া প্রাণি

ব্যাং ও অন্য কিছু উভচর প্রাণির ক্ষেত্রে ভ্রূণ থেকে ক্লোনিং এর মাধ্যমে একের মত আরেকটি প্রাণি সৃষ্টির সক্ষমতা বেশ কিছু দিন ধরেই মানুষের ছিল। এতে নিষিক্ত হবার পর পরই ভ্রূণকে কৃত্রিম ভাবে বিভক্ত করে এমন দুটি ভ্রূণ সৃষ্টি করা হতো যাতে দুটি অভিন্ন যমজের (আইডেনটিক্যাল টুইন) মত বাচ্চার জন্ম হতো। প্রকৃতিতে মানুষসহ নানা প্রাণির এরকম অভিন্ন যমজের জন্ম তো হচ্ছেই– যারা সব দিক থেকে হুবহু একই, কারণ তারা একই ভ্রূণকোষের অভিন্ন দুই বিভাজিত অংশ থেকে সৃষ্ট, এবং তাই হুবহু একই জেনেটিক বার্তা তাদের কোষের নিউক্লিয়াস বহন করছে।

১৯৯৬ সালে কিন্তু বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি বিরাট সাফল্য বয়ে আনলেন যৌন প্রজননের সহায়তা ছাড়াই প্রথম স্তন্যপায়ীর সৃষ্টি করে– ডলি নামে ভেড়ার জন্মের মাধ্যমে। আর এটি করা হলো বয়স্ক প্রাণি-দেহের সাধারণ কোষের ভিত্তিতে। এর আগে পর্যন্ত বয়স্ক প্রাণির সাধারণ কোষকে যে আবার

ভ্রূণের কোষের মতো সম্পূর্ণ অবিশেষায়িত পরিস্থিতিতে ফেরৎ নেয়া সম্ভব এটি চিন্তাই করা যেতনা। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক একটি মেষ শাবক হিসাবে ডলির জন্ম যে প্রক্রিয়ায় হয়েছে তা এই অসম্ভবকে সম্ভব প্রমাণিত করেছে।

ডলির জন্ম প্রক্রিয়াটি ছিল এরকম। একটি বয়স্ক ভেড়ির দুধের গ্রন্থির চামড়া থেকে একটি কোষ নেয়া হয়েছে। এই ভেড়িটির হুবহু ক্লোন তৈরির জন্যই এই পদক্ষেপ অন্য বয়স্ক ভেড়ির থেকে একটি ডিম্বকোষ নিয়ে তার থেকে নিউক্লিয়াসটি বাদ দেয়া হয়েছে। প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোষটি এবং এই নিউক্লিয়াসবিহীন ডিম্বকোষটি এমনভাবে পরস্পর সংযুক্ত করা হলো যে মিলিতভাবে তারা এখন একটি প্রাথমিক ভ্রূণ হিসেবেই আচরণ করতে পারলো। এই ভ্রূণের সম্পূর্ণ ডি এন এ এসেছে সেই ভেড়িটির কাছ থেকে যার ক্লোন করতে যাওয়া হচ্ছে। এবার কয়েকবার বিভক্ত হবার পর ভ্রূণটি বিকল্প মা হিসেবে একটি ভেড়ির জরায়ুতে সংস্থাপন করা হয়েছে। তার গর্ভেই যথাসময়ে ডলির জন্ম হয়েছে। এরপর থেকে আরো নানা স্তন্যপায়ী প্রাণির ক্লোনিং সফলভাবে করা হয়েছে। তবে কোন কোনটির ক্ষেত্রে এটি এখনো সফল হয়নি বহু চেষ্টার পরেও। অনেকগুলোর চেষ্টাও এ পর্যন্ত হয়নি। তবে ডিম্বকোষের নিউক্লিয়াস সরিয়ে তাতে দেহের অন্য যে কোন অংশ থেকে বয়স্ক সাধারণ কোষ জুড়ে প্রাণির ক্লোনিং যে সম্ভব এটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতোমধ্যে বেশ কিছু ক্লোন করতে পারা স্তন্যপায়ীদের মধ্যে রয়েছে ভেড়া, ইঁদুর, গরু, ছাগল, শূকর, বিড়াল, কুকুর, খরগোস, খচ্চর, ঘোড়া, উট ইত্যাদি।

এভাবে প্রাণি ক্লোনিং করার পেছনে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে। একটি বড় উদ্দেশ্যতো অবশ্যই উন্নত জাতের কোন আদর্শ সদস্যের মত যদি হুবহু অনেকগুলো পেতে চাই তা হলে তার থেকে যৌন প্রজনন করানোর চেয়ে ক্লোন করা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য– যদি অবশ্য শরীর-স্বাস্থ্য-আয়ু ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্লোন করা প্রাণির কোন বিশেষ সমস্যা না দেখা দেয় পদ্ধতিটির ফলে। যৌন প্রজননে বাবা বা মা প্রাণি কোনটারই বৈশিষ্ট সন্তানের মধ্যে হুবহু বজায় থাকেনা- বড় জোর প্রত্যেকটির কিছু কিছু বজায় থাকে অনিশ্চিত ভাবে। কিন্তু ক্লোনিং'এ মূল প্রাণির হুবহু একই গুণাগুণ পাওয়া সম্ভব। তাই ঘোড়দৌড়ের সেরা ঘোড়াটি, সব চেয়ে সুন্দর মাংসল ভেড়াটির, বা সবচেয়ে দুধেল গাভীটির হুবহু অনেক কপি পেতে কে না চাইবে। আপাতত অবশ্য ওরকম সেরা প্রাণিটির হুবহু কপি অন্তত টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে এগুলোর দু'একটি ক্লোনিং করার মাধ্যমে। যেমন দুবাইয়ের উট প্রজনন কেন্দ্রে সেরা দৌড়ের উটের ক্লোনিং করা হয়েছে ২০০৯ সালে। বিপন্ন প্রাণি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও

এই পদ্ধতিটি সহায়ক হতে পারে– যে ক্ষেত্রে যৌন প্রজননে সমস্যার কারণেই এটি বিপন্ন হতে চলেছে। এমনকি অনেকে নিজের অতি প্রিয় পোষা প্রাণিটির মৃত্যু সহনীয় করতে আগে থেকে তার ক্লোন তৈরি করিয়েও রাখছেন।

তবে এখানে ক্লোনিং এর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ যেটি আমাদেরকে এখানে আলোচনা করতে হবে, তা হলো জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি সৃষ্টিতে তার ব্যবহার। এপর্যন্ত এরকম প্রাণি সৃষ্টির যে পদ্ধতি আমরা দেখেছি তাতে ভ্রূণ সৃষ্টির পর তার একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় কাম্য জিনটি তাতে সংযোজিত করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এরকম অনেকগুলো ভ্রূণের মধ্যে মাইক্রো-ইনজেকশন ইত্যাদির মাধ্যমে জিনটি ঢুকাবার পরও দেখা যায় যে তা সফল হয়নি। অনেক ব্যর্থ ভ্রূণ থেকে একটি দুটি সফল ভ্রূণ নিতে হয়। এতে অনেক ডিম্বকোষের অপচয় হয়, আর ডিম্বকোষ স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে খুব সহজলভ্য নয়। তা ছাড়া এই পর্যায়ে সফল হলেও ভ্রূণের মধ্যে জিনটি যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, সঠিক জায়গায় প্রকাশিত হবে কিনা এসব অনিশ্চয়তার ফলেও নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অথচ ক্লোনিং তার চমৎকার একটি বিকল্প পদ্ধতি এনে দিয়েছে। এখন জিনটি আমরা ভ্রূণে না ঢুকিয়ে বরং প্রাণিটির থেকে নেয়া যে কোন একটি কোষে ঢুকাই। এক্ষেত্রেও সফল হবার অনুপাত কম হবে, কিন্তু তাতে ক্ষতি নাই কারণ আমরা বহু কোষে ঢুকিয়ে তার মধ্যে সফলগুলো বেছে নিতে পারি। এবার এই জিন-স্থানান্তরিত কোষটিকে প্রাণি ক্লোনিং এর জন্য ব্যবহার করলে আমরা ক্লোন করা প্রাণির শরীরের সব কোষে এই জিন-স্থানান্তরিত ডিএনএ'ই পাব; প্রাণিটি অধিকতর নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্বিঘ্ন জিন-স্থানান্তরিত প্রাণিতে পরিণত হবে। এভাবে জিন-স্থানান্তরিত কোষের থেকে ক্লোনিং করে জিন-স্থানান্ত-রিত প্রাণি সৃষ্টির প্রথম উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছিল পলি নামের ভেড়ার মাধ্যমে। এভাবে এর দেহে মানুষের রক্ত জমাট বাঁধার জিন যোগ করে দেয়া হয়েছিল যাতে করে তার দুধে সেই জিনের সৃষ্ট অভীষ্ট প্রোটিন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছিল। অন্য দিকে একই পদ্ধতিতে ক্লোন করে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি জিন-স্থানান্তরিত ছাগল যা মানুষের রক্ত জমাট বাঁধার সহায়ক প্রোটিনের জিন বহন করেছে। যে সব মানুষে এ প্রোটিনের অভাব ঘটে তাদের রক্ত নালীতে বিপজ্জনক ক্লট জমাট বাঁধার সম্ভাবনা থাকে। এখন জিন-স্থানান্তরিত এসব ক্লোন প্রাণির দুধ থেকে এই জরুরী প্রোটিনটি মানুষ পাবে। ক্লোন করা গরুতে এভাবে সৃষ্টি করা গেছে মানুষের পলিক্লোনাল এন্টিবডি, যা এন্টিবায়োটিক-নিরোধী হয়ে পড়া প্রদাহ থেকে রক্ষা করতে পারে।

ক্লোন করা প্রাণিতে জিন-স্থানান্তর মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর একটি বিরাট সম্ভাবনার দিক সৃষ্টি করেছে– সেটি হলো এক একটি রোগকে বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝার জন্য সহজতর উপায় এনে দিয়ে। মানুষ রোগীর ক্ষতি না করে তার উপর পরীক্ষা নিরিক্ষা করা কঠিন। তাই এখন ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণি মডেলের কোষে এই রোগ সৃষ্টিকারী জিন সংযুক্ত করে তার থেকে এ রোগের ঝুঁকিতে থাকে এমন প্রাণি ক্লোন করে নেয়া হয়েছে। এ প্রাণির উপর পরীক্ষা নিরিক্ষা করেই রোগটির গবেষণা এখন চলতে পারছে। উদাহরণ স্বরূপ সিস্টিক ফিব্রোসিস রোগের গবেষণার জন্য এর জিন সংযোজিত শূকর ক্লোন করা হয়েছে। এই কঠিন বংশগত রোগটির বিষয় আমরা আগে দেখেছি। আজকাল এমন বিশেষায়িত কোম্পানীই রয়েছে যার কাজ হলো মানুষের বিভিন্ন রোগের জিনবাহী ইঁদুর ক্লোন করা– এ সব রোগের গবেষণায় সহায়ক হওয়ার জন্য।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি সম্পর্কেও যে অনেকের আপত্তি থাকবে তা বলা বাহুল্য। অবশ্য জি এম উদ্ভিদের মতো এগুলো এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। তাই আপত্তির ব্যাপকতাটি এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম বটে, কিন্তু এর ঘোরতর সমালোচকের অভাব নাই। কারণগুলো মূলত একই রকমের– প্রকৃতির উপর এতখানি হস্তক্ষেপ সইবেনা, এর নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে আসবেই এমনটি মনে করা। জিন-স্থানান্তরিত প্রাণিকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনো কিছু কিছু সমস্যা রয়ে গেছে বলে সমালোচনাগুলো বেশি উচ্চকিত হতে পারছে। সমালোচকরা আশঙ্কা করছেন জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি থেকে দুধ, মাংস, চিকিৎসার প্রোটিন ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা শেষ পর্যন্ত অজানা বিষময়তার শিকার হতে পারি– কারণ এর সব প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাল টেষ্টিং হয়নি বলেই তাঁদের ধারণা। বিশেষ করে আমাদের খাদ্য চেইনে এলার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান, এন্টিবায়োটিক-নিরোধী বস্তু ইত্যাদি ঢুকে পড়ার আশঙ্কা তাঁরা করছেন, যেমন করা হচ্ছে জি এম শস্যের ক্ষেত্রে। তা ছাড়া নৈতিক আপত্তির প্রশ্ন তো রয়েছেই। জিন-স্থানান্তরিত প্রাণির ক্ষেত্রে যেমন তা আছে, তেমনি প্রাণির ক্লোন করার ক্ষেত্রেও অনেকের প্রবল নৈতিক আপত্তি রয়েছে। অনেকে এমন আশঙ্কাও করছেন যে ভবিষ্যতে জিন-স্থানান্তরের মাধ্যমে মানুষের দেহে অন্য প্রাণির অঙ্গ সংযোজন সহজ হয়ে পড়লে আমরা বিভিন্ন প্রাণির নানা অংশ নিয়ে কিম্ভূত কিমাকার জগা-খিচুড়ি প্রাণিতে পরিণত হতে পারি। তবে এগুলো অতি-কল্পনা। এক্ষেত্রেও গবেষণার এই নবদিগন্ত যে সব অভাবনীয় সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে সেগুলোকে উপেক্ষা করার উপায় মোটেই নাই।

জিনের নিয়ন্ত্রণে জিন

জিনের কাজ এত সরল নয়

এখন সম্পূর্ণ জেনোমের উদ্ঘাটন যতই ভাল ভাবে হচ্ছে, ততই আমরা বুঝতে পারছি যে এক জিন, এক প্রোটিন, এক বৈশিষ্ট, এরকম যে সরল চিত্রটি আমরা এঁকেছি এটি পুরাপুরি সঠিক নয়। প্রাথমিক ভাবে বুঝার জন্য এই সরল চিত্রটি সুবিধাজনক বটে, তবে বাস্তবে বিষয়টি অনেক জটিলতর। এর কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবের একটি বৈশিষ্ট একাধিক জিনের উপর নির্ভর করে, একাধিক প্রোটিনের কাজের ফলে। তাছাড়া একটি জিন থাকলেই যে সেটি কার্যকর (প্রকাশিত) হবে এমন কোন কথা নাই। কয়েকটি জিনের সামগ্রিক কাজের মধ্যে কোন্‌টি কখন কার্যকর থাকছে বা না থাকছে, বা অদৌ কোনটি তা থাকছে কিনা, শেষ পর্যন্ত ফলাফলটি তার উপর নির্ভর করবে। আর এসব জিন সব সময় পরস্পরের থেকে স্বাধীন ভাবে কাজ করেনা, বরং পরস্পরের উপর নির্ভর করে, নানা জিনের সৃষ্ট বিভিন্ন প্রোটিনের উপর নির্ভর করে। তাই জিনের থেকেও জিন গুচ্ছের এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াটিই প্রায়শ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তাই এক একটি জিনকে পৃথক ভাবে বুঝা যেমন জরুরী তার চেয়েও জরুরী হচ্ছে জেনোমে নানা জিনের সামগ্রিক ফলাফলকে বুঝা। একক জিন হিসাবে দেখলে দুটি প্রাণির জিন প্রায় সর্বাংশে এক হয়েও দুই প্রাণিতে তাদের সামগ্রিক ফলাফলে বিশাল তফাৎ দেখা যেতে পারে। মানুষ ও শিম্পাঞ্জির উদাহরণে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট।

সব জিনের প্রকাশ যে সব সময় ঘটেনা তা আমরা বহুকোষী যে কোন জীবের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। এর দেহের প্রত্যেকটি কোষের ডি এন এ একই, তাতে জিনগুলোও হুবহু একই। এসবের মধ্যে শুধু কিছু জিন আছে যেগুলো সব কোষে সব সময় প্রকাশিত হয়। এদেরকে বলা যায় 'ঘর-কন্নার জিন' সার্বক্ষণিক প্রয়োজনে সব সময় যাদেরকে কার্যকর থাকতে হয়। এগুলোর মধ্যে আছে আর এন এ সৃষ্টির পলিমারেজ প্রোটিন তৈরি, রিবোজোমের জন্য প্রোটিন তৈরি, ইত্যাদি কাজের জিন। আর অন্য জিনগুলোকে বলা যায় 'বিলাসিতার জিন'। অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা অবশ্য নয়, তবে প্রয়োজনটি সব কোষে সমান ভাবে নয়। এগুলো শুধু বিশেষায়িত কোন কোন কোষেই প্রকাশিত হয়। যেমন যে জিনগুলো লিভারের মধ্যেকার কোষগুলোকে লিভারের কাজ করায় সেগুলো শুধু লিভারের কোষেই প্রকাশিত হবে, চামড়ায় বা অন্য

কোথাও প্রকাশিত হবে না- যদিও সেখানেও জিনগুলো রয়েছে। এভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কোষ বিশেষায়িত হতে পারে এই বিলাসিতার জিনের কারণে। ঐ অঙ্গের জন্য অপ্রয়োজনীয় অন্য জিনগুলো সেখানে যেন সুইচ অফ্ করা থাকে, কার্যকর না হবার জন্য। এই সুইচ অন্ করা বা অফ্ করার দায়িত্বও কিন্তু ভিন্ন রকম কিছু জিনের– যারা হলো নিয়ন্ত্রণকারী জিন। ব্যাকটেরিয়ার মত এককোষী জীবে এরকম বিশেষায়নের প্রয়োজনীয়তা নাই বটে তবুও সেখানে অন্য প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকারী জিন থাকে।

একটি জিনকে সুইচ অন্ বা সুইচ অফ্ করার কাজটি কয়েক পর্যায়ে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে একটি জিন কার্যকর হয় সফল ভাবে তার বার্তা অনুযায়ী প্রোটিনটি তৈরি করার মাধ্যমে। আগেই আমরা দেখেছি এর জন্য প্রথমে ডি এন এ থেকে এম আর এন এ'তে তার 'ট্রান্সক্রিপশন' হতে হয়, যাতে ডিএনএ'র বার্তা নকল হয়ে

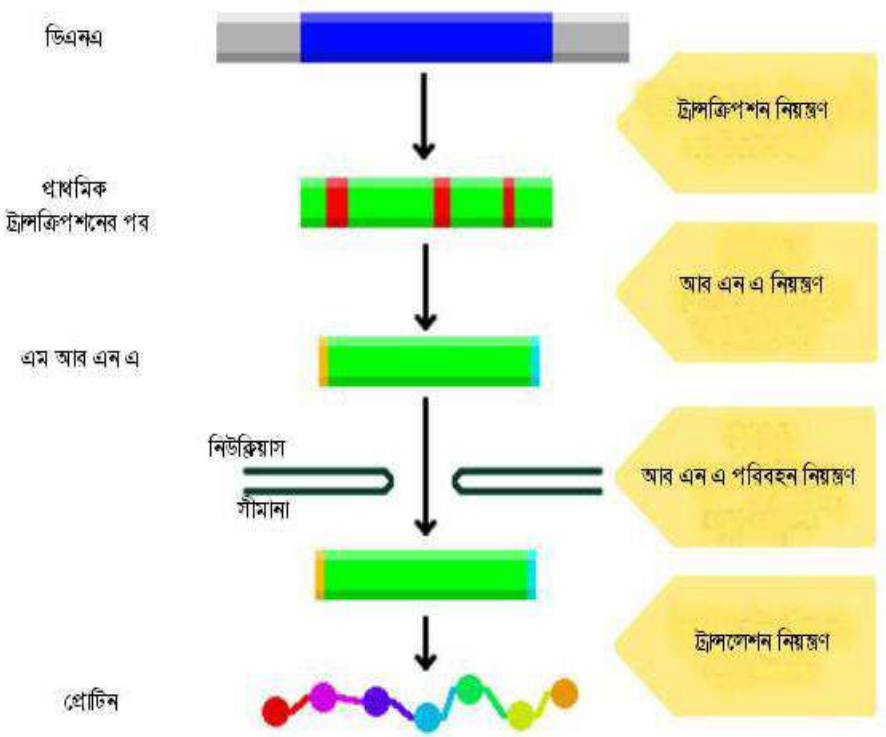

জিন নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার নানা পর্যায়

নিউক্লিয়াসের বাইরে যেতে পারে। তারপর এম আর এন এ থেকে টি আর এন এ'তে তার 'ট্রান্সলেশন' হতে হয়, যাতে করে সঠিক এমাইনো এসিডগুলো সন্নিবেশিত হবার মাধ্যমে প্রোটিনটি তৈরি হতে পারে। নিয়ন্ত্রণকারী জিন এর যে কোন পর্যায়ের কাজকে আটকিয়ে দিয়ে জিনটির সুইচ অফ্ করে দিতে পারে। এটি ট্রান্সক্রিপশন পর্যায়ে হতে পারে, এম আর এন এ'কে নিউক্লিয়াস থেকে রিবোজোমে প্রোটিন তৈরির জন্য যাবার পথে বাধা দিয়ে হতে পারে, সেখানে এর বার্তা অনুযায়ী এমাইনো এসিড সাজানোর পর্যায়ে হতে পারে। এর মধ্যে যে কোন পর্যায়ে বাধ সাধলে জিন আর প্রকাশিত হতে পারেনা। সাধারণত অবশ্য বাধা দেবার এ কাজ হয় শুরুতেই ট্রান্সক্রিপশন পর্যায়ে। বহুকোষী জীবের ডি এন এ'তে একটি জিনের প্রারম্ভ যেখানে ঘটে তার একটু আগের দিকে ডি এন এ'র একটি অংশ থাকে যাকে বলা হয় 'প্রমোটার' বা সাহায্যকারী। পলিমারেজ এনজাইম এই প্রমোটারকে চিনতে পেরে তার সঙ্গে শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেখান থেকে ডি এন এ'র দুটি সূত্রকে আলাদা করে ট্রান্সক্রিপশনের কাজ শুরু করে দেয়। কোষের পরিবেশ এমন কিছু বস্তু সৃষ্টির মাধ্যমে এক রকম ইশারা দিতে পারে যা ঐ প্রমোটারের কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে ট্রান্সক্রিপশন হতে দেয়না– অর্থাৎ জিনটির সুইচ অফ্ করে দেয়। প্রতিবেশি অন্যান্য জিন থেকেই এই ইশারার সূত্রপাত হতে পারে। কাজেই জিনের প্রকাশের বিষয়টি কয়েকটি জিনের যৌথ কার্যক্রমের ব্যাপার– একক জিনের নয়, বরং কতগুলো জিনের মিলিত নেটওয়ার্কের ব্যাপার।

সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের একটি উদাহরণঃ ল্যাক অপারোন

ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া দুধের চিনি ল্যাকটোজকে হজম করতে পারে, একে গ্যালাকটোজ আর গ্লুকোজ এই দুটি সরলতর চিনিতে পরিণত করার মাধ্যমে। যতক্ষণ ওখানে ল্যাকটোজ না থাকছে ততক্ষণ অপ্রয়োজনীয় বিধায় এই হজম প্রক্রিয়ার জিনগুলো অপ্রকাশিত থাকে। কিন্তু সেখানে ল্যাকটোজ থাকলে ঐ জিনগুলো চালু হয়। ল্যাকটোজ থাকা না থাকার উপর নির্ভর করে এই বন্ধ থাকা বা চালু হওয়ার ব্যাপারটি ঘটে কী ভাবে? এর কার্যপ্রণালীটি অনুসরণ করে আমরা দেখতে পারি কী ভাবে একটি কাজের জন্য কয়েকটি জিন এক সঙ্গে কাজ করে, এমনকি নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলোও এক সঙ্গে কাজ করে। এভাবে একই সঙ্গে কাছাকাছি থাকা, একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হওয়া জিনগুলোকে সামগ্রিক ভাবে বলা হয় অপারোন। ল্যাকটোজ হজমের এই অপারোন হলো ল্যাক অপারোন। ল্যাক অপারোনে মূল কাজগুলো করার যে জিনগুলো তার

শুরুতে থাকে প্রমোটার। কিন্তু তার পর পরই থাকে অপারেটর বলে একটি ডি এন এ অংশ যা সামগ্রিক অপারেশন বা কার্যকারিতার জন্য দায়ী। এই অপারেশন থেকেই অপারোন কথাটি এসেছে।

ল্যাকটোজকে ভেঙ্গে সরলতর চিনিতে পরিণত করার কাজটি ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া করে মোট তিনটি এনজাইমের সামগ্রিক কাজের ফলে, যাদের জিনের নাম দয়া হয়েছে ল্যাক A, ল্যাক Y, এবং ল্যাক Z। এই তিনটি জিন ল্যাক অপারোনে পাশাপাশি থাকে এবং এদের কাজের ফলে তিনটি এনজাইমই সামগ্রিক ভাবে তৈরি হতে পারে। এগুলো হলো গঠনের জিন, অর্থাৎ দেহবস্তু গঠনই এদের উদ্দেশ্য। এ সব এনজাইম যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয় এবং তার

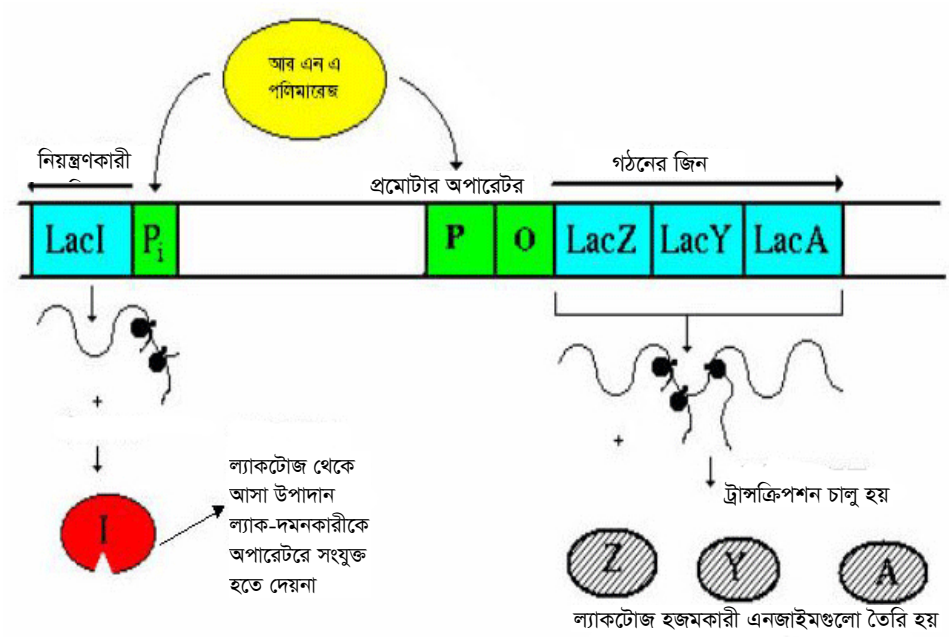

ল্যাক অপারোন: ল্যাকটোজ থাকলে গঠনের জিন কার্যকর হয়

পরিমাপও করা যায়। একটি এম আর এন এ এই তিনটির বার্তা নিয়ে নেয় এবং একটি মাত্র প্রমোটার দিয়ে তা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং একই সঙ্গে তিনটি এনজাইমই তৈরি হয়। এগুলো ছাড়া আরো একটি জিন ল্যাক অপারোনে আছে যাকে বলা হয় ল্যাক I। এটি কিন্তু গঠনের জিন নয়– বরং নিয়ন্ত্রণকারী জিন। এটিও প্রোটিন তৈরি করে– তবে তা স্বল্প পরিমাণ প্রোটিন যার একমাত্র কাজ নিয়ন্ত্রণ। এ প্রোটিনকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়না বা পরিমাপ করা যায় না। ল্যাক I তৈরি করে রিপ্রেসর বা দমনকারী নামক বস্তু যা অপারেটরের সঙ্গে

আবদ্ধ হলেই সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়– গঠনের জিনগুলোর সুইচ অফ্ হয়ে যায়। এর কারণ তখন রিপ্রেসর অপরাটেরকে দখল করে এবং ফলে সেখানে আর এন এ পলিমারেজকে যেতে দেয়না। অপারেটরের অপারেশনের জন্য (কার্যকারিতার জন্য) অর্থাৎ জিনের ট্রান্সক্রিপশনের জন্য এই পলিমারেজ এনজাইম প্রয়োজন। ফলে ল্যাক A, ল্যাক Y, এবং ল্যাক Z এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে হজমের এনজাইমগুলো তৈরিও বন্ধ হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণকারী জিন ল্যাক I নিয়ন্ত্রণের কাজটি করে ঐ রিপ্রেসর প্রোটিনটি তৈরি করার মাধ্যমে। এই ঘটনাটি ঘটে যখন ল্যাকটোজ থাকে না অথচ গ্লুকোজ থাকে তখন। এরকম সাধারণ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে ল্যাকটোজ হজমের এনজাইম তৈরি করে শক্তি ও বস্তু ক্ষয়ের কোন মানে হয় না, তাই এই ব্যবস্থা। এখন এর মধ্যে সামান্য ল্যাকটোজও যদি দেখা দেয় তা হলে ল্যাকটোজেরই তৈরি একটি উপাদান ইনডিউসার বা উৎসাহদাতার কাজ করে এবং রিপ্রেসরকে অপারেটরের সঙ্গে আবদ্ধ হতে বাধা দেয়। ফলে অপারেটর এখন জিনকে সক্রিয় করে হজমের এনজাইমগুলো তৈরির অপারেশনটি আবার চালু করে দেয় যার ফলে হজমের কাজ এখন চলতে পারে। স্পষ্টত জিনের নিয়ন্ত্রণ কোষের মধ্যে তার পরিবেশের নানা বস্তুর উপর যথেষ্ট নির্ভর করছে।

বহুকোষী জীবে জিনের নিয়ন্ত্রণ

ই-কলাই এর মত এককোষী ব্যাকটেরিয়ায় জিন নিয়ন্ত্রণকে যে ভাবে দেখলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল নিউক্লিয়াস সম্পন্ন জীবকোষে, বিশেষ করে এরকম বহুকোষী জীবে। জটিলতা আসে মূলত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের প্রোটিনের কাজ জড়িত হয়ে পড়ে বলে। যেমন এখানে জিনের ট্রান্সক্রিপশনে তিন রকম পলিমারেজ এনজাইম প্রয়োজন হয়, যার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ভিন্ন প্রমোটার থাকে। এরকম জীবের কোষগুলোকে হতে হয় খুবই বিশেষায়িত– যত উচ্চতর প্রাণি, তত বেশি বিশেষায়িত। তাই নানা কোষে নানা জিনের প্রকাশের সুইচ অন্ বা অফ্ করার সূক্ষ্ম জটিল ব্যবস্থা প্রয়োজন বৈকি। প্রমোটারগুলোর দক্ষতা বাড়িয়ে নেবার জন্য এনহান্সার বা উদ্দীপক নামে জিনের আর একটি অংশ থাকে, যা মূল জিনটির আগে বা পরে যে কোন জায়গায় থাকতে পারে, কখনো বা এর থেকে বেশ দূরেও। আবার এর বিপরীতে প্রমোটারের দক্ষতা কমিয়ে ফেলার জন্য সাইলেন্সার বা নীরবকারী নামের অংশও থাকে। অনেকগুলো প্রমোটার এনহান্সারের সঙ্গে জড়িত হয়, এবং অন্য অনেকগুলো সাইলেন্সারের সঙ্গে

জড়িত হয়। প্রকাশিত হবার জন্য সফল ট্রান্সক্রিপশন হতে হলে প্রমোটার ও এনহান্সারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এরকম কিছু প্রোটিনের উপস্থিতি দরকার হয় যাদের বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর।

এক্ষেত্রে যে ট্রান্সক্রিপশন পর্যায়েই নিয়ন্ত্রণের কাজটি প্রধানত হয়, একটি প্রমাণ হলো বিশেষায়িত কোষের নিউক্লিয়াসে দেখা যায় কোন প্রোটিনের জন্য প্রচুর এম আর এন এ পাওয়া যাচ্ছে, আবার কোন প্রোটিনের এম আর এন এ খুবই কম। আমরা জানি যে নিউক্লিয়াসে এম আর এন এ তৈরির মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপশন ঘটে, এতে ঘাটতি থাকলে ঐ প্রোটিনের জন্য আদৌ ট্রান্সক্রিপশন হয়নি বলে ধরে নেয়া যায়। কোন কোষে বিশেষ কোন প্রোটিন তৈরির একটি উদাহরণ নেয়া যাক। রক্তের লোহিত কণিকার মূল কাজটি করে হেমোগ্লোবিন প্রোটিন, যা কয়েকটি গ্লোবিন ও কয়েকটি হেইম অণু দিয়ে গঠিত হয়। গ্লোবিন তৈরির যে এমআরএনএ তার প্রায় ৫০,০০০টি তাই একটি লোহিত কণিকায় দেখা যায়। অথচ ঐ কণিকায় যদি আমরা অন্য রকম একটি এমআরএনএ, যা ডিম্বনালীতে থাকা ওভালবুমিন প্রোটিন তৈরি করে, সেটিকে খুঁজতে যাই তা হলে তা দু'একটির বেশি পাওয়া যায়না। অন্য দিকে ডিম্বনালীর কোষে ওভালবুমিনের এমআরএনএ প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু গ্লোবিনের এমআরএনএ খুবই কম। এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে জিনের সুইচ অন্ বা অফ্ করার কাজটি ট্রান্সক্রিপশন পর্যায়েই ঘটে যাচ্ছে। তবে বিরল কিছু ক্ষেত্রে আরো পরের পর্যায়ে অর্থাৎ ট্রান্সলেশন পর্যায়েও নিয়ন্ত্রণ ঘটে থাকে। যেমন ডিম্বকোষের বিকাশের সময় ম্যাটারনাল ম্যাসেজ বা মাতৃবার্তা নামের কিছু এম আর এন এ প্রচুর পরিমাণে ডিম্বকোষের কোষরসে সঞ্চিত থাকে। নিউক্লিয়াসের মূল ডি এন এ বার্তা থেকে ট্রান্সক্রিপশনের এমআরএনএ তৈরি হয়ে না এলেও ঐ সঞ্চিত এম আর এন এ দিয়েই যথারীতি ট্রান্সলেশন চলতে পারে। অর্থাৎ ডিম্বকোষের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন যে কোন অবস্থাতেই তৈরি হতে পারে। এগুলোর ফলে কোন কোন প্রাণির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেই ডিম্বকোষটি শুক্রকোষ দিয়ে নিষিক্ত হলো অমনি ঐ প্রোটিনগুলোর জন্য ট্রান্সলেশনের মাত্রা ৫০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। প্রয়োজনের সময় সঠিক ইশারা পেয়ে সঞ্চিত এম আরএনএ'গুলো তাদের কাজ শুরু করে দেয় বলেই এমনটি ঘটতে পারে।

একটি কোষ থেকে ভ্রূণ, ভ্রূণ থেকে পূর্ণ শিশু, এসব কিসের ইঙ্গিতে?

শুক্রকোষ দিয়ে নিষিক্ত একটি ডিম্বকোষ নেহাৎ একটি কোষ মাত্র। এই কোষে বাবা-মা থেকে পেয়ে নবাগত শিশুর সকল জিন থাকে এবং সবই পরে

প্রকাশিত হবার মত অবস্থায় থাকে। এই কোষ পর পর কয়েকবার বিভাজিত হয়ে যখন কয়েকটি মাত্র কোষের গুচ্ছ হিসেবে থাকে ভ্রূণের শুরুতে, তখনো সব কোষে সব জিন পরে প্রকাশিত হবার মত অবস্থায় থাকে। যে কারণে এ কোষগুলোকে আমরা বলি ভ্রূণের ষ্টেম সেল। কিন্তু আরো বিভাজন হতে হতে শিগ্‌গির এমন একটি পর্যায়ে ভ্রূণটি আসে যখন সব কোষে সব জিন আর প্রকাশিত হতে পারেনা, নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি এসে পড়ে। সেই অনুযায়ী তখন ভ্রূণের কোন অংশ দেখা দেয় শিশুর এই অঙ্গের শুরু হিসাবে, আবার কোন অংশ দেখা দেয় ঐ অঙ্গের শুরু হিসাবে। এভাবে কোষগুলো বিশেষায়িত হয়ে উঠে। যতই দিন যায় ভ্রূণটি ততই পূর্ণাঙ্গ শিশুর রূপ লাভ করে। এই যে বিকাশের প্রক্রিয়া এটি যে কীভাবে পরিচালিত হয়, কিসের ইঙ্গিতে পর পর হয়ে চলে, তা এক বিরাট রহস্য।

মূল নিষিক্ত কোষটি বিভিন্ন প্রাণিতে কতবার বিভাজিত হওয়া পর্যন্ত সব কোষে সব জিন প্রকাশে সক্ষম থাকে? অভিন্ন যমজ জন্মের ঘটনা থেকে তা আমরা বুঝতে পারি। সব জিন প্রকাশে সক্ষম অবস্থায় একটি কোষ ভাগ হয়ে দুটি একই জিন বিশিষ্ট শিশু (অভিন্ন যমজ) জন্ম দিতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচটি পর্যন্ত অভিন্ন যমজ জন্ম নিতে দেখা গেছে। তার থেকে বুঝা যায় যে মানুষের নিষিক্ত কোষ অন্তত তিনবার বিভাজিত হয়ে ছয়টি কোষে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সব জিন প্রকাশক্ষম অবস্থায় থাকে, কিন্তু তারপর? কোষগুলো যখন বিশেষায়িত হয়ে উঠে তখন অন্য জিনগুলো যেগুলো প্রকাশিত হচেছনা সেগুলো কি আদৌ সেসব কোষে থকে? এটি কী ভাবে বুঝবো? ব্যাঙের ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ পরীক্ষণে এটি স্পষ্ট হয়। ব্যাঙের ডিমের নিউক্লিয়াসকে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি দিয়ে নষ্ট করে সেখানে ব্যাঙাচির অন্ত্রের দেয়াল থেকে নেয়া কোষের নিউক্লিয়াস মাইক্রো-ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে নেয়া হয়েছে। এই ডিম থেকে তখন ক্লোন করা ব্যাঙের ভ্রূণ পাওয়া যায়। এই ভ্রূণের ডি এন এ এখন কিন্তু সেই অন্ত্রের দেয়ালের ডি এন এ যার কিছু কিছু জিনই শুধু প্রকাশিত বাকিগুলো অপ্রকাশিত থাকে। অথচ এই ভ্রূণের কয়েকটি কোষ থেকে নিউক্লিয়াস নিয়ে তা আর কয়েকটি নিউক্লিয়াস নষ্ট করা ডিমে স্থানান্তরিত করা হলে সেগুলো থেকে যথারীতি পূর্ণ ব্যাঙ্গাচি জন্ম নিতে দেখা গেছে, অর্থাৎ তাতে সব জিন আবার প্রকাশিত হয়েছে। এর থেকে বুঝা যায় অন্ত্র-দেয়ালের ডি এন এ'তে বহু জিন অপ্রকাশিত থাকলেও অন্যত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলো আবার প্রকাশিত হয়েছে ব্যাঙাচির নানা অঙ্গ তৈরির সময়। স্পষ্টত অন্য জিনগুলো বরাবরই সেখানে অক্ষুণ্ন ছিল।

একটি কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশুর যে বিকাশ প্রক্রিয়া– এটি একটি ক্রমাগত উন্মোচনশীল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার। এর একটি পর্যায়ের কাজ পরবর্তী পর্যায়ের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যাতে বিশেষ বিশেষ জিনগুলো প্রকাশিত হয়ে সে পর্যায়ের নূতন কাজগুলো হতে পারে। যেমন এক পর্যায়ে এরা কিছু কিছু কোষকে বিশেষ সন্নিবেশে সংযুক্ত করে এক এক রকমের টিশ্যু তৈরি করে। পরের কোন পর্যায়ে টিশ্যুগুলো পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারে বিভিন্ন অঙ্গ তৈরির কাজে। এই পরস্পর বিক্রিয়াগুলোও সম্ভব হয় নিয়ন্ত্রণকারী জিনের কারণেই, যেগুলো ঠিক ঐ পর্যায়ে গিয়ে সক্রিয় হয়। উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন প্রাণির ভ্রূণের শুরুর দিকের একটি পর্যায়ে কোষের দুটি স্তর তৈরি হয়– একটি এক্টোডার্ম এবং অন্যটি এন্ডোডার্ম। এই দুইয়ের বিক্রিয়ায় পরে এদের মাঝখানে সৃষ্টি হয় আর একটি স্তর মেসোডার্ম। আরো বিক্রিয়ায় এরা সৃষ্টি করে নটোকর্ড যাতে এরা স্নায়ুরজ্জুকে একটি নলের আকৃতির মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে। এই বিশেষ গোষ্ঠির প্রাণিতে এভাবেই চলতে থাকে ভ্রূণ থেকে শিশুর বিকাশ।

আর একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিশেষায়িত হবার সময় নূতন বিভাজিত একটি কোষ এক অঙ্গের জন্য বিশেষায়িত হচ্ছে, অন্যটি আর একটির জন্য বিশেষায়িত হচ্ছে; কোন্‌টি কোন দিকে বিশেষায়িত হবে এটি কীভাবে নির্ধারিত হলো? দেখা গেছে এর জন্য একটি নির্ধারণ পদ্ধতি রয়েছে। একাজের জন্য কতগুলো বস্তু থাকে যাদের বলা হয় 'নির্ধারক'। এরা ডিম্বকোষে অসমভাবে বন্টিত থাকে। পরে মূল কোষের বিভাজনের মাধ্যমে এর নানা অংশের সৃষ্ট যে কোষে যে ধরনের নির্ধারক গেছে সেই অনুযায়ীই সেটি বিশেষায়িত হয় সেই অঙ্গের জন্য। আমরা ডিম্বকোষে সঞ্চিত যে মাতৃবার্তা এম আর এন এ'গুলো দেখেছি সেগুলোও এই নির্ধারকের কাজ করে। তবে অন্য রকম নির্ধারকও রয়েছে।

তাছাড়া প্রভাবক হিসাবে কাজ করার মত এক ধরনের বস্তু এক এক রকমে এক এক অঙ্গে দেখা দেয়। এদের প্রভাবেও ওখানকার কোষগুলোর জিন প্রকাশ ঘটা না ঘটা নির্ভর করে। যেমন দেখা গেছে যে ভ্রূণের গ্রাষ্টুলা নামক একটি পর্যায় পর্যন্ত ভ্রূণের একটি অঙ্গের কোষকে অন্য অঙ্গে স্থানান্তরিত করলে সেটি এখন নূতন অঙ্গের অন্যান্য কোষের মতই জিন প্রকাশ করে। ওখানকার প্রভাবকগুলো দিয়ে প্রভাবিত হয়েই এরা এরকম করে। নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি যে ঠিক কী ভাবে কাজ করে তা এখনো পুরাপুরি জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে যে বিশেষ বিশেষ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নির্ধারক ঠিক করে

দিতে পারে ওখানে কোন্ জিনগুলো প্রকাশিত হবে। এভাবে সুনির্দিষ্ট কিছু জিনের প্রকাশ নির্ধারিত হয়ে গেলে কোষটি নিজেই একটি অঙ্গের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

হোম বক্স জিন

বিশেষায়িত কোষের নির্ধারণ ঘটাবার জন্য যে জিনগুলো রয়েছে তার মধ্যে খুব চমকপ্রদ কিছু জিনকে বলা হয় হোম বক্স জিন বা সংক্ষেপে হক্স জিন। এদেরকে দেখা যায় এক ধরনের মাষ্টার কন্ট্রোলার জিন হিসাবে, যারা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আরো অনেক জিনকে সুইচ অন্ করে শরীরের নানা অংশে নানা অঙ্গের নির্ধারণ করে থাকে। সুপরিচিত ড্রসোফিলিয়া মাছির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ড্রসোফিলিয়ার মৌলিক দেহ-পরিকল্পনাটি নির্ধারণে মূল অবদানটি

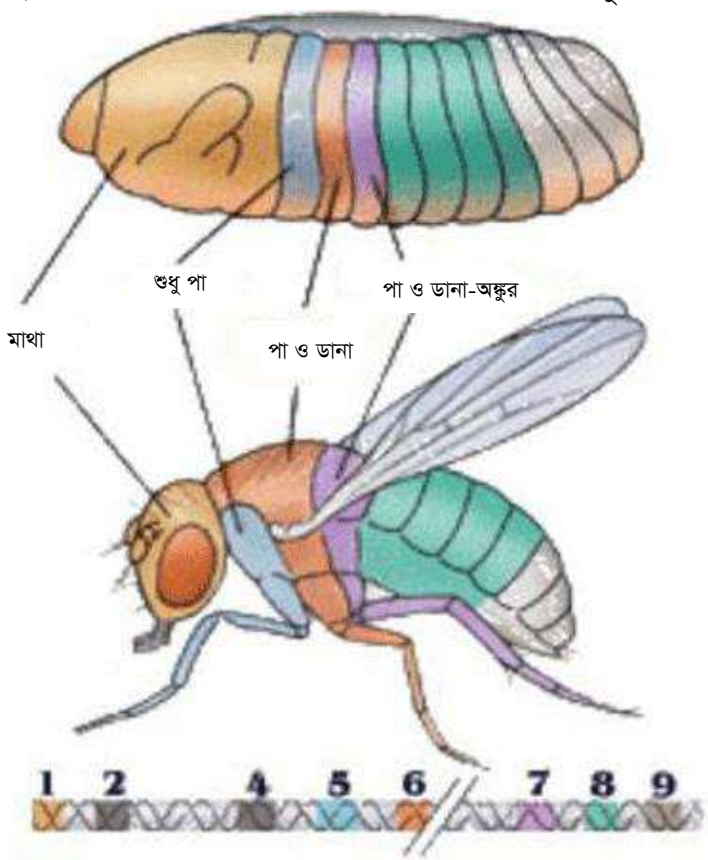

ভ্রূণ ও পূর্ণাঙ্গ মাছিতে দেহ পরিকল্পনাঃ হক্স-জিন নিয়ন্ত্রিত

রাখে তিন দল জিন। এদের একদলকে বলা হয় ম্যাটারনাল এফেক্ট জিন (মাতৃ প্রক্রিয়া জিন)। এরা ডিম সৃষ্টির সময় ডিমের ভেতরেই সামনে পেছনে ইত্যাদি নানা দিকের অসাম্য সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় দলটিকে বলা হয় সেগমেন্টেশন জিন (অংশে বিভাজনের জিন)- এরা শরীরের বিভিন্ন অংশকে নির্ধারণ করে দেয়, যেমন মাথা, বুক, পেট ইত্যাদি। তৃতীয় দলটিকে বলা হয় হোমিটিক জিন (অঙ্গ নির্ধারণের জিন)– যেগুলো কোন্ অংশে কোন অঙ্গ থাকবে তা নির্ধারণ করে দেয়। আসলে মাষ্টার কন্ট্রোলার হিসাবে হোমবক্স জিনগুলো ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলোকে তৈরি করে। আর সেগুলোই এই তিনটি বিভিন্ন দলের জিনকে যথাযথ ক্ষেত্রে সুইচ অন্ করে মাছির দেহ পরিকল্পনা করে। অন্যান্য প্রাণির ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটতে দেখা গেছে। মজার ব্যাপার হলো দেহে মাথা, বুক, পেট ইত্যাদি অংশগুলো যার পরে যে ভাবে থাকে তাদের হক্স জিনগুলোও জেনোমের মধ্যে সেই একই ক্রমে থাকে।

আসলে নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলোর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বস্তুগুলো পর্যায়ক্রমে ডিম থেকে ভ্রূণ, তার থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণি-শিশু সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি উন্মোচিত করে। একেবারে ডিম থেকে প্রথমেই ম্যাটারনাল এফেক্ট জিনগুলো প্রকাশিত হয়।

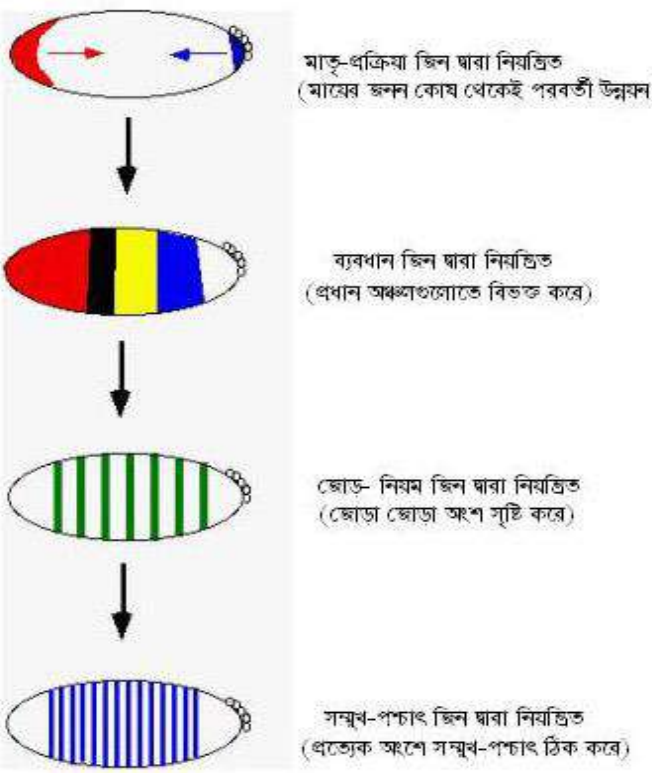

ডিমের মধ্যে এই নির্ধারকগুলো অসমভাবে বণ্টিত থাকে। ম্যাটারনাল এফেক্ট জিন থেকে ডিমে ও পরে ভ্রূণে অসমভাবে বণ্টিত ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর সৃষ্টি হয়। এতেই এর কোন্‌টি সামনের দিক কোন্‌টি পেছনের দিক ইত্যাদি নির্ধারণ সহ সামগ্রিক দেহ পরিকল্পনা ঠিক হয়ে যায়। এরাই অংশ বিভাজনের সেগমেন্টেশন জিনগুলোর প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এগুলো আগের ম্যাটারনাল এফেক্ট জিনের ইশারাগুলোতে সাড়া দিয়ে কাজ করে। এদের সৃষ্ট বস্তুর ইশারা পেয়ে হোমিটিক জিন প্রকাশিত হয় ও অঙ্গগুলোর স্থান ঠিক করে দেয়। আরো একটু সূক্ষ্ম ভাবে মাছির ভ্রূণের নানা অংশ নির্ধারণের ব্যাপারটি দেখতে গেলে ম্যাটারনাল এফেক্ট বা মাতৃ-প্রক্রিয়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বস্তুগুলো অসমভাবে বন্টিত হয়ে ভ্রূণের নানা অংশে অসমতা সৃষ্টি করে। তারপর কতগুলো 'ব্যবধান জিন' অংশ বিশেষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু প্রধান অঞ্চল সৃষ্টি করে। এরপর 'জোড়-নিয়ম জিন' নামের জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জোড়া জোড়া কিছু সরু সুনির্দিষ্ট অংশ সৃষ্টি করে। এবং তারপর 'সম্মুখ-পশ্চাৎ জিন' নামে পরিচিত জিন প্রত্যেক অংশের সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রান্ত ঠিক করে দেয়।

এগুলে খুবই মৌলিক ধরনের নিয়ন্ত্রণকারী জিন এবং এদের প্রভাবও খুবই গভীর। সাধারণ গঠন জিনগুলোর মধ্যে কোন মিউটেশন ঘটলে তার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণিটির কোন ছোটখাট পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু এরকম নিয়ন্ত্রণকারী জিনে মিউটেশন ঘটলে বিস্ময়কর সব মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন ড্রসোফিলিয়ার একটি হক্স জিনে মিউটেশন ঘটিয়ে দেখা গেছে সাধারণত যেখানে তার দ্বিতীয় অংশ থেকে স্বাভাবিক ডানা জোড়া বের হয়, এক্ষেত্রে তৃতীয় অংশ থেকে অনুরূপ অতিরিক্ত একজোড়া ডানা বের হয়েছে। এরকম আর একটি জিনে মিউটেশন ঘটিয়ে মাথার থেকে যেখানে শুঁড় বেরুবার কথা সেক্ষেত্রে ওখান থেকে এক জোড়া পা গজাতে দেখা গেছে!

বিবর্তনের ক্ষেত্রে হক্স জিনের প্রভাবটি বেশ লক্ষণীয়। প্রাণি বিবর্তনে পতঙ্গ গোষ্ঠি আর চিংড়ি-কাঁকড়া জাতীয় গোষ্ঠি (ক্রুষ্টাচিয়ান) পরস্পরের নিকট জ্ঞাতি। কিন্তু পতঙ্গের ক্ষেত্রে দেহ পরিকল্পনা যে রকম ছিমছাম সুনির্দিষ্ট, চিংড়ি-কাঁকড়া জাতীয়ের ক্ষেত্রে তা কিন্তু নয়। পতঙ্গের মাথায় মুখের নানা অংশগুলো খুব সুনির্দিষ্ট। এর বুকের তিন অংশের মধ্যে প্রথম অংশ থেকে শুধু পা, দ্বিতীয় অংশ থেকে সাধারণত পা ও ডানা গজায় (কখনো ডানা তৃতীয় অংশে), তৃতীয় অংশ থেকে পা। তৃতীয় অংশে ডানা না থাকলে এক ধরনের ছোট্ট ডানা-অংকুর থাকে। পেটের যে নানা অংশ করা থাকে তার কোনটাতে

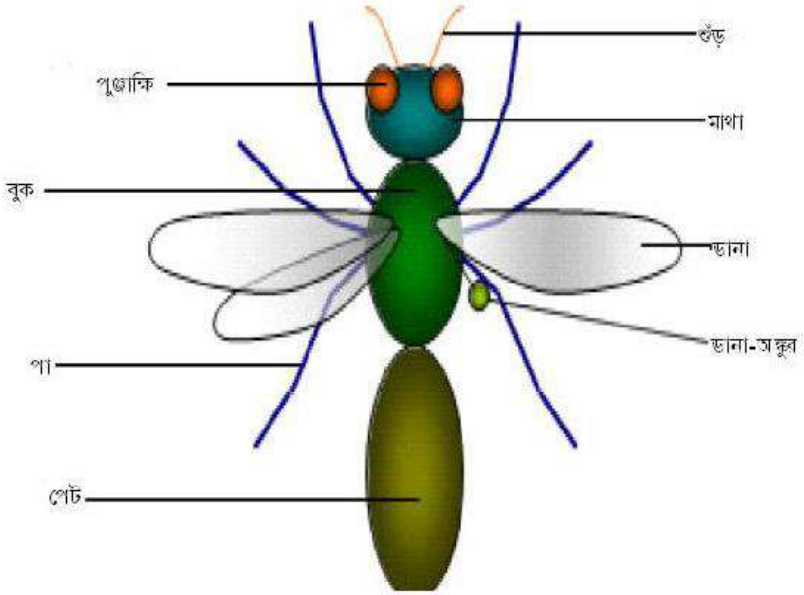

পতঙ্গের দেহ পরিকল্পনা
এতে রয়েছে অধিকতর শৃঙ্খলা

কোন অঙ্গ গজায়না। অঙ্গগুলোর কোন শাখা বের হয় না, প্রত্যেকটি অঙ্গের সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। অন্য দিকে চিংড়ি-কাঁকড়া ইত্যাদির দেহ পরিকল্পনা

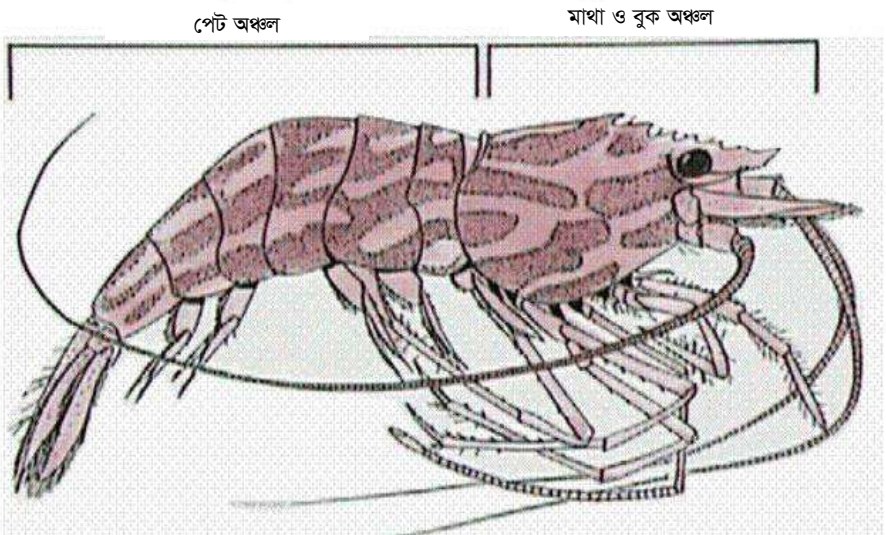

ক্রুসটাচিয়ান গোষ্ঠির দেহ পরিকল্পনা
এটি তুলনামূলক ভাবে বেশি আগোছালো

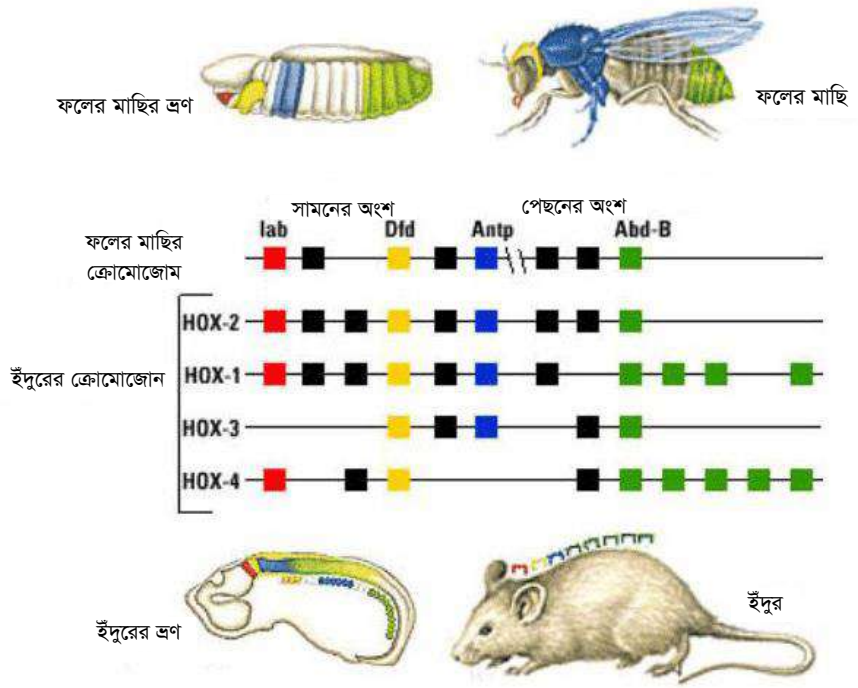

ফলের মাছি আর ইঁদুরের হক্স জিনের ও সেগুলোর নিয়ন্ত্রিত দেহাংশের সাদৃশ্য

অনেকটা অগোছালো। এদের অনেক বেশি রকমের ও বেশি সংখ্যক অঙ্গ সারা দেহ থেকে বেরুতে দেখা যায়। অঙ্গগুলো প্রায়শ শাখা বিশিষ্ট এবং একাধিক কাজের উপযুক্ত। স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে– যে উভয় গোষ্ঠিই একই পূর্ববর্তী প্রাণি থেকে বিবর্তিত হলেও পতঙ্গের ক্ষেত্রে অধিকতর জিন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেহ পরিকল্পনা অধিকতর শৃঙ্খলা পেয়েছে। আর এই নিয়ন্ত্রণ ঘটেছে প্রধানত হক্স জিনের মাধ্যমে। হক্স জিনের এই অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলেই উভয় গোষ্ঠির পূর্ববর্তী জলচর আদি পূর্বসূরি থেকে শুধু পতঙ্গরাই স্থলে বাসের উপযুক্ত হয়েছে, চিংড়ির গোষ্ঠি হয়নি।

একটি জিনিস লক্ষণীয়– ড্রসোফিলিয়া মাছির ভ্রূণের সঙ্গে তার পূর্ণাঙ্গ রূপের তুলনা করলে দেহের অংশগুলো একই ভাবে উভয়েই দেখা যায়। অন্য প্রাণিতেও তাই দেখা যায়। আর উচ্চতর প্রাণিসহ সব রকম প্রাণিতে এই মাছির মত তুলনীয় হক্স জিনগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। এভাবে মাছির সঙ্গে ইঁদুরের বা মানুষের হক্স জিন ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেহাংশের তুলনা করলেও আশ্চর্যজনক ভাবে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়, যদিও উচ্চতর প্রাণিতে

এসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সব প্রাণিতেই হক্স জিন থেকে শুরু করে এক দল জিন অন্য দল জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে দেহ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে থাকে। তবে সব প্রাণিতে হক্স জিন থাকলেও সবার ক্ষেত্রে দেহ-পরিকল্পনা ঠিক করে দেয়া তার মুখ্য কাজ নয়– বিশেষ করে যে সব প্রাণিতে এরকম ঠিক করে দেয়ার দরকার নাই, সেখানে তো নয়ই। এর একটি উদাহরণ হলো হাইড্রা নামক একেবারে সরল প্রাণিতে যেখানে দেহকে অংশে বিভক্ত করার, কোন্ অংশ থেকে কোন্ অঙ্গ গজাবে এরকম কিছু নির্ধারণের দায় নাই। সেক্ষেত্রে হয়তো হক্স জিন অন্য কিছু নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এন্টিবডি তৈরিঃ কয়েকটি জিন দিয়ে অসংখ্য প্রোটিন

ভ্রূণ বিকাশের সময় আর একটি কাজ করতে হয় তা হলো যে প্রাণি শিশুটি জন্ম নিতে যাচ্ছে তার দেহে সম্ভাব্য অসংখ্য রকম বিজাতীয় আগন্তুককে প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত এন্টিবডি তৈরি করার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকটি বিজাতীয় আগন্তুকের জন্য যেহেতু একটি বিশেষ এন্টিবডি লাগে, তাই তাকে কোটি কোটি এন্টিবডি প্রোটিন তৈরি করতে হয়, যার জন্য প্রয়োজন ঐ সংখ্যক জিন। এটি অসম্ভব ব্যাপার, তাই এর জন্য থাকতে হয় এক ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা– জিন পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা। এতে এন্টিবডি সৃষ্টির অল্পকিছু জিনের দল থেকে নানা সংমিশ্রণে জিন নিয়ে অসংখ্য রকমের বৈচিত্র সৃষ্টি হয়, এবং তার প্রত্যেকটি থেকে এক একটি বিশেষ এন্টিবডি তৈরি হয়। এ যেন রেষ্টুরেন্টের মেন্যুতে সীমিত বৈচিত্রের স্যুপের তালিকা, ফ্রাইড রাইসের তালিকা, মাছের তালিকা, মাংসের তালিকা, মিষ্টান্নের তালিকা– ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন ভাবে বেছে নিয়ে অসংখ্য রকমের খানা তৈরি করা।

আসলে এন্টিবডি জিনের বৈচিত্র সৃষ্টির কাজটি কয়েক পর্যায়ে হয়। প্রথমে নানা দল থেকে অংশত নানা সংমিশ্রণে নিয়ে বৈচিত্র সৃষ্টি হলো (ঐ মেন্যু থেকে বেছে নেবার মত)। এরপর এসব জিনের অংশগুলো নিয়ে হালকা ভাবে এমন করে জুড়ে নেয়া হয় যাতে কিছু বেইস যোগ করে কিছু বেইস বাদ দিয়ে আরো কিছু বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। আরো পরে কোষ বিভাজনের সময় মিউটেশন সৃষ্টির মাধ্যমে এক জিন থেকে অন্য জিনে অল্প পার্থক্য সৃষ্টি করে আরো কিছু বৈচিত্র।

প্রক্রিয়াটি ব্যতিক্রমী হলেও অত্যন্ত জরুরী। দেহের প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব রকম বিজাতীয় আগন্তুকের জন্য উপযুক্ত এন্টিবডি প্রয়োজন। ভ্রূণ বিকাশ

কালে এদের সৃষ্টির কোন সরলতর উপায় না থাকাতে এমনি পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা আনতে হয়েছে। এটি সম্ভব করতে জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হয় যাতে পর্যায়ক্রমে উপরে বর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়া এন্টিবডি সৃষ্টির জিন-বৈচিত্র সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে এন্টিবডি সৃষ্টির অল্প কিছু জিনের দ্বারাই বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অসংখ্য সুনির্দিষ্ট এন্টিবডি সৃষ্টি হতে পারে।

জিন চিকিৎসা

চিকিৎসা বিদ্যায় নূতন দিগন্ত

ডি এন এ বিজ্ঞানের এবং জিন কারিগরির যতগুলো প্রয়োগ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের জন্য এ নিয়ে যে সম্ভাবনাগুলো দেখা দিচ্ছে, তাতে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে চিকিৎসায় এর ব্যবহার। জিন উদ্ঘাটনই বলি, জিন স্থানান্তরই বলি, জিন পরিবর্তনই বলি– অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় লক্ষ্যটি থাকে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন। তাই গুরুতর অসুখগুলোর জেনেটিক উৎস বের করা, লক্ষণ প্রকাশের আগেই জিন প্রকৃতি দেখে রোগটির ঝুঁকি নির্ণয়, এদের বংশগত হবার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখা, ইত্যাদি এতে গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য মূল্যবান প্রোটিন তৈরির ব্যবস্থা করার জন্য জিন-স্থানান্তরিত প্রাণি, উদ্ভিদ বা ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার নিয়েও আলোচনা আমরা ইতোমধ্যেই করেছি। এখন জেনেটিক পদ্ধতিতে কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে– যদিও তার সত্যিকার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক ভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়।

মূলত রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী বিকৃত জিনকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় সুস্থ জিনকে প্রতিস্থাপিত করার মাধ্যমেই আসছে এই জিন চিকিৎসার বিরাট সম্ভাবনা। তেমনি ভাবেই এসেছে জিন টিকার প্রচলন– যার ফলে শরীরে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ টিকার মতই। মানব জেনোমের জিন বৈচিত্রের সূক্ষ্ম দিকগুলো যতই উদ্ঘাটিত হচ্ছে, সহজতর সিকোয়ন্সিং এর মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ নিজের ব্যক্তিগত জেনোম-চিত্র যতই সহজলভ্য ভাবে পাবে, ততই চিকিৎসাকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথক নিবদ্ধ করা যাবে। এতে চিকিৎসাকে সব মানুষের জন্য একই রকম না রেখে যার যার জেনোম বৈশিষ্ট অনুযায়ী ঠিক তার উপযুক্ত করেই বিশেষায়িত করা সম্ভব হবে। বলতে গেলে ডি এন এ'র উৎসারিত সম্ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল দিগন্তের আশা দেখাচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এটি ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশলে বিরাট যুগান্তর আনতে পারে।

জিন চিকিৎসার প্রক্রিয়া

মানব জেনোম উদ্ঘাটন সম্পন্ন হবার পর এখন বিভিন্ন জেনেটিক ভাবে সৃষ্ট রোগগুলোর জিন উদ্ঘাটিত হতে শুরু হয়েছে। প্রতি বছরেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু না

কিছু রোগের জিন এভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। সাধারণত এক বা একাধিক স্বাভাবিক জিনে বিশেষ মিউটেশনের ফলেই এরকম এক একটি রোগের প্রবণতা দেখা দেয়। রোগীর শরীরে ঐ বিকৃত জিন কমিয়ে ফেলে, অথবা স্বাভাবিক জিন অনেক বেশি পরিমাণে যোগান দিয়ে রোগের প্রভাব কমিয়ে ফেলা যায়। এ জন্য রোগীর ডি এন এ'র ঐ বিকৃত জিনযুক্ত অংশের উপর জিন কারিগরি করার দরকার। এ ধরনের জিন কারিগরির মাধ্যমে চিকিৎসাই জিন থেরাপি বা জিন চিকিৎসা।

ঐ মিউটেশনযুক্ত (বিকৃত) জিন রোগীর শরীরের কোষে ডি এন এ'তে পাওয়া যাবে। তাই রোগীর কিছু কোষ নিয়ে তার থেকে ডি এন এ আলাদা করতে হয়। ঐ ডি এন এ'র প্রাসঙ্গিক অংশ থেকে জিনের মিউটেশনযুক্ত অংশটি কেটে বের করে ফেলে ওখানে তার স্বাভাবিক রূপটি জুড়ে দেয়া হয় সুস্থ মানুষ থেকে নিয়ে। জিন স্থানান্তরের যে প্রক্রিয়া আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি সেভাবে ব্যাকটেরিয়া থেকে নেয়া প্লাজমিডকে ব্যবহার করে এটি করা যায়। রোগীর কোষে পুনরায় ফেরৎ দেয়ার আগে সুস্থ জিন সহ পুনর্গঠিত এই প্লাজমিড বহনের জন্য একটি বাহক প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাধারণত ভাইরাস অথবা রিট্রোভাইরাসের ক্ষতিকর অংশটি বাদ দিয়ে তাকেই ব্যবহার করা হয়। ভাইরাস বা রিট্রোভাইরাস পুনর্গঠিত প্লাজমিড গ্রহণ করে। তারপর রোগীর দেহ থেকে আনা কোষগুলো এই ভাইরাসের সঙ্গে রাখলে ভাইরাস কোষকে আক্রান্ত করে এবং সেই সুস্থ

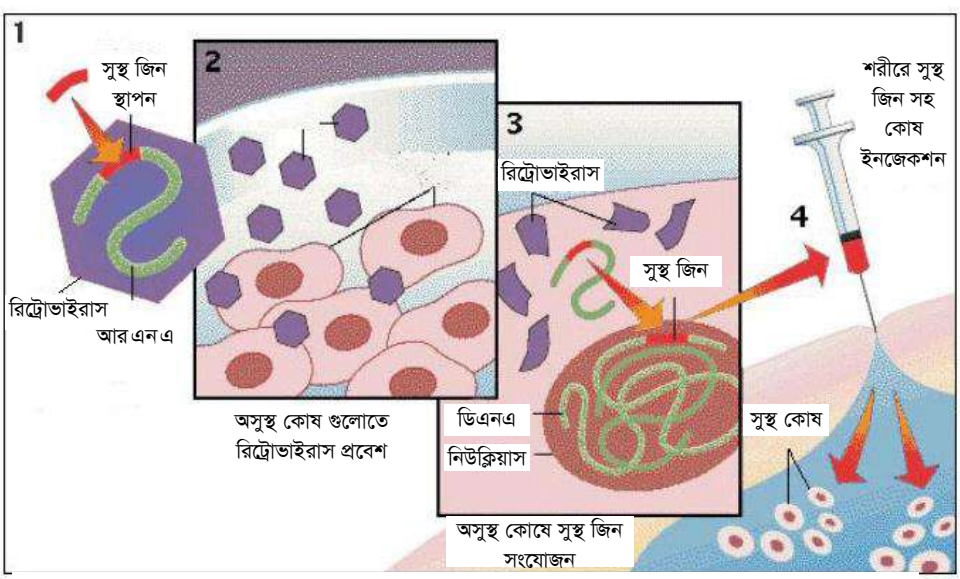

জিন চিকিৎসা

স্বাভাবিক জিন কোষে ঢুকিয়ে দেয়। এবার রোগীর দেহে কোষগুলো ফেরৎ দিয়ে দেয়া যায়। বিকল্প পদ্ধতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সুস্থ জিন বহনকারী রিট্রোভাইরাস সরাসরি রোগীর অসুস্থ অঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, এবং সেখানকার কোষ এই সুস্থ জিন গ্রহণ করে। এভাবে আমরা রোগীর শরীরের অন্তত কিছু কোষে বিকৃত জিনের বদলে স্বাভাবিক জিন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এসব কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আরো বহু কোষে এভাবে সুস্থ জিন প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিক জিনের সৃষ্ট প্রোটিন অস্বাভাবিকগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে, যার ফলে রোগের আক্রমণটি কমে আসে।

এই প্রক্রিয়টি সফল হবার জন্য কতগুলো শর্ত প্রয়োজনীয়। যথেষ্ট সংখ্যক কোষ রোগীর দেহ থেকে সংগ্রহ করে তাতে বিকৃত জিন বদলে স্বাভাবিক জিন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঐ জিন কোষের মধ্যে ভাল ভাবে প্রকাশিত হতে হবে এবং তা যথেষ্ট পরিমাণ সুস্থ প্রোটিন তৈরি করতে হবে। এসব প্রক্রিয়ার কোন ক্ষতিকর প্রভাব রোগীর দেহে দেখা যেতে পারবেনা। অন্যদিকে তার দেহে সুস্থ জিনটি ভালভাবে অঙ্গীভূত হওয়াটি খুব জরুরী। সুস্থ জিনকে সরাসরি রোগীর দেহে ঢুকানো অপেক্ষাকৃত সহজতর ও ক্রমাগত করতে পারার মত পদ্ধতি বটে, কিন্তু এতে অঙ্গীভূত হবার ব্যাপারটি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে অনেক সময় এ জিন কিছু সময় কোষের জেনোমে থেকে প্রোটিন তৈরি করে, তারপর নষ্ট হয়ে যায়। যেমন পেশিতে সরাসরি ইনজেকশন দিয়ে বা শ্বাসের সঙ্গে স্প্রে করে জিন ঢুকালে অল্প কিছু দিন শুধু এটি কার্যকর থাকে। তবে এ ভাবেও কোন কোন চিকিৎসা চলতে পারে কিছু দিন পর পর সুস্থ জিন নিয়ে। তবে সব চেয়ে ভাল হয় সুস্থ জিন পুরাপুরি অঙ্গীভূত হয়ে জেনোমকে স্থায়ী ভাবে পরিবর্তন করলে। এটি ভাইরাস বাহকের মাধ্যমেই অধিকতর সম্ভব, বিশেষ করে রোগীর শরীর থেকে নেয়া কোষে সেই ভাইরাস ঢুকিয়ে।

জিন চিকিৎসার ফলাফল

জিন চিকিৎসার ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে সুস্থ জিন সম্পন্ন যে সব কোষ শরীরে গেল, বা শরীরে যে সব কোষে সুস্থ জিন প্রতিষ্ঠিত হলো, সেগুলো কত সার্থক ভাবে বিভাজিত হয়ে সুস্থ জিনের অনেক কোষ সৃষ্টি করলো তার উপর। কাজেই চিকিৎসার ফলাফলের উপর সেই বিশেষ কোষের বৈশিষ্ট সমূহ ও বিভাজন রীতির অনেকখানি প্রভাব থাকবে। তাছাড়া এভাবে সুস্থ জিন দিয়ে পরিবর্তিত কোষের সংখ্যা মূল অসুস্থ কোষের তুলনায় কত অংশ, আর এই

সদ্য পরিবর্তিত কোষে পরিবর্তনের প্রভাব কতদিন থাকবে সেই তথ্যগুলোও গুরুত্বপূর্ণ।

শরীরের সাধারণ কোষে জিন থেরাপি করতে গিয়ে একটি ভয় প্রায়শ কাজ করে, সেটি হলো ভুলক্রমে কোন জনন কোষে এই জিন পরিবর্তন চলে গেল কিনা। কারণ জনন কোষে কোন ধরনের জিন পরিবর্তন ঢুকলে সেটি সন্তানের মধ্যে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে, এবং সন্তানের মাধ্যমে বংশ-পরম্পরায় চলে যাওয়ার সুযোগও থাকে এর। এমনটি ঘটলে হয়তো আমরা নিজেদের অজান্তে কোটি কোটি বছরের সৃষ্ট মানব জিন-সমুদ্রের (সকল মানুষের সম্মিলিত জিন) মধ্যে একটি জিন-পরিবর্তন ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এটি বংশ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে এই জিন-সমুদ্রে ক্রমেই বাড়বে। কোন দিক থেকে এর কোন ক্ষতিকর প্রভাব থাকলে তাও মানব জিন-সমুদ্রে চিরতরে জমতে থাকবে। কাজেই চিকিৎসা করতে গিয়ে তার-পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে সব মিউটেশন হবে তা যদি জনন কোষে যায়, তাহলে মানব জিন-সমুদ্রে তা এক রকম দূষণের মতোই বাড়বে। এতে রোগী ব্যক্তি হিসাবে উপকৃত হলেও মানব গোষ্ঠির জন্য একটি সুদূর প্রসারী ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। তাই জিন চিকিৎসাকে শরীরের সাধারণ কোষে যেন সীমাবদ্ধ রাখা যায়, কোন অবস্থাতেই তা যেন জনন কোষে না যেতে পারে, সে জন্য অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

ইতোমধ্যেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিন চিকিৎসা ভাল ফল দিচ্ছে। কোন কোন টিউমারের লিম্ফোসাইট থেকে কোষ নিয়ে এবং স্বাভাবিক জিন সহ সেখানে ফেরৎ দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। সুস্থ জিনের সঙ্গে সহজে সনাক্ত করার মত মার্কার জিনও দিয়ে দেয়া হয় যাতে করে বুঝা যায় যে এরা টিউমারে সঠিক জায়গায় গিয়েছে কিনা। বোন মেরো বা হাড়ের মজ্জায় হেমোপীটিক ষ্টেম সেল নামে পরিচিত এক ধরনের স্টেম সেল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বিভিন্ন কাজ করে বলে বহু রকমের জেনেটিক অসুখের সঙ্গে এদের সম্পর্ক রয়েছে। বোন মেরো স্থানান্তর (ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন) করে এসব রোগের নিরাময় হয়েছে বিধায় এখন হেমোপীটিক ষ্টেম সেলে রোগটির সংস্লিষ্ট সুস্থ জিন সংযোগ করে এসব রোগের চিকিৎসার চেষ্টা চলছে। লিভারের অসুখেও সীমিত সাফল্য এসেছে জিন চিকিৎসার। সিষ্টিক ফিব্রোসিস যে গুরুতর বংশগত রোগ সেটি আমরা দেখেছি। শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের যে এপিথেলিয়াল সেল রয়েছে তাতে সুস্থ জিন ঢুকিয়ে এই রোগ নিরাময় হচ্ছে। পেশিতে ইনজেকশন করে সুস্থ জিন ঢুকিয়ে পেশির কিছু অসুখে সাফল্য

এসেছে, যদিও কয়েক সপ্তাহ পর পর পুনরায় ইনজেকশন দিতে হয়, আগেরটির কার্যকারিতা থাকে না বলে। আর এক ধরনের জিন চিকিৎসার কিছু সাফল্য এখন দেখা যাচ্ছে তা হলো শরীরের কোন অঙ্গে জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাতে অসুস্থতার কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি সৃষ্টি পুনঃচালু করা। ইনসুলিন তৈরি হয় প্যানক্রিয়াজ যা অগ্ন্যাশয়ে। ওখানে এটি সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনটির নাম Pdx-1। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে এই জিনের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে ইনসুলিন তৈরি হতে পারেনা। অতি সম্প্রতি নিরাপদ ভাইরাসের সাহায্যে রোগী থেকে নেয়া লিভার কোষে এই Pdx-1 জিনটি সংযোজন করা হয় যার ফলে ঐ লিভার কোষেই ইনসুলিন তৈরি হতে পারে। এই কোষ তার লিভার অথবা পেটের চামড়ার তলে ফেরৎ দিলে রোগী নিজেই আবার ইনসুলিন তৈরি করতে পারছে। ভবিষ্যতে হয়তো ডায়াবেটিসের নিয়মিত চিকিৎসায় এটি ব্যবহার হতে পারবে।

জিন চিকিৎসার আশু চাহিদা

মস্তিষ্কের রোগে সাধারণ প্রচলিত চিকিৎসা অত্যন্ত দুরূহ এবং যথেষ্ট রকম সফল নয়। জিন থেরাপিও যে সহজ হবে তা নয়, কারণ মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষগুলোতে পৌঁছা যেমন কঠিন, তেমনি যেখান থেকে কোষ নিয়ে বাইরে জিন সংস্থাপনও কঠিন। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে মস্তিষ্কের কিছু রোগে জিন চিকিৎসা শিগ্‌গির বড় পরিবর্তন আনবে। পার্কিনসন্স ডিজিজ মস্তিষ্কের অবক্ষয় জনিত একটি সচরাচর অসুখ যাতে রোগীর হাত পা নিয়ন্ত্রহীন ভাবে কাঁপে। অবক্ষয়িত স্নায়ুকোষগুলোতে নিউরোট্রান্সমিটার ডোপামাইনের কাজের পরিবর্তনে এটি ঘটে। এল-ডোপা নামক বস্তু যা ডোপামাইন তৈরির পূর্ব পর্যায়, তা এর চিকিৎসার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাইরে থেকে দেয়া এল-ডোপায় অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে যথাযথ জিন ঢুকিয়ে মস্তিষ্কে স্থানীয় ভাবেই এল-ডোপার সংশ্লেষণ ঘটালে পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়া কম হবে।

বেশি বয়সে আলঝাইমার রোগে যে স্মৃতিভ্রষ্টতা দেখা দেয় তার কারণ মস্তিষ্কে বিস্তৃত ভাবে স্নায়ু যোগাযোগ বিপর্যস্থ হয়ে যাওয়া। নিউরোট্রফিক ফ্যাক্টর নামক প্রোটিন এই বিপর্যয়ের অগ্রগতি রোধ করতে পারে। এই জিনিসটি ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু বাইরে টিশ্যু কালচারে ঐ প্রোটিনের জিন ঢুকিয়ে তা মস্তিষ্কে সংস্থাপন করতে পারলে মস্তিষ্কেই প্রোটিনটি তৈরি হতে পারবে। কিছু কিছু প্রাণি-মডেলে এরকম চিকিৎসা ইতোমধ্যেই সফল হয়েছে।

চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো এইচআইভি, এইড্‌স। এক্ষেত্রে ভাইরাস সুস্থ কোষকে দখল করে তাকে তার অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করতে বাধ্য করে এবং নূতন নূতন কোষকে আক্রান্ত করে। এর উপশম করতে হলে সুস্থ কোষকে নূতন ভাবে আক্রান্ত হবার থেকে রক্ষা করতে হয়। একই সঙ্গে রোগাক্রান্ত কোষকে অথবা তার মধ্যেকার ভাইরাসকে নষ্ট করতে হয়, এবং রোগীর থেকে অন্যদের মধ্যে রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে হয়। সাধারণ রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে এ কাজগুলো করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সারা জীবনই খুব বেশি মাত্রার অনেক ওষুধ নিতে হচ্ছে। এতে ওষুধের বিষময়তা ক্রমশ রোগীর শরীরে জমে সেটিই তাকে কাবু করে ফেলে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জিন চিকিৎসা দিয়েও নীতিগতভাবে এই কাজগুলো করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রতিরোধী ওষুধগুলো রোগীর শরীরেই সৃষ্টি হয়ে কাজ করবে। এই উদ্দেশ্য জিন স্থানান্তরের জন্য ক্ষতিকর উপাদানগুলো বাদ দিয়ে এইচ আই ভি রিট্রোভাইরাসই আবার সবচেয়ে বেশি উপযোগী হতে পারে, কারণ এটি কাম্য জিনটি সহজে রোগীর দেহকোষে স্থাপন করতে পারে। এই এইচ আই ভি রিট্রোভাইরাসই মূল অসুখটার জন্য দায়ী। যথাযথ জিন মূল ভাইরাসের এইডস সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়াগুলোকে বিকল করে উপশমের কাজগুলো করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে সাফল্য আসতে এখনো বাকি।

জেনেটিক টিকা

জেনেটিক টিকার আলোচনার আগে দেখতে হয় টিকা জিনিসটি কী? এটি সাধারণত ভাইরাস আক্রমণে সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে আগে থেকে দেহে একটি প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। এই প্রতিরোধ সম্ভব হয় ঐ ভাইরাসের সঙ্গে জড়িত প্রোটিনের বিরুদ্ধে এন্টিবডি গড়ে তুলে। এ কাজটি ঐ ভাইরাসেরই একটি নিষ্ক্রিয় রূপ ইচ্ছাপূর্বক দেহে ঢুকিয়ে করা যায়, যার প্রতিক্রিয়ায় এন্টিবডি সৃষ্টি হবে। অথবা সক্রিয় ভাইরাসটিকেই দুর্বল অবস্থায় ঢুকানো যায়। আবার ভাইরাস না ঢুকিয়ে ভাইরাসের আবরণের প্রোটিনের একটি অংশ দেহে ঢুকানো যায়। এর সব ক'টিই টিকা হতে পারে। ভাইরাস ঘটিত এক এক রকম অসুখের জন্য এদের মধ্যে এক একটি সুবিধাজনক হতে পারে। যেমন হেপেটাইটিস এ, র‍্যাবিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ, জাপানিজ এনসেফেলাইটিস, পোলিও, এসবের টিকায় নিষ্ক্রিয় ভাইরাস ব্যবহৃত হয়। আবার হাম, মাম্পস, রুবেলা, ইয়েলো ফিভার ইত্যাদির টিকায় ব্যবহৃত হয় সক্রিয় কিন্তু দুর্বল

ভাইরাস। ইনফ্লুয়েঞ্জার-এ'র টিকায় ভাইরাস আবরণের প্রোটিনের অংশ ব্যবহৃত হয়। এদের সবগুলোর কিছু সুবিধা অসুবিধা রয়েছে, তবে মোটের উপর সক্রিয় বা জীবন্ত ভাইরাসই টিকা হিসাবে বেশি কার্যকর হয়। এতে পরবর্তী সময়ে রোগের আক্রমণে প্রতিরোধ গড়ে উঠে বেশি, খুব অল্প ভাইরাস নিয়ে অনেক টিকা স্বল্প মূল্যে তৈরি করা যায়, আর প্রতিরোধ ক্ষমতাটি সারা জীবন স্থায়ী হয়। অন্য রকম টিকায় এই গুণগুলো এতটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু সমস্যা হলো সক্রিয় ভাইরাসের টিকা সব জনগোষ্ঠির জন্য সমান নিরাপদ নয়। কিছু কিছু জনগোষ্ঠির মধ্যে এ টিকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেছে– টিকার ফলে এমন প্রদাহ শরীরে দেখা দেয় যা সারতে চায়না, ক্যানসার সৃষ্টির ঘটনাও ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে টিকার নির্ভরযোগ্যতায়ও ঘাটতি দেখা যায়। এখানেই জেনেটিক টিকা আশার বাণী শুনাতে পারছে। এতে টিকার

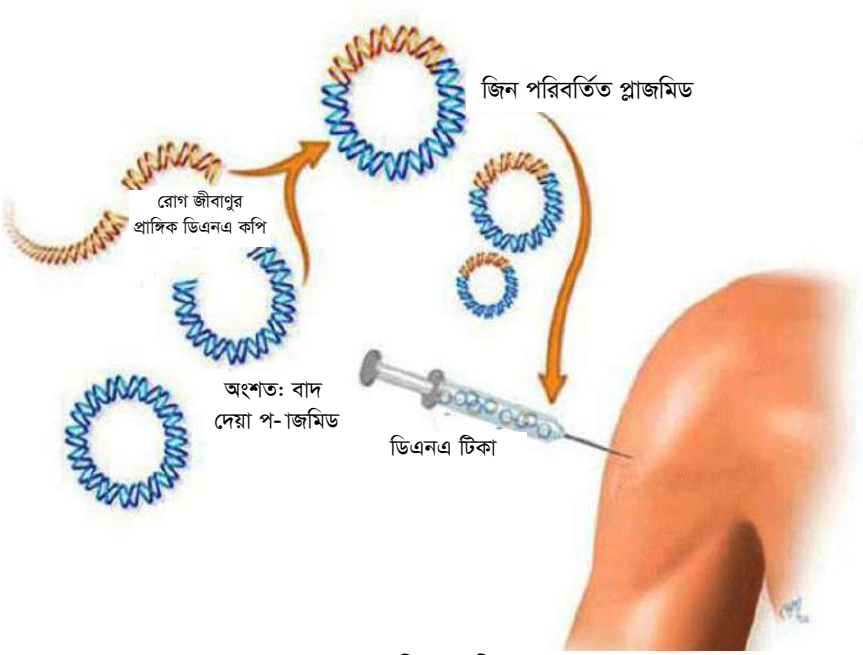

ডিএনএ টিকা

কার্যকারিতা বাড়বে, কিন্তু ঝুঁকি কমবে। সক্রিয় একটি ভাইরাস যখন টিকা হিসাবে শরীরে ঢুকানো হয় তখন তা একটি নূতন জেনেটিক বস্তু ঢুকানোর মতই– কারণ ভাইরাস আসলে কিছু ডি এন এ ছাড়া আর কিছুই নয়। জিন চিকিৎসায়ও আমরা তাই করে থাকি– নূতন জেনেটিক বস্তু শরীরে ঢুকাই। উভয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকে জেনেটিক বস্তু শরীরে স্থানান্তরিত হোক এবং সেখানে

প্রকাশিত হোক। কিন্তু জিন চিকিৎসায় যে জিন ঢুকাচ্ছি আমরা চাইনা তার বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ গড়ে উঠুক– অর্থাৎ এন্টিবডি তৈরি হোক। বরং চাই ঐ জিনটি দেহে নির্বিঘ্নে ভালভাবে আত্মীকৃত হোক। অন্য দিকে টিকা হিসাবে যখন জিন স্থানান্তরিত করবো তখন কিন্তু উল্টো এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়াটিই চাইবো, যেভাবে চাই ভাইরাস টিকার ক্ষেত্রেও।

জেনেটিক টিকায় সুনির্বাচিত জিন দেহে ঢুকিয়ে এন্টিবডি তৈরির ব্যবস্থা হয়। রোগের সক্রিয় ভাইরাস ঢুকালে দেহে যে সব বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এক্ষেত্রে তা হয়না। এর একটি সফল প্রক্রিয়া হলো দেহের বাইরে কোন জীবকোষে জিন স্থানান্ত-রের মাধ্যমে ভাইরাসটির দেহাবরণ প্রোটিনের এন্টিজেন অংশ ঐ জিনের কাজের মাধ্যমে তৈরি করিয়ে নেয়া। এই এন্টিজেনকেই পরে টিকা হিসাবে মানুষের দেহে ব্যবহার করা যায়। হেপেটাইটিস-বি এর যে টিকা এখন এই রোগ প্রতিরোধে বিশাল অবদান রাখছে তা এভাবেই তৈরি হয়েছে। এতে ঈষ্টের কোষে যথাযথ জিন সংযোগ করে এন্টিজেনটি তৈরি হয়েছে। এখন যেহেতু জিন চিকিৎসার জন্য বাহক হিসাবে ভাইরাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি হচ্ছে, ভবিষ্যতে সরাসরি ভাইরাসের মাধ্যমেই নানা রকম জেনেটিক টিকা শরীরে দেয়া যাবে। এন্টিবডি সৃষ্টির মূল জিনটি যথারীতি প্লাজমিডে পুনর্গঠিত ডিএনএ তৈরির মাধ্যমে ভাইরাসে সন্নিবেশ করা হবে।

ক্যানসার চিকিৎসায় জিন কারিগরি

চিকিৎসার যে ক্ষেত্রে জিন চিকিৎসা খুব বড় অবদান রাখবে বলে মনে হচ্ছে তা হলো ক্যানসার নিরাময়ে। ১৯৮২ সালে মূত্রাশয়ের ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে এমন একটি জিন মিউটেশনের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্যানসার সৃষ্টির জিন খুঁজে পাওয়া সেটিই প্রথম। HRAS নামের এই জিনে একটি মাত্র বেইসের অদল বদলে, একটি G বেইস T'তে পরিণত হবার কারণে, গ্লাইসিন এমাইনো এসিডটির বদলে ভ্যালিন সন্নিবেশিত হয়। আর এইটুকু মিউটেশনই ক্যানসারের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। সেই থেকে নানা ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক বা একাধিক জিনের বহু মিউটেশন আবিষ্কৃত হয়েছে, এখনো ক্রমাগত হচ্ছে। দ্রুত সিকোয়েন্সিং সম্ভব হওয়াতে এখন এসব জিনের পূর্ণাঙ্গ উদ্ঘাটন সম্ভব হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ২০০৯ সালে এমন দুটি ক্যানসারের জিন মিউটেশন উদ্ঘাটিত হয়েছে যাদের প্রকোপ খুব বেশি– বক্ষ ক্যানসার ও চর্ম ক্যানসার। এদের দায়ী জিনগুলোর পূর্ণ সনাক্তকরণ ও সিকোয়েন্সিং এর ফলে

রোগগুলোর কার্যকারণ অনুসন্ধান ও চিকিৎসা উন্নয়নে বড় সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে।

ডি এন এ গবেষণা ও জিন কারিগরি ক্যানসার চিকিৎসায় সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে কয়েকটি দিক থেকে। প্রথমত ক্যানসারের ক্ষেত্রে রোগের আশু উদ্ঘাটনটি খুবই জরুরী, ক্যান্সার কোষ মূল আক্রান্ত জায়গা থেকে দেহের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই চিকিৎসা করতে হয়। ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী জিন-মিউটেশন জানা থাকলে এবং তাদের অনুসঙ্গী মার্কার সুনির্দিষ্ট হলে, শুধু মার্কার দেখেই দ্রুত অনেক মানুষের মধ্যে এই ক্যানসার হবার সম্ভাবনা যাচাই করে ফেলা যায়। তখন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আগাম চিকিৎসা দেয়া যায়। জিন থেরাপির মাধ্যমেও এ চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে। এমন জিনকে জিন-কারিগরির মাধ্যমে রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয় যাতে এর কাজের ফলে বেছে বেছে ক্যানসার কোষগুলো ধ্বংস হয়। ক্যানসারের প্রচলিত চিকিৎসাতেও দেখা যায় যে সব রোগীর ক্ষেত্রে হুবহু একই ওষুধে ভাল কাজ হয়না। এর কারণ প্রত্যেক রোগীর টিউমারের একটি নিজস্ব জেনেটিক স্বাক্ষর থাকে। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে এই জেনেটিক স্বাক্ষর উদ্ঘাটন করতে পারলে তার বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা গড়ে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে জিন চিকিৎসার এটিও একটি বড় সুবিধার দিক হবে।

ক্যানসার সৃষ্টির জন্য শরীরে পর পর কতগুলো অবাঞ্ছিত ঘটনাই দায়ী– একসঙ্গে এগুলোর প্রত্যেকটি ঘটার দুর্ভাগ্য কারো ক্ষেত্রে হলে তবে তার ক্যানসার হয়। প্রথমত কোষ বিভাজনের উপর যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা বিকল হয়ে কোন কোন কোষের অনিয়ন্ত্রিত ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। দ্বিতীয়ত ঐ কোষগুলো কোষের স্বাভাবিক মৃত্যু এড়িয়ে গিয়ে এক রকম 'অমর' হয়ে পড়ে। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বলে রাখা ভাল শরীরের কোষগুলো যদি একই হারে বিভাজিত হয়েই চলতো তা হলে ২৪ ঘন্টাতেই আমরা বেড়ে ডাবল সাইজের হয়ে পড়তাম। সেটি যে হয়না তার কারণ সব কোষ সব সময় বিভাজনের অবস্থায় থাকেনা– ব্যাপারটি একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। অন্‌কো জিন নামক জিনের দ্বারাই কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ হয়, যদি এর প্রকাশ ঘটে তবে বিভাজন হয়, নইলে নয়। আর কোষ বিভাজনকে দমন করার কিংবা কোষকে মেরে ফেলার জন্যও এক রকম জিন রয়েছে থাকে বলে টিউমার দমনকারী জিন। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে মনে রাখতে হবে প্রায় সব কোষই (স্বল্প পরিমাণ ষ্টেম সেল বাদে) একটি নির্দিষ্ট সময় পর পূর্ব নির্দিষ্ট একটি সংকেত নিজের থেকে পেলে 'আত্মহত্যা' করে। এই প্রক্রিয়াতেও কোষ সংখ্যা

নিয়ন্ত্রণে থাকে। সাধারণত কোন কোষ কয়েক সপ্তার বেশি বাঁচেনা, কিছু কিছু তো কয়েকদিনের বেশি নয়। কোষের বিভাজন আর সীমিত আয়ুর দুটি নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হওয়াটাই ক্যানসার সৃষ্টির প্রথম দুটি পর্যায়। এর ফলে অতিরিক্ত সংখ্যায় কোষ বিভাজিত হয়ে ও বেঁচে থেকে টিউমার সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপর তৃতীয় পর্যায়টি হলো ঐ বেড়ে উঠা কোষগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় না থেকে শরীরে ছড়িয়ে নূতন নূতন স্থানে চলে যাওয়া। আর চতুর্থ পর্যায় হলো অনিয়ন্ত্রিত বেড়ে উঠা টিউমারে নূতন নূতন রক্ত নালির জাল সৃষ্টি করে তাতে পুষ্টি সরবরাহ করা। এর প্রত্যেকটি পর্যায় ঘটে এক এক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত জিনের ফলে, অর্থাৎ জিনের বা তার প্রকাশ ব্যবস্থার কোন মিউটেশনের ফলে। একটি কোষে যদি এই চার রকমের ক্ষতিগ্রস্ত জিন জমা হয় এতেই পর পর এই চার পর্যায়ের ঘটনা ঘটে মারাত্মক ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে চার রকমের দুর্ঘটনা একসঙ্গে হবার সম্ভাবনা খুব কম বলেই শরীরের অসংখ্য কোষের মধ্যে একটিরও এমনটি না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনো দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঘটে, আর ঐ মিউটেশনগুলো দেখা দেয়। সাধারণত এটি ঘটে কোন কোন ভাইরাসের আক্রমণে– যেমন প্যাপিলোমা ভাইরাস, হেপেটাইটিস-বি ভাইরাস ইত্যাদি, অথবা কোন ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদানের প্রভাবে– যেমন ক্ষতিকর ক্যামিকাল, ধূমপান, ক্ষতিকর রশ্মি, অথবা বংশগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ জিন পেয়ে।

অন্যদিকে ক্যানসারের প্রচলিত চিকিৎসায়ও ক্যানসার কোষের ডি এন এ'কে ইচ্ছা করেই ক্ষতিগ্রস্থ করা হয় যাতে এগুলো বেঁচে থাকতে না পারে। এটি করা হয় কড়া রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে (ক্যামোথেরাপি), অথবা কড়া রশ্মি দিয়ে (রেডিও থেরাপি)। এটি করতে গিয়ে অবশ্য সুস্থ কোষগুলোর ডি এন এ'ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলে রোগী দুর্বল হয়ও নানা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবে প্রচলিত চিকিৎসাতেও ক্যামিকালস বা রশ্মি সাধারণ কোষের চেয়ে ক্যানসার কোষেই অধিক ক্ষতি করে। কেমোথেরাপিতে ওষুধগুলো বেশি কাজ করে বিভাজনরত কোষের উপর, আর ক্যানসার কোষগুলোই সব সময় বিভাজনের অবস্থায় থাকে– খুব কম সময়েই সুস্থির থাকে। তাছাড়া ডি এন এ নষ্ট হবার সময় যে বিপদ সংকেতগুলো পাওয়া যায় তা ক্যান্সার কোষ অগ্রাহ্য করে। স্বাভাবিক কোষ ঐ বিশদ সংকেত অনুযায়ী কাজ করে বলে ক্ষতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে, তাই চিকিৎসার প্রক্রিয়ায় কোষ মৃত্যুর ঝুঁকি সেগুলোর ক্ষেত্রে কম। রেডিও থেরাপিতে রশ্মিকে এমন ভাবে ফোকাস করা হয় যাতে তা

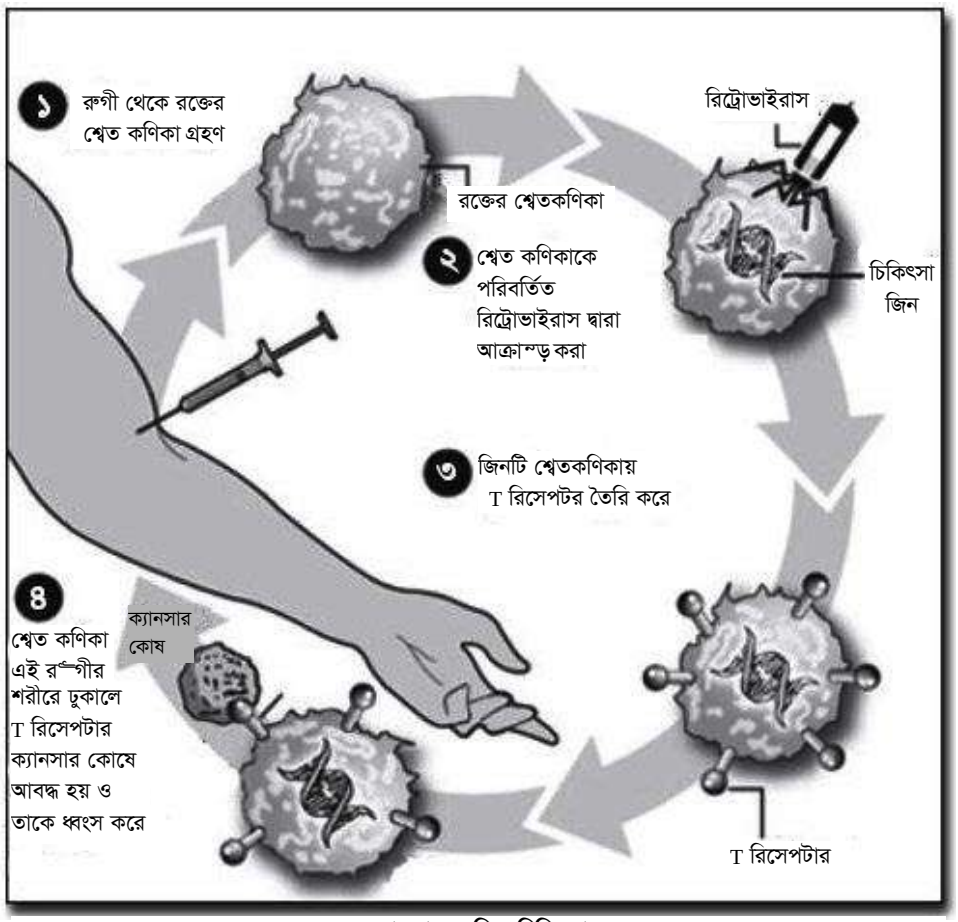

ক্যানসারের জিন চিকিৎসা

যথাসম্ভব ক্যানসার কোষেই পড়ে, অন্যত্র নয়। অন্যান্য ভাবেও এই দুই প্রচলিত চিকিৎসা শুধু ক্যানসার কোষে নিবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে।

জিন চিকিৎসা ক্যানসার কোষ ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে যেমন আরো কার্যকর করবে, তেমনি শুধু ক্যানসার কোষই যেন ধ্বংস হয় সে নিশ্চয়তা আরো ভালভাবে দেবে। এর একটি প্রক্রিয়ায় রোগীর রক্ত থেকে শ্বেত কণিকা নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে তার মধ্যে চিকিৎসার জিনটি রিট্রোভাইরাস বাহকের মাধ্যমে ঢুকানো হয়। এরপর এরকম শ্বেতকণিকা রোগীর দেহে ইনজেকশন করে ফেরৎ দেয়া হয়। চিকিৎসার জিনটি শ্বেত কণিকার মধ্যে টি-রিসেপটর নামে এক ধরনের আটকাবার অংশ তৈরি করে যা শুধু ক্যানসার কোষকে আবদ্ধ করতে পারে। একই সঙ্গে চিকিৎসার জিন টিউমার দমনকারী জিন হিসাবে

আটকানো ক্যানসার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। এভাবে এটি শুধু ক্যানসার কোষকেই ধ্বংস করবে, সুস্থ কোষকে নয়। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা এখন এক এক জন রোগীর মিউটেশন হওয়া ক্যানসার জিনের ডি এন এ নিয়ে তা ঐ জিনের স্বাভাবিক রূপের সঙ্গে তুলনা করতে পারছেন এবং উভয়ের সৃষ্ট প্রোটিনেরও তুলনা করতে পারছেন। এর থেকে বের করতে পারছেন শুধু ঐ রোগীর জন্য ক্যানসার জিনের জেনেটিক স্বাক্ষরগুলো কী ধরনের, আর জিন থেরাপিতে বা প্রচলিত থেরাপিতে কীভাবে তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কতটা কোনদিকে পরিবর্তন করে চিকিৎসা দিতে হবে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ক্যানসারের প্রকৃতিগুলো এতটা বিশিষ্ট যে জেনেটিক স্বাক্ষর বুঝে চিকিৎসাকে সুনির্দিষ্ট করার এই সুযোগ ক্যানসার চিকিৎসায় যুগান্তর আনবে বলে অনেকের বিশ্বাস।

এভাবে ডি এন এ বিজ্ঞান ক্যানসারের জন্য জিন স্থানান্তর নির্ভর সম্পূর্ণ নূতন চিকিৎসার সম্ভাবনাই শুধু নিয়ে আসেনি, বরং আগাম উদ্ঘাটনের সুযোগ করে দিয়ে, এবং প্রত্যেক রোগীর বিশেষ জেনেটিক স্বাক্ষর জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চিকিৎসার সুযোগ দিয়ে, জিন চিকিৎসা ও প্রচলিত চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রেই বড় পরিবর্তনের আশ্বাস দিচ্ছে।

প্রাচীন দেহাবশেষ থেকে ডিএনএ

'জুরাসিক পার্ক' কি সম্ভব?

'জুরাসিক পার্ক' নামক বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং তার উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রটিও। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে জুরাসিক যুগটি ছিল ডাইনোসরদের রাজত্বের সব চেয়ে রমরমা যুগ। এর বহু কোটি বছর পর আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে বিশাল এক উল্কাপাতের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ডাইনোসররা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর আরো অসংখ্য প্রজাতি সহ। কিন্তু 'জুরাসিক পার্ক' বইয়ের গল্পে বিজ্ঞানীরা সেই ডাইনোসরদের দেহাবশেষ থেকে অবিকৃত ডি এন এ পুনরুদ্ধার করে আজকের যুগেই আবার জিন কারিগরির মাধ্যমে ফিরিয়ে এনেছেন কিছু কিছু ডাইনোসরকে, এবং তাদের বিচরণ ঘটিয়েছেন আজকের একটি পার্কে– সেই জুরাসিক যুগের মত। এটি কল্পকাহিনী মাত্র, কিন্তু এর সব কিছু কি একেবারেই অসম্ভব? এখন দেখা যাচ্ছে– অন্তত নীতিগত ভাবে এটি অসম্ভব নয়। ঠিক ডাইনোসরদের জন্য না হলেও অপেক্ষাকৃত অল্প কিছু দিন আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন প্রাণির ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হতে পারে। এর সম্পূর্ণ ডি এন এ তার মিউজিয়ামে রক্ষিত মৃতদেহ বা কঙ্কাল থেকে সংগ্রহ করে তা প্রাণির ক্লোন করার মত প্রক্রিয়ায় ঐ প্রাণির খুব কাছাকাছি বর্তমান কোন জ্ঞাতি প্রজাতির ডিম্বকোষে প্রতিস্থাপন করে বিলুপ্ত প্রজাতিটিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। বর্তমান প্রাণিটির ব্যবহৃত ডিম্বকোষ থেকে অবশ্য আগে তার নিজের ডি এন এ বের করে ফেলতে হবে। এভাবে ঐ বিকল্প মায়ের গর্ভে বিলুপ্ত প্রাণিটির ক্লোন পাওয়া নীতিগত ভাবে সম্ভব।

সমস্যা হলো বিলুপ্ত প্রাণিটির সম্পূর্ণ ডি এন এ অবিকৃত ভাবে পাওয়া এবং সেটিকে ক্লোনিং এর মতো একটি জটিল ও অনিশ্চিত কাজের উপযোগী করতে পারা। এটি বাস্তবে সফল করে তুলতে হলে আরো অনেক ব্যয়বহুল গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তা ছাড়া এটি করার কথা ভাবা যেতে পারে শুধু অপেক্ষাকৃত কম সময় আগে বিলুপ্ত প্রাণিদের ক্ষেত্রে। কারণ যথেষ্ট আগের প্রাণির দেহাবশেষ থেকে আংশিক অবিকৃত ডি এন এ পাওয়া গেলেও প্রাণি ক্লোন করার মত অবস্থায় তা পাওয়া অসম্ভব। এর গবেষণায় যে বিপুল ব্যয় হবে তার প্রধান সার্থকতা জীববৈচিত্র রক্ষার বা ফিরিয়ে আনার একটি কৌশল হিসাবে। কিন্তু জীববৈচিত্র রক্ষায় আত্মনিবেদিত অনেকে বলছেন এই অর্থ বরং বর্তমানে যে

সব প্রাণি বিপন্ন প্রায় নিশ্চিত ভাবে বিলুপ্তির পথে চলেছে তাদের রক্ষার পেছনে ব্যয় করলেই এদিক থেকে অধিক ফল পাওয়া যাবে। তবে বিলুপ্ত প্রাণির দেহাবশেষ থেকে ডি এন এ সংগ্রহ করে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বেশি না এগুলেও, ঐ ডি এন এ বিলুপ্ত প্রাণিদের ইতিহাস পুনরুদ্ধারে যে অভূতপূর্ব অবদান রাখছে তা রীতিমত চমকপ্রদ।

প্রাচীন ডিএনএ পেতে বিপত্তি

এর আগে আমরা মৃতদেহ থেকে, এমন কি সত্তর বছর আগে মৃত মানুষের কঙ্কাল থেকে ডি এন এ নিয়ে নানা রহস্য উন্মোচন করতে দেখেছি। স্পষ্টত মানুষটি মৃত হলেও, সেকারণে তার কোষ মৃত হলেও, ঐ কোষের মধ্যে যে ডি এন এ ছিল– অণু হিসাবে তার গঠন এবং প্রতিলিপি হবার মত তার জেনেটিক

প্রাপ্তিস্থানে প্রাচীন ফসিল থেকে ডিএনএ সাবধানে সংগ্রহ

বার্তা সংকেতগুলো অবিকৃত ছিল। এরকম কম বেশি অবিকৃত বা ব্যবহারযোগ্য ডি এন এ আরো অনেক বেশি প্রাচীন দেহাবশেষ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, ইতোমধ্যে লাখ বছর প্রাচীন জীবের ক্ষেত্রে পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে অনেক কম প্রাচীন মিশরের মমি, পেরুর ইন্‌কা সভ্যতায় সংরক্ষিত মমি, এদের

চামড়া, পেশি ইত্যাদি সুন্দর সংরক্ষিত রয়েছে বলে এখান থেকে ডি এন এ ভাল অবস্থাতেই পাওয়া গেছে। হাতির পূর্বসূরি আরো প্রাচীন বিশালকায় ম্যামথদের পূর্ণ দেহ বেশ ভাল অবস্থায় চির বরফের তলায় সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে ম্যামথের এবং এ অবস্থার অন্যান্য প্রাণির ডি এন এ এর ভাল সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। অবশ্য বেশি প্রাচীন অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভাবে সংরক্ষিত হাড়ের উপরেই শুধু নির্ভর করতে হয়েছে ডি এন এ সংগ্রহের জন্য। কিন্তু যত বেশি অতীতের দিকে যাই ব্যবহার করার মত অবিকৃত অবস্থায় ডি এন এ পাওয়া ততই দুষ্কর ও বিরল হয়ে উঠে।

সব ক্ষেত্রেই দেহাবশেষকে ডি এন এ সংগ্রহের উপযুক্ত পরিবেশে পাওয়া বেশ বিরল ঘটনা। তাই এমন অবস্থার দেহাবশেষ পাওয়াটাই হলো প্রাচীন ডি এন এ গবেষণার পথে প্রথম বাধা। তারপর জীবিত একটি প্রাণির কোষ থেকে যেমন একটানা পুরো ডি এন এ উদ্ধার করা যায়, মৃত প্রাণির দেহাবশেষ থেকে তা সম্ভব হয়না। এ ক্ষেত্রে ডি এন এ পাওয়া যায় ছোট ছোট টুকরায়– সাধারণত এক একটি একশ' দু'শ বেইস-জোড়ার বেশি দীর্ঘ নয়। এখানে অবশ্য একটি বিষয় স্বস্তিদায়ক। আমরা মনে করতে পারি মাত্র কয়েক বছরের পুরানো মৃতদেহে ডি এন এ'তে এরকম টুকরা হওয়া বা বিকৃত হওয়া যতটি ঘটবে হাজার বছরের পুরানো ডি এন এ'তে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটবে। বহু হাজার বছর আগের পর্যন্ত দেহাবশেষের ক্ষেত্রে কিন্তু কথাটি খাটেনা। কারণ দেখা যাচ্ছে যে ডি এন এ'র অধিকাংশ বিকৃতি ঘটে যায় মৃত্যুর ঠিক পরে পরে– বেশ দ্রুত। তারপর দেহাবশেষটি যদি বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মোটামুটি নিরুপদ্রবে থাকে তা হলে আর নূতন বিকৃতি তেমন ঘটেনা বহু কাল ধরে। এর সুযোগেই আমরা এখন হাজার হাজার বছরের পুরানো ডি এন এ'কেও কষ্টসাধ্য উপায়ে হলেও বিশ্লেষণ করতে পারছি। তাই যত পুরানো হবে ডি এন এ'র টুকরা তত ছোট হবে এমন কোন কথা নাই।

তবে টুকরা হয়ে যাওয়াটাই বিশ্লেষণের পথে একমাত্র সমস্যা নয়। দেখা যায় যে প্রাচীন ডি এন এ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। বিশ্লেষণ করার সময় এতে সব বেইসের উপস্থিতি পাওয়া যায়না, বিশেষ করে T ও C বেইসকে প্রায় ক্ষেত্রেই হারিয়ে যেতে দেখা যায়, যদিও A ও G বেইস মোটামুটি পাওয়া যায়। এটি খুব সম্ভব T ও C অণুর অধিকতর অক্সিডেশন জনিত ক্ষতির কারণেই ঘটে থাকে। তবে এতে বড় সমস্যা হয়না এ জন্য যে ডি এন এ'র দুটি সূত্র রয়েছে বলে অনুপস্থিত T এর বিপরীতে অন্য সূত্রে তার সম্পূরক A দেখে বুঝা যায় যে ওখানে T ছিল, তেমনি অনুপস্থিত C এর বিপরীতে G দেখে তার উপস্থিতি

দূষণ এড়াতে নিশ্ছিদ্র পরিবেশে প্রাচীন ডিএনএ সংগ্রহ ও প্রতিলিপি তৈরি

আন্দাজ করা যায়। বেইসের এই হারিয়ে যাওয়া ছাড়াও ডি এন এ'র এক একটি একক যেই নিউক্লিয়োটিড তার নানা রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। রাসায়নিক ভাবে বেশি পরিবর্তিত হয়ে গেলে এই ডি এন এ'র বিশ্লেষণের কাজ খুব দুরূহ হয়ে পড়ে।

ডি এন এ'র দুষ্প্রাপ্যতা, এটি টুকরা টুকরা অবস্থায় পাওয়া, এর বেইস হারিয়ে ফেলা, এটি রাসায়নিক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া–এসবই প্রাচীন ডি এন এ নিয়ে কাজ করার পথে বাধা। কিন্তু সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে তা হলো এর 'দূষণের' সমস্যা। এই ক্ষেত্রে দূষণ হলো ঐ দেহাবশেষের কোন না কোন সময় অন্য প্রাণির সংস্পর্শে আসার ফলে ঐ অন্য প্রাণির ডি এন এ এর সঙ্গে মিশে যেতে পারে। তাছাড়া যে মানুষ এসব ডি এন এ সংগ্রহ করেন বা তা বিশ্লেষণ করেন তাঁদের নিজেদের কিছু দেহকোষের সঙ্গে ডি এন এ গিয়ে একে দূষিত করতে পারে। ফলে হাজার হাজার বছর পুরানো ঐ সামান্য পরিমাণ ডি এন এ'র তুলনায় এই দূষণ ডি এন এ'ই প্রাধান্য লাভ করে বিশ্লেষণকে অনায়াসে গোলমালে ফেলে দিতে পারে। এজন্য সংগ্রহ করার সময় এবং ল্যাবোটরিতে

এই ডি এন এ নিয়ে কাজ করার সময় অত্যন্ত বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বিজ্ঞানীরা এ সময় এমন সব নিশ্ছিদ্র পোষাক পরেন যাতে তাদেরকে দেখতে মহাশূন্যচারীর মতো মনে হতে পারে, আর তাঁদের কাজের ল্যাবোরেটরির পরিবেশকেও রাখতে হয় অত্যন্ত দূষণহীন অবস্থায়।

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অসুবিধাগুলো

অত্যন্ত বিরল, ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকা প্রাচীন দেহাবশেষ থেকে যদিও বা কার্যকর কিছু ডি এন এ সংগ্রহ করা গেল, তার পরিমাণ হয় খুবই সামান্য। তাই পি- সি আর এর মাধ্যমে এর অনেক প্রতিলিপি তৈরি করে নিতে হয় বিশ্লেষণের আগে। আর পরিমাণ অতি সামান্য হওয়াতে পি সি আর করাও সহজ হয়না। এতে নিউ-ক্লিয়াসের মূল ডি এন এ থেকে বরং মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'ই বেশি পাওয়া যায় কারণ কোষে মাইটোকোন্ড্রিয়ার সংখ্যা অনেক। পি সি আর করতে সাধারণত ২০০ থেকে ৪০০ বেইস-জোড়া দীর্ঘ ডি এন এ টুকরা ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ডি এন- এ'র ক্ষেত্রে টুকরাগুলো এত ছোট হয় যে এতখানি দৈর্ঘ পাওয়া যায়না। টুকরাগুলোর প্রান্ত মিলিয়ে পুরো জেনোম আন্দাজ করার কাজটিও অত্যন্ত কঠিন হয়।

মূল ডি এন এ'তে বেইস ঠিক থাকে না বলে পি সি আর এর সময় পলিমারেজ এন-জাইম যখন এর একটি সূত্রকে ছাঁচ হিসাবে ব্যবহার করে তার সম্পূরক সূত্র সংশ্লেষণ করে, তখন তা আরো ভুল করে বসে। এভাবে পি সি আর এ প্রত্যেকবার কপি হবার সময় ভুলগুলো ক্রমে জমতে থাকে এবং ফলে ত্রুটিপূর্ণ ডি এন এ'কে বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর অন্য প্রাণির ডি এন এ রূপী দূষণ এর সঙ্গে মিশে থাকলে তো অবস্থা আরো জটিল হয়ে পড়ে।

নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী মাওরিদের দ্বারা অতিশিকারের ফলে হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উটপাখির মত কিন্তু তার চেয়েও বড় পাখি মোয়ার দেহাবশেষ থেকে ডি এন এ নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় একটি মজার ঘটনা ঘটেছে। এর পি সি- আর করতে গিয়ে মোয়ার ডি এন এ'র যথাযথ অংশকে প্রাইমার হিসাবে ব্যবহার করে প্রতিলিপি তৈরি শুরু করা যায়নি। অথচ মানুষের ডি এন এ থেকে প্রাইমার হিসাবে ব্যবহার করে দেখা গেছে যে দিব্যি পি সি আর এগিয়ে চলেছে। মোয়ার ঐ ডি এন এ মানুষের ডি এন এ দিয়ে 'দূষিত' হয়েছে বলেই এমনটি ঘটেছে।

প্রাচীন ডিএনএ যা উদ্ঘাটন করছে

সবরকম অসুবিধা সত্ত্বেও আজকের ডি এন এ প্রযুক্তি এতখানি উন্নত হয়েছে যে অনেক প্রাচীন প্রাণির থেকে পাওয়া ডি এন এ নিয়ে গবেষণা তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারছে। এর মধ্যে রয়েছে এখনকার আর তখনকার নানা প্রাণির মধ্যে বিবর্তনগত সম্পর্ক, তাদের নিয়ে বিবর্তন বৃক্ষের নানা শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি। যেমন ঐ মোয়ার কথাই ধরা যাক। বেশ কিছু মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মোয়ার মরদেহ থেকে ডি এন এ নিয়ে এর বিবর্তন সম্পর্কে কিছু বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মোয়ার মত আর একটি উটপাখি-সদৃশ পাখি নিউজিল্যাণ্ডে এখন রয়েছে যার নাম কিউই। বর্তমানের কিউইর ডি এনএ'র সঙ্গে সেকালের মোয়ার ডিএনএ'র মিল কম। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার একই ধরনের পাখি এমু'র বিভিন্ন উপ-প্রজাতির ডি এনএ'র সঙ্গে মোয়ার ডি এনএ'র মিল অপেক্ষাকৃত বেশি। এতে মনে হচ্ছে মোয়া ছিল অষ্ট্রেলিয়ার এমু'র নিকট জ্ঞাতি। এদের সাধারণ পূর্বসূরি অষ্ট্রেলিয়াতেই ছিল। নিউজিল্যাণ্ড যখন অতীতে অষ্ট্রেলিয়া থেকে বিভক্ত হয় তখন তাদের যারা নিউজিল্যাণ্ডের ভাগে পড়েছিল তাদের থেকেই মোয়া বিবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে আজকের নিউজিল্যাণ্ডে যে কিউই আছে তারা নিউজিল্যাণ্ডের আদি সেই উড়ন-ক্ষমতা-বিহীন পাখিটি থেকে আসেনি। বরং অষ্ট্রেলিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর নূতন আগন্তুক প্রাণি হিসাবে এরা নিউজিল্যাণ্ডে এসেছে সমুদ্রপথে কোথাও থেকে। বর্তমান ও বিলুপ্ত এই পাখিগুলোর ডিএনএ তুলনা না করতে পারলে এসব কথা আমরা জানতে পারতামনা। এমনি ভাবে প্রাচীন ডি এন এ থেকে আরো নানা প্রাণির বিবর্তন ধারাগুলো বুঝা সম্ভব হচেছ।

বিবর্তনের সম্পর্কগুলো বুঝতে প্রাচীন দেহাবশেষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি এন এ বেশ কাজে আসছে, কারণ ওটিই সেখানে বেশি পাওয়া যাচেছ। নিউক্লিয়াসের মূল ডি এন এ এখন পর্যন্ত কমই ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের জন্য যেই প্রাচীন ডি এন এ সব চেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক তা হলো অন্য বিলুপ্ত প্রজাতির মানুষের ডি এনএ। ৩৫ হাজার বছর আগের নিয়ানডার্থাল মানুষের হাড়ের থেকে এমন ডি এন এ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এর মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ বিশ্লেষণের ফলে ঘটেছে নিয়ানডার্থালদেও সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ঘাটন। হাজার ত্রিশেক বছর আগে মানুষের এই ভিন্ন প্রজাতি নিয়ানডার্থালরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার আগের বহু হাজার বছর আমাদের প্রজাতি সেপিয়েন্সরা আর এই নিয়ালডার্থালরা ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে একই জায়গায় বাস করেছে। তাই ঐ সময়ের শেষের দিকের সমসাময়িক

নিয়ালডার্থালের ডি এন এ ও সেপিয়েন্সের ডি এন এ উভয়েই নানা জায়গা থেকে বেশ কিছু ব্যবহারযোগ্য ভাবে পাওয়া গিয়েছে। ফলে তখনকার নিয়ালডার্থাল, সমসাময়িক তখনকার সেপিয়েন্স, এবং আজকের সেপিয়েন্সদের (আজকের মানুষের নানা গোষ্ঠির) মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র তুলনা করে তাদের মধ্যে বিবর্তনগত সম্পর্কগুলো বুঝা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯৭ সালের এ রকম একটি গবেষণায় প্রাচীন নিয়ানডার্থাল ও বর্তমান মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র সিকোয়েন্সিং করে বেইস পরস্পরায়গুলো তুলনা করা হয়েছে, অনেকটা পলিনেশিয়ানদের অভিবাসন দেখার জন্য যে ভাবে করতে আমরা দেখেছি সেভাবে । দেখা গেছে যে আজকের নানা গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে গড়পড়তা এর ৮টি জায়গায় সিকোয়েন্সের তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু নিয়ানডার্থালদের মধ্যে এই তারতম্য দেখা যায় ২৭টি জায়গায়। এর ভিত্তিতে বিবর্তন বৃক্ষ খাড়া করলে দেখা যায় যে সেপিয়েন্স থেকে সেপিয়েন্স নানা গোষ্ঠিতে বিকাশের ধারায় যেটুকু পরিবর্তন ডি এন এ'তে এসেছে তার সীমার অনেক অনেক বাইরে পড়ে যাচ্ছে নিয়ানডার্থাল ডি এন এ'র পরিবর্তনগুলো। আরো দেখা যাচ্ছে যে নিয়ানডার্থাল আর সেপিয়েন্সদের সাধারণ পূর্বপুরুষের কাল এই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র তারতম্যের ভিত্তিতে হিসাব করলে পাওয়া যায় প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর, যা ফসিল ভিত্তিক আন্দাজের সঙ্গে মিলে যায়। তারও বহু পর মাত্র দেড় লক্ষ বছর আগে আমাদের প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে।

নিয়ানডার্থালদের সম্বন্ধে আমাদের সব চেয়ে বেশি কৌতুহল হলো ওদের সঙ্গে সমসাময়িক সেপিয়েন্সদের অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের কোন প্রজননগত সম্পর্ক ঘটেছিল কিনা। যে ভাবে ত্রিশ হাজার বছর আগেকার সময়ের দিকে ওরা খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে একই জায়গায় বাস করেছে, এবং খুব কাছাকাছি প্রজাতি হওয়াতে জীবতাত্ত্বিক ভাবে উভয়ের সার্থক প্রজনন যখন সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে তেমনটি আদৌ ঘটেছিল কিনা। যদি ঘটে থাকে তা হলে আমাদের মধ্যে শুধু পাঁচ লক্ষ বছর আগের নিয়ানডার্থাল জিন থাকবেনা, বরং মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার আগেকার নিয়ানডার্থাল জিনও থাকার কথা।

কিন্তু আমাদের মানুষের নানা গোষ্ঠির মাইটোকোণ্ড্রিয়াল ডি এন এ'তে সেদিনের নিয়ানডার্থাল মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র এমন কোন বৈশিষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি যাতে উভয়ের মধ্যে প্রজননের ফলে জিন বিনিময় প্রমাণিত হতে পারে। তবে ওরকম প্রজনন যে হয়নি তা এর থেকে পুরাপুরি প্রমাণিত হয়না। সেটি

করতে হলে নিয়ানডার্থালের নিউক্লিয়াসের থাকা মূল ডি এন এ'র বিশ্লেষণ প্রয়োজন, শুধু মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র নয়।

প্রাচীন ডি এন এ নিয়ে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো

আমরা এখন যত প্রাচীন ডি এন এ ব্যবহারযোগ্য ভাবে সংগ্রহ করতে পারছি তা লক্ষ বছরের বেশি নয়। এই সময়সীমা পেছনের দিকে আরো বাড়ানো খুবই কঠিন হবে বৈ কি। তারপরও আশা করা যায় আরো উন্নত প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ সীমা হয়তো কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যাবে। তবে এর চেয়ে বেশি যে করা যাবেনা সেটি প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু এ পর্যন্ত বেশির ভাগ সম্ভব হয়েছে শুধু মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ'র ক্ষেত্রে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা মূল ডি এন এ'র বিশ্লেষণ বেশি সম্ভব হয়নি তার কার্যকর ডি এন এ পাওয়া যায়নি বলে। ম্যামথ প্রভৃতি যে সব প্রাণি বরফের মধ্যে অবিকৃত থেকেছে শুধু তাদের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার বছর পুরানো দেহাবশেষেও নিউক্লিয়ার ডি এন এ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্য প্রাণিদের ক্ষেত্রেও বড় চেষ্টা হবে নিউক্লিয়ার ডি এন এ পাওয়া এবং তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা। যেমন তাতে নিয়ানডার্থালের সঙ্গে আমাদের কোন প্রজনন সম্পর্ক ঘটেছিল কিনা তা সন্দেহের অতীত হিসাবে নির্ণয় করা যাবে। বর্তমানের নানা গোষ্ঠির মানুষের নিউক্লিয়ার জিন-বৈচিত্রের বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত এতে এসেছে এমন জিনবৈচিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে– যেমন ৫ লক্ষ বছর আগে নিয়ানডার্থালদের থেকে পৃথক ধারার চলে যাওয়ার সময়, বা তারো আগের।

Y ক্রোমোজোম ও অন্যান্য কিছু ডি এন এ যেগুলো শুধু পিতৃ-ধারায় প্রবাহিত হয়, অথবা যেগুলোর প্রজননের সময় দৈবচয়ন হয়না সেগুলোর মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে। এখন ৩০/৩৫ হাজার বছর আগের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন নিয়ানডার্থাল গোষ্ঠির হাড় থেকে যদি নিউক্লিয়ার ডি এন এ বিশ্লেষণযোগ্য ভাবে পাওয়া যায়, এবং তাদের ক্ষেত্রেও একই রকম জিনের বৈচিত্র অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে পরস্পরের সঙ্গে প্রজননের বিষয়টি নিঁখুতভাবে নির্ণয় করা যাবে। এরকম প্রজননের সাক্ষ্য তখনই পাওয়া যাবে আজকের মানুষের মধ্যে যত জিনবৈচিত্র তার চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কম বৈচিত্র যদি নিয়াডার্থালদের সঙ্গে আজকের মানুষের দেখা যায়। আপাতত অবশ্য জেনেটিক দিক থেকে নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে আজকের মানুষের অভাবনীয় মিল সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে এরকম জিন প্রবাহের কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। এটি ছাড়াও নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে সেপিয়েন্সের কতগুলো বড় পার্থক্যের উৎস জানতেও

আমাদের খুব কৌতূহল রয়েছে। যেমন 'ভাষার জিন' নিয়ানডার্থালদের ছিল কিনা, থাকলে আমাদের থেকে কতখানি ভিন্ন ভাবে ছিল, এ ধরনের বিতর্কের অবসান হতে প্রাচীন ডিএনএ সহায়ক হবে।

অন্যান্য প্রাচীন প্রাণিদের ক্ষেত্রেও আদিতে তাদের বিবর্তন বৃক্ষের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়ার জন্য তাদের নিউক্লিয়ার ডি এন এ পাওয়া দরকার। খুব ভাল হবে যদি একই প্রাণির মোটামুটি একই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে যে সব দলে ছিল তাদের বিভিন্নটির ডি এন এ'র বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। একই ভাবে তাদের বিভিন্ন কালের বংশধরদের ডি এন এ'ও। সেক্ষেত্রে তাদের ও তাদের বর্তমান উত্তরসূরিদের আরো নিঁখুত বিবর্তন বৃক্ষ তৈরি করে বুঝা যেত কোন প্রাণির কোন শাখা কোন দিকে এগিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে আমাদের নিকটতম কালে যে বরফ যুগটি অতিক্রান্ত হয়েছে তা ২২ হাজার থেকে ১০ হাজার বছর আগের সময়টিতে তুঙ্গে ছিল। সেই বরফ যুগের আগের গুহা-ভালুকদের (কেইভ বেয়ার) বহু গোষ্ঠির এবং বর্তমান তাদের সদৃশ খয়েরী ভালুকদের (ব্রাউন বেয়ার) বহু গোষ্ঠির ডি এন এ পরীক্ষা করে কিছু বিষয় বুঝা গেছে। যে রকম মনে করা হতো আজকের খয়েরী ভালুকরা সে সময়ের গুহা ভালুকের উত্তরসূরি নয়, বরং ওদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি শাখা থেকে এরা এসেছে। তাদের প্রাচীন ডি এন এ তাদের দেহাবশেষ থেকে ব্যাপক নানা গোষ্ঠির মধ্যে পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে বলেই এটি আমরা নিশ্চিত জানতে পারছি। আশা করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে আরো বহু রকম বির্বতন জনিত প্রশ্নের উত্তর এনে দেবে প্রাচীন ডিএনএ'র অনুসন্ধান।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। ডি এন এ'র মাধ্যমে নানা রোগ কী ভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে যায় সেটি আমরা দেখেছি, যেমন ডায়াবেটিস রোগের ক্ষেত্রে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রজন্মে কারো না থাকলেওতো এই রোগ দেখা দেয়। তখন কি তা ডি এন এ'র মাধ্যমে হয়না?

উত্তর। তখনো ডি এন এ বা জিনের মাধ্যমে এ রোগ হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে জিনে যে মিউটেশন এর জন্য দায়ী, সেটি বাবা-মার মাধ্যমে আসছেনা, রোগীর নিজের মধ্যেই সেই মিউটেশনটি সৃষ্টি হচ্ছে। নানা রকম শারীরিক ও পারিবেশিক কারণে এরকম মিউটেশন সৃষ্টি হতে পারে– কোন দূষণ, কোন বিকিরণ, খাদ্যে কোন ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান ইত্যাদি কারণে। ঐ জিন-বৈকল্য তখন রোগ সৃষ্টি করতে পারে। মিউটেশনটি যদি জনন কোষে হয় শুধু সেক্ষেত্রেই এটি রোগকে প্রজন্মান্তরে নিয়ে যেতে পারে– তখন সেটি হয়ে পড়ে বংশগত রোগ।

প্রশ্ন ২। আমার মায়ের ও আমার ডি এন এ'র তুলনামূলক বিচার করে আমি কি জানতে পারবো যে কী কী বৈশিষ্ট আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি?

উত্তর। হ্যাঁ, যদি মায়ের পুরো জেনোম চিত্র জানা থাকে, আপনারও পুরো জেনোম চিত্র জানা থাকে, তা হলে তা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে অবশ্য উভয়ের জেনোমের সিকোয়েন্সিং হয়ে থাকতে হবে, এবং এতে যে সব কার্যকর জিন রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত হয়ে তার কোন্‌টির জন্য কী সব বৈশিষ্ট দায়ী তাও জানা থাকতে হবে।

আমরা অবশ্য পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ণয়ের জন্য যে ভাবে সন্তানের, বাবার, ও মায়ের ইলেকট্রোফোরেসিস প্যাটার্ন তুলনার কথা বলেছি, সেটি অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ কাজ। সে ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে বা বাবার সঙ্গে কী কী বৈশিষ্টে সন্তানের মিল আছে তা জানার উপায় নাই। শুধু কতগুলো অর্থহীন চিহ্নে মিল-অমিল দেখে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ণয় করা যায় মাত্র।

প্রশ্ন ৩। কারো ডি এন এ স্যাম্পল নেবার জন্য একটি চুলই যথেষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে চুল, নখ ইত্যাদি এক রকমের মরা অংশ মাত্র–

তাতে তো ডি এন এ থাকার কথা নয়। তা হলে চুল থেকে কী ভাবে ডি এন এ পাব?

উত্তর। চুলটি যদি এর গোড়া শুদ্ধ থাকে, তা হলে এর সঙ্গে চুলের গোড়ায় থাকা ফোলিক্‌ল নামক অংশ যেখান থেকে চুল সৃষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করে তা সংলগ্ন থাকতে পারে। শুধু এমন ক্ষেত্রেই চুল থেকে নিউক্লিয়ার ডি এন এ পাওয়া যেতে পারে। তবে পাওয়া যেই চুলের সঙ্গে এই অংশ নাই, শুধু চুলের মূল দণ্ডটি আছে, তার থেকেও ডি এন এ পাওয়া যাবে– কিন্তু সেই ডি এন এ নিউক্লিয়াসের নয়, মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ। চুলের দণ্ডেও মাইটোকো-ড্রিয়া থাকে। এখানকার ডি এন এ'র তথ্য কম হলেও অপরাধী বা ব্যক্তি সনাক্তকরণের কাজে এটি বেশ ব্যবহার করা যায়। একটি অসুবিধা অবশ্য কখনো কখনো এ ক্ষেত্রে হতে পারে, মাতৃধারায় আসে বলে মায়ের ও তার সন্তানদের চুলে এই ডি এন এ অভিন্ন হবে।

প্রশ্ন ৪। ডি এন এ প্রতিলিপি হবার জন্য এর দুই সূত্র খুলতে, এদের একটির প্রতিলিপি সংশ্লেষণ করতে, এবং পরে আবার নূতন-পুরাতন দুই সূত্রকে কুণ্ডলী পাকাতে, বিভিন্ন রকম এনজাইম বা প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখেছি। ডি এন এ'র বার্তা অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি করতেও আবার এনজাইম প্রোটিন লাগে। তাহলে এই শুরুর প্রোটিনগুলো আসলো কোথা থেকে?

উত্তর। সব প্রোটিনই আসছে ডি এন এ'র কোন না কোন অংশের কাজের ফলে। তবে সন্তানের প্রথম কোষের মধ্যে ডি এন এ কাজ শুরু করার জন্য যে এনজাইম লাগে, তা বাবা মা থেকে পাওয়া নিষিক্ত ডিম্বকোষে আগে থেকে যোগান থাকে। এরপর তো অবশ্য সন্তানের ডি এন এ নিজেই এসব এনজাইম তৈরি করে নিতে পারে।

অবশ্য আদিতে যখন পৃথিবীর প্রথম জীবের উন্মেষ হয় তখন এই সুবিধাটি ছিলনা। তখন প্রথমে যদি ডি এন এ থাকতো সেটি এনজাইম ছাড়া কার্যকর হতে পারতোনা, যদি এনজাইম থাকতো সেটি ডি এন এ ছাড়া কাজ করতে পারতোনা। ব্যাপারটি মুরগি আগে না ডিম আগের মত হয়ে গিয়েছিল তখন। অবশ্য এই আদি সমস্যা কীভাবে সমাধান হতে পেরেছিল সে সম্পর্কে বর্তমানে কিছু তত্ত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ৫। আপনি বলেছেন আমাদের ডি এন এ'র মাত্র ৫% কার্যকর, বাকি ৯৫% অকার্যকর। যদি ঐ ৯৫%ও কার্যকর হতো তা হলে আমরা কি আরো উন্নত হতামনা?

উত্তর। যেটুকু ডি এন এ মানুষের ক্ষেত্রে কাজের ডি এন এ হিসেবে রয়েছে তাতেই প্রয়োজনীয় সব জিনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আসলে আমরা যে সব চেয়ে উন্নত ও বুদ্ধিমান প্রাণি তা আমাদের জিনের সংখ্যার উপর নির্ভর করেনা। সম্পূর্ণ জেনোম উদ্ঘাটনের পর এখন আমরা জানি মানুষের জিনের সংখ্যা ২০ হাজারের মত, কিন্তু ইঁদুর ও মাছির ক্ষেত্রেও জিনের সংখ্যা ঐ ২০ হাজারের মতই। এমনকি পেটের কৃমি রাউণ্ড ওয়ার্মের মত অতি সাধারণ প্রাণিরও জিনের সংখ্যা ১৩ হাজার। অন্য দিকে ধানের জিনের সংখ্যা ৪৫ হাজার। কাজেই জিনের সংখ্যা যদি ২০ হাজার না হয়ে আরো অনেক বেশি হতো তা হলে মানুষ যে আরো অনেক উন্নত প্রাণি হতো এমন কথা বলা যায়না।

প্রশ্ন ৬। একটি কঙ্কাল কত দিনের প্রাচীন হওয়া পর্যন্ত এতে ব্যবহারযোগ্য ডি এন এ পাওয়া যাবে?

উত্তর। সেটি বয়সের থেকেও কঙ্কালের অবস্থার উপর বেশির নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে হাড়ের কোষগুলো অক্ষত থাকতে হবে যাতে তার মধ্যে ডি এন এ মোটামুটি অবিকৃত ভাবে থাকতে পারে। ডি- এন এ'র বড় ক্ষতিগুলো মৃত্যুর পরপরই ঘটে যায়। এরপর যে সব জায়গায় দৈবক্রমে হাড় অপেক্ষাকৃত সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে তাতে হাজার হাজার বছর ধরে ডি এন এ ভাল থাকতে পারে।

প্রশ্ন ৭। আপনি রোগের আলোচনায় বল্লেন যে বিশেষ বিশেষ জিনে মিউটেশনের কারণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। আবার বিবর্তনের জন্য জিন মিউটেশন প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেছেন। মিউটেশন জিনিসটি আসলে ভাল না খারাপ?

উত্তর। মিউটেশনই তো জিন-বৈচিত্র সৃষ্টি করে। আর এই বৈচিত্র রয়েছে বলেই তো তার থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন সম্ভব হয়। এই বিবর্তন না হলে আমরা আসতামনা– পৃথিবীর যাবতীয় জীবই আজো সেই আদি ব্যাকটেরিয়ার পর্যায়ে থেকে যেতো। তবে বিবর্তন খুব বিরল জিনিস– লক্ষ বা কোটি বছরের মাপে গিয়ে তবে

তার কোন বড় ধরনের রূপ চোখে পড়ে। সাধারণ ভাবে অধিকাংশ মিউটেশন কিন্তু ক্ষতিকারক। এটি আমাদের স্বাভাবিক জীবন-প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে– রোগের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ক্ষতিকারক পরিবেশ যেমন ক্যামিক্যাল্‌স, বিকিরণ ইত্যাদির প্রভাবে ডি এন এ'তে দ্রুত এলোপাতাড়ি মিউটেশন দেখা দেয়াটি বিপজ্জনকই বটে। রোগ সৃষ্টির মিউটেশন যদি জনন কোষে ঘটে– তা হলে তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিতও হয়।

প্রশ্ন ৮। মানুষ বেশি প্রাচীন, না মানুষের ডি এন এ বেশি প্রাচীন?

উত্তর। অবশ্যই মানুষের ডি এন এ। প্রজাতি হিসাবে মানুষের বয়স দেড়-দুই লক্ষ বছরের বেশি নয়। যে জেনোম দ্বারা আজ আমরা মানুষ, তার অধিকাংশ কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে তার অনেক প্রাচীন পূর্বসূরিদের মধ্যে। এমনকি মানুষের নিকট পূর্বসূরিরাও তাদের অধিকাংশ জিন পেয়েছে তাদেরো পূর্বসূরিদের কাছে থেকে, এ ভাবে ক্রমান্বয়ে প্রাচীনদের থেকে। এ জন্যই আমাদের কোন বিশেষ জিনের কাজ খুঁজতে আমরা শরণাপন্ন হতে পারি অনেক সরলতর অন্য প্রাণির কাছে– কারণ আমাদের ও তাদের সাধারণ যে পূর্বসূরি বহু প্রাচীন কালে ছিল তাদের জিনই আমরা উভয়েই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ডি এন এ'ই জিনের ক্রমধারাটিকে বহন করে চলেছে শুধু মিউটেশনের মাধ্যমে অল্প অল্প পরিবর্তিত হয়ে।

প্রশ্ন ৯। জি এম শস্য ইত্যাদিতে আমরা যে ভাবে জিন স্থানান্তর করি তা কি গঠনকারী জিন না নিয়ন্ত্রণকারী জিন?

উত্তর। উভয় রকম জিনই স্থানান্তর করতে হয়। যে নূতন ধরনের প্রোটিন তৈরি করার জন্য এই স্থানান্তরটি করা হয় সেগুলো গঠনকারী জিন হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রোটিন সত্যি সত্যি পেতে হলে ঐ জিনকে প্রকাশিত হতে হবে, ঠিক যেখানে আমরা চাই সেখানে প্রকাশিত হতে হবে। এসব নিয়ন্ত্রণকারী জিনের কাজ। কাজেই সেটিও একই সঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১০। আমরা ডি এন এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীত অনুসন্ধান করতে পারছি। একই ভাবে ডি এন এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও জানা সম্ভব হতে পারে?

উত্তর। ডি এন এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীত অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে তার কারণ ডি এন এ জিনিসটাই অতীত থেকে এসেছে, এটি মূলত প্রাচীন সব বার্তা বহন করছে। এই বার্তায় পরিবর্তনের হার লক্ষ্য করে আমরা মানুষ বা অন্য প্রাণি অতীতে কীভাবে বিস্তৃত হয়েছে বুঝতে পারি। এই বার্তাই ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, যদিও অবশ্য সেক্ষেত্রেও মিউটেশনের মাধ্যমে তার কিছু কিছু বদলে যাবে। কিন্তু যেহেতু কী মিউটেশন ঘটবে ও টিকে থাকবে তা আমাদের এখন জানার উপায় নাই, তাই এখন ডি এন এ থেকে ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দেয়া যাবেনা।

তবে হ্যাঁ, এখন জিন-কারিগরির মাধ্যমে ভবিষ্যতের কিছু কিছু জিনিসকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারছি। ভবিষ্যতে কোন কোন বংশগত রোগের আশঙ্কা কমিয়ে ফেলতে পারছি, ভবিষ্যতের জন্য সুবিধাজনক শস্য সৃষ্টি করতে পারছি। এই অর্থে ডি এন এ বিজ্ঞান ভবিষ্যতের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার কথা বলতে পারছে বৈ কি। এটি সামনে আরো বেশি পারবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ১১। 'মার্কার' দিয়ে জিন চিহ্নিত করা যায় এ কথা আমরা জেনেছি। এই মার্কারগুলো আসলে কী? এরা জিনকে চিহ্নিত করে কী উপায়ে?

উত্তর। জিন যে রকম ডি এন এ'র একটি অংশ, মার্কারও সেরকম ডি এন এ'র অংশ। অবশ্য সাধারণত জিন যেমন কোডিং করে, মার্কার তা করেনা, এটি বেকার ডি এন এ'ই হয়ে থাকে। মার্কার জিনকে চিহ্নিত করতে পারে তার কারণ এটি সব সময় জিনের সঙ্গে থাকে, এর কাছাকাছি অবস্থান করে। কাজেই মার্কারটি খুঁজে পেলেই বুঝা যায় যে ওখানে জিনটিও আছে। আর মার্কার হবার আরেকটি যোগ্যতা হলো ডি এন এ'র নানা টুকরার অসংখ্য কপির মধ্যে মার্কারগুলোকে সহজে চিহ্নিত করা যায়, যা মূল জিনটিকে করা দুরূহ।

প্রশ্ন ১২। জিন চিকিৎসা বলতে আমরা ঠিক কী ধরনের চিকিৎসা বুঝাচ্ছি তা সংক্ষেপে বলার উপায় কী?

উত্তর। যেই জিনের মিউটেশন বা বৈকল্যের কারণে রোগটি হয়ে থাকে তা যদি আমাদের জানা থাকে, তা হলে রোগীর শরীর থেকে যত বেশি সম্ভব এরকম বিকল জিন সম্পন্ন কোষ বের করে নিয়ে সেগুলোতে

বিকল জিনকে স্বাভাবিক জিন দিয়ে বদলে, আবার তা রোগীর শরীরে ফেরৎ দিতে পারি। কোষ বিভাজনে এ রকম স্বাভাবিক জিন তখন বাড়বে ও বিকল জিনের উপর প্রাধান্য পাবে। জিন কারিগরির ফলে এভাবে জিন-বদলের সক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

প্রশ্ন ১৩। মেরু অঞ্চলে সমুদ্র গভীরে অক্সিজেনের অনেক প্রাচুর্য রয়েছে বলে সেখানে আইস ফিশ তার লোহিত কণিকা তৈরির জিনটির সুইচ অফ্ করে দিয়েছে। কখনো যদি তাকে কম অক্সিজেনের অঞ্চলে থাকতে হয় তখন কি আইস ফিশ ঐ জিনের সুইচ আবার অন্ করে নিতে পারবে?

উত্তর। এই সুইচ অফ্ করা অন্ করাটি কিন্তু নিয়ন্ত্রণকারী জিনের কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের এ প্রক্রিয়া জীবের মধ্যে এমন ভাবে থাকে যে কোষের পরিবেশ বদলে গেলে অফ্ থাকা সুইচ আবার অন্ হতে পারে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার ল্যাক অপারোনের ক্ষেত্রে দেখেছি ল্যাকটোজ থাকলে তা ল্যাক জিন বন্ধ রাখে, ল্যাকটোজ না থাকলে তা চালু করে। কিন্তু আইস ফিশের মত অবস্থায় পরিবেশটি এতই স্থায়ী যে ঐ লোহিত কণিকার সুইচ অফ্ রাখার ব্যবস্থাটি ঘটেছে বিবর্তনের ফলে কিছুটা স্থায়ী ভাবেই। বহু প্রজন্ম ধরে ধীরে ধীরে ব্যাপারটি তাদের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে। আর পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে এর অন্যথা ঘটতে হলেও এভাবেই বহু প্রজন্ম ধরে ধীরে ধীরে এটি বিবর্তিত হতে পারে লোহিত কণিকার সুইচ্কে আবার অন্ করতে। বিবর্তন কিছুটা অনিশ্চিত ব্যাপারও বটে। আদৌ ওভাবে সুইচ অন্ হবে, না আইস ফিশের প্রজাতি পরিবেশের ঐ পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তার নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না।

প্রশ্ন ১৪। স্বাভাবিক ভাবে আমরা যে প্রক্রিয়ায় জিন-স্থানান্তর করে এসেছি তার সঙ্গে জিন কারিগরির মাধ্যমে জি এম শস্য ইত্যাদির জিন স্থানান্তরের পার্থক্য কোথায়?

উত্তর। জিন-স্থানান্তরের সনাতন পদ্ধতি আমরা হাজার বছর ধরে অনুসরণ করছি– একই জীবের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ইচ্ছে মত প্রজনন ঘটিয়ে বিশেষ বিশেষ গুণের নূতন জাত সৃষ্টি করছি। এভাবেই তো আমরা বন্য জাত থেকে চাষের জাতের শস্য সৃষ্টি করেছি, বা বিভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্ট সম্পন্ন কুকুরের জাত সৃষ্টি করেছি। আর আধুনিক কালে ইরির

মত উচ্চ ফলনশীল ধানও এভাবেই বিভিন্ন ধানের প্রজননে জিন স্থানান্তর করেই তো আমরা পেয়েছি।

আজকের জিন কারিগরির মাধ্যমে যেটি হচ্ছে সেটি কিছুটা ভিন্নতর। আগের জিন স্থানান্তর হয়েছে যৌন প্রজননের মাধ্যমে। তাই সেখানে জনন কোষের মাধ্যমে পুরো জেনোমই স্থানান্তরিত হয়েছে সন্তানের মধ্যে– বাবা ও মায়ের কাছ থেকে। আর যেহেতু যৌন প্রজনন সম্ভব শুধু একই প্রজাতির জীবের মধ্যে তাই সে ক্ষেত্রে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে জিন স্থানান্তর সম্ভব ছিল না।

এখন জিন-কারিগরির মাধ্যমে যে কোন প্রজাতি থেকে, সে উদ্ভিদ, প্রাণি, ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া যাই হোক না কেন, অন্য যে কোন প্রজাতিতে জিন-স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে পুরো জেনোম নয়, বরং সুনির্দিষ্ট একটি জিনকে কেটে এনে নূতন জীবে তা সংযোজন করার মাধ্যমে। এটি তাই সম্ভাবনার অনেক বড় দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

প্রশ্ন ১৫। জিন চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কিনা?

উত্তর। মন-মানসিকতা বলতে যদি আপনি এমন কিছু মানসিক পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে থাকেন যাদেরকে আমরা রোগ বা রোগের মতই অস্বাভাবিকতা বলে মনে করতে পারি, যা মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেগুলোর চিকিৎসা সম্ভব। তার জন্য জিন চিকিৎসার দরকার নাই। সাধারণ যে চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে তাতে ওষুধের মাধ্যমে বিষণ্নতা ইত্যাদি মানসিক পরিস্থিতির চিকিৎসা সব সময় হচ্ছে। এর কোন কোনটির জন্য ভবিষ্যতে জিন চিকিৎসাও সহায়ক হতে পারে।

তবে আপনি যদি মানুষের চিন্তার বৈশিষ্ট, আচরণ, স্বভাব ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকেন– তাহলে তার সব কিছু শারীরবৃত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং শিক্ষা, কালচার ইত্যাদির উপরই নির্ভর করে। সেখানে চিকিৎসার ভূমিকা গৌণ।

প্রশ্ন ১৬। নিয়ন্ত্রক জিনের মধ্যে যদি মিউটেশন দেখা দেয় তখন কী হতে পারে?

উত্তর। নিয়ন্ত্রক জিনের মধ্যে মিউটেশন সাধারণত খুবই বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। গঠনকারী জিনের থেকে এর প্রভাব অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেমন হক্স জিনের মিউটেশনের ফলে পতঙ্গের মাথা থেকে শুঁড় বের হবার বদলে পা বেরুতে দেখা গেছে!

আসলে বিবর্তনে বড় বড় পরিবর্তনগুলো এসেছে– নিয়ন্ত্রক জিনগুলোর পরিবর্তনের ফলে। এর ফলেই শুধু নূতন প্রজাতি নয়, বরং সম্পূর্ণ নূতন জীব ফ্যামিলিই বা আরো উচ্চ স্তরের নূতন পর্যায় সৃষ্টি হয়েছে অতীতে। তার জ্ঞাতি প্রাণিগুলোর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক জিনের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ যে তাদের থেকে খুবই ভিন্ন প্রজাতি, তার কারণ হলো অল্প সংখ্যক কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী জিনে মানুষ ভিন্ন।

প্রশ্ন ১৭। আমরা যখন এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে জিন স্থানান্তরিত করি এখন গ্রহীতা প্রজাতির জেনোমের যে স্বাভাবিক নেটওয়ার্ক তা কি ব্যাহত হতে পারেনা?

উত্তর। এ ধরনের জিন স্থানান্তর প্রক্রিয়া ডি এন এ'র একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় একটি সুনির্দিষ্ট জিন সংযুক্ত করে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রমোটর বা নিয়ন্ত্রক জিনও তার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয় যাতে এটি গ্রহীতার সঠিক অংশে প্রকাশিত হতে পারে। এর কোন ব্যত্যয় হলে, যেমন ঐ স্থানান্তর করতে গিয়ে গ্রহীতার অন্য কোন জিনের কার্যকারিতায় বাধা আসলে, অথবা স্থানান্তরিত জিন ভুল অংশে প্রকাশিত হলে, বা এমনি অন্য কোন গোলযোগ ঘটলে তা গ্রহীতার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এসব যেন না হতে পারে সে জন্য বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আজকাল জিন প্রযুক্তি এসব সাবধানতার দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

প্রশ্ন ১৮। মায়ের গর্ভে একটি ভ্রূণ বেড়ে উঠে যখন পূর্ণ শিশু সৃষ্টি হয় তখন কখনো কখনো কোন কোন জিনিস বদলে যায় কেন– যেমন শিশুর পা বাঁকা হয়ে জন্মানো।

উত্তর। ভ্রূণে কয়েকটি কোষ থেকে পর্যায়ক্রমে যে নানা অঙ্গ প্রতঙ্গের বিকাশ ঘটে তার সবই হয় এক পর্যায়ের জিন দ্বারা পরের পর্যায়ের গঠনগুলো নিয়ন্ত্রিত হবার মাধ্যমে। কাজেই পর্যায়ক্রমে পুরো বিষয়টি জিনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী জিনে কোন মিউটেশন

থাকলে বা ঘটলে তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে– অস্বাভাবিক কোন বৈশিষ্ট দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন ১৯। জানলাম আমাদের শরীরে কোষ খুব দীর্ঘজীবি হয় না, তার নিজের মধ্যেই একটি সময়ের পর তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করা থাকে। আমাদের কোষের মৃত্যু কি এক ভাবে আমাদের মৃত্যুর মত নয়? এ মৃত্যু ঘটে কেমন করে?

উত্তর। মোটেই নয়, বরং আমাদের শরীরের অনেক কিছু অসম্ভব হয়ে পড়তো যদি সব কোষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বেঁচে থাকতো। এজন্যই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের কোষের মৃত্যু ঘটে। সাধারণত ক্রোমোজোমের এক রকম অবক্ষয়, এবং ক্ষতিকর কিছু বস্তুর ক্রমবৃদ্ধি ধীরে ধীরে কোষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এ অবস্থা একটি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলে কোষ আর বেঁচে থাকতে পারেনা। কোষের মাইটোকোন্ড্রিয়ার অবক্ষয়ের মাধ্যমেও কোষ এরকম মৃত্যুর অবস্থায় চলে যায়। কোন প্রদাহে আক্রান্ত হলে, ডি এন এ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কোষের জন্য এরকম কোষ মৃত্যু অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আবার অনেক কোষে এমনিতেও নির্দিষ্ট সময় পরে কোষ মৃত্যুর প্রক্রিয়াটি ট্রিগার করার ব্যাপারটি প্রোগ্রাম করা থাকে।

প্রশ্ন ২০। বাবা ও মায়ের কোন জেনেটিক অসুখ থাকলে বা কোন বিশেষ বৈশিষ্ট থাকলে এটি সন্তানদের মধ্যে অনেক সময় থাকেনা কেন? আর থাকলেও তা সমান ভাবে থাকে না কেন?

উত্তর। বাবা বা মায়ের মিউটেশনটি যদি জনন কোষে না হয়ে থাকে তা হলে তা সন্তানের মধ্যে আদৌ যাবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তা যদি জনন কোষে থাকেও, এটি যদি মুখ্য জিন না হয় তা হলে এ রকম মিউটেশন বিশিষ্ট জিন দুই কপি বাবা ও মায়ের কাছ থেকে গেলেই শুধু সন্তান আক্রান্ত হবে। কাজেই সে ক্ষেত্রেও সন্তানরা সমান ভাবে আক্রান্ত হবেনা। তবে এটি মুখ্য জিন হলে এক কপি গেলেই সন্তান আক্রান্ত হবে।

প্রশ্ন ২১। আপনি প্রাণি দেহে সব সময় কিছু কিছু কোষের মৃত্যুর কথা বলেছেন। প্রাণি মারা গেলে সব কোষই কি মারা যায়? তা হলে তখন ডি এন এ বেঁচে থাকে কেমন করে?

উত্তর। মৃত্যুর পর সব শারীর-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় বলে কোন কোষেরই আর বেঁচে থাকার উপায় থাকেনা। সব কোষই মরে যায় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কোষের জৈব বস্তুর অনেকখানিই ধীরে ধীরে অবক্ষয়িত হয়। আর ডি এন এ বেঁচে থাকার যে কথাটি বলা হলো সেটি ঠিক নয়। ডি এন এ কোষের ভেতরে এক রকম জৈব অণু মাত্র। মৃত কোষে তা আর কোন কাজ করেনা। কিন্তু তা যদি অণু হিসাবে অবিকৃত থাকে তা হলে অণুর গঠনের মধ্যে ডি এন এ'র বেইসক্রম এবং তা অনুযায়ী এর জেনেটিক বার্তাটি ওখানে থেকে যায়। প্রাচীন ডি এন এ উদ্ধার করে সেই বার্তাটি পড়ার ব্যবস্থা করা যায়, এমনকি কাজেও লাগানো যায়।

প্রশ্ন ২২। প্রাচীন ডি এন এ থেকে বিলুপ্ত প্রাণি ফিরিয়ে আনার যে পরিকল্পনা নীতিগতভাবে সম্ভব, তাতে সেই ডি এন এ'কে বর্তমানের একটি জ্ঞাতি প্রাণির কোষের নিউক্লিয়াসে স্থাপন করা হবে। সেই কোষ এখন জ্ঞাতি প্রাণির মধ্যে কোন বিকল্প মায়ের গর্ভে বড় করে তোলা হবে। ডি এন এ টি বিলুপ্ত প্রাণির হলেও কোষটি কিন্তু অন্য জ্ঞাতি প্রাণির। এতে কি বিলুপ্ত প্রাণিটি ফিরে এসেছে বলা যাবে?

উত্তর। অনেকটাই বলা যাবে, কারণ একটি জীবের সকল বৈশিষ্ট নির্ধারণ করে তার ডি এন এ'র জেনেটিক বার্তা। কাজেই অন্য জ্ঞাতি প্রাণির কোষ ব্যবহার করা হলেও, অন্য প্রাণির মাতৃগর্ভ ব্যবহার করা হলেও, সেই ভ্রূণটি ও তার থেকে বেড়ে উঠা প্রাণিটি ঐ বিলুপ্ত প্রাণির ডি এন এ'র বার্তা অনুযায়ীই তার সকল বৈশিষ্ট পাবে। সেই অর্থে এই প্রক্রিয়াটি সম্ভব হলে বিলুপ্ত প্রাণিটিই ফিরে আসবে।

তবে কোষটি এখানে ডি এন এ'র একটি আধার হিসেবে কাজ করছে এবং ডি এন এ'র কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কোষেরও বেশ কিছু অবদান থাকছে। সেই সুবাদে যার কোষ ব্যবহার করা হচ্ছে সেই প্রাণিটিও এ প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুত্ব রাখে বৈ কি। এ জন্য জ্ঞাতি প্রাণির কোষ ও জ্ঞাতি প্রাণি থেকে বিকল্প মা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে কোষের এই প্রভাবও যথাসম্ভব বিলুপ্ত প্রাণিটির কোষের মতই হয়।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং দেশের তরুণ তরুণীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য তিনি লেখালেখি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান বক্তৃতা ইত্যাদি সব মাধ্যম ব্যবহার করেছেন গত পাঁচ দশক ধরে। 'মহাশূন্যে মানুষ' এই পুস্তকমালাটিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেয়া তাঁর একটি বিজ্ঞান বক্তৃতামালার ভিত্তিতেই রচিত। ষাটের দশকে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁরই সম্পাদনায় এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি পল্লী-বাংলার সুবিধাবঞ্চিত তরুণ তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও হাতে কলমে জীবিকামুখি প্রযুক্তির বিস্তারে একটি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই লেখকের লেখনী শুধু তাঁর নিজের বিষয় পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আধুনিক বিজ্ঞানে অতি ফলপ্রসূ বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি নিয়ে তাঁর বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা ও লেখার স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান সাহিত্য, তরুণ তরুণীদের সক্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলন কী ভাবে এগিয়েছে, তাঁর সম্পাদিত 'বিজ্ঞান সাময়িকী'তে এবং তাঁর রচনায় তার একটি ধারাবাহিক আলেখ্য পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।